ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা

ডঃ উৎপলা গোস্বামী এম. এ. পি. এইচ. ডি. সঙ্গীতশাস্ত্রী
অধ্যক্ষ, বেঙ্গল মিউজিক কলেজ, কলিকাতা
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ও ডিন, চারুকলা অনুষদ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

দীপায়ন ॥ ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট ॥ কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত, সঙ্গীতের প্রবহমান ধারা।

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় সঙ্গীত এবং তার উৎস

ভারতীয় সঙ্গীত, ভারতীয় সঙ্গীতের দার্শনিক তাৎপর্য, ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস, সিন্ধুসভ্যতার যুগ, বৈদিক যুগের সঙ্গীত, উপনিষদে সঙ্গীত পুরাণ সাহিত্যে সঙ্গীত। (১-১৭)

দ্বিতীয় অধ্যায়

উৎস থেকে ক্রমবিকাশের পথে

বৈদিকোত্তর যুগের সঙ্গীত, গান্ধর্ব ও মার্গ সঙ্গীত, দেশী সঙ্গীত ও লোক সঙ্গীত, পাণিনি ও পতঞ্জলির যুগের সঙ্গীত, জাতকের যুগে গান্ধর্ব গান, নারদীয় শিক্ষায় সঙ্গীত, ভরতের নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত, নাট্যশাস্ত্রোত্তর কয়েকটি গ্রন্থ, জাতিরাগ। (১৮-৩৭)

তৃতীয় অধ্যায়

প্রবন্ধ সঙ্গীত

প্রবন্ধের ধাতু, প্রবন্ধের অঙ্গ, প্রবন্ধের জাতি, প্রবন্ধের প্রকারভেদ, বিভিন্ন প্রকার প্রবন্ধ, শুদ্ধ সূড় প্রবন্ধ, আলিজাতীয় প্রবন্ধ, বিপ্রকীর্ণ জাতীয় প্রবন্ধ, সালগসূড় প্রবন্ধ, ধ্রুব গান এবং ধ্রুবা গান। (৩৮-৫৮)

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় সঙ্গীতের কাঠামো

নাদ, স্বর, শ্রুতি বীণার সাহায্যে শ্রুতি নির্ণয়, গ্রাম, গীতি, জাতি রাগ, মূর্চ্ছনা, গায়কের দোষগুণ। (৫৯-৮১)

পঞ্চম অধ্যায়

সুলতানী আমলঃ ধ্রুপদের সৃষ্টি

আলাউদ্দিন খিলজীর আমল, আমীর খসরু, গোপাল নায়ক, নায়কবৈজু। (৮২-৯৫)

ষষ্ঠ অধ্যায়

গোয়ালিয়র ও বৃন্দাবনের অবদান

মানসিংহ তোমর, মান কুতুহল গ্রন্থ, মানসিংহের সভা গায়কগণঃ বকসু, ভানু, পাণ্ডেয়, মচ্ছু, মথুরা ও বৃন্দাবনের অবদান, হরিদাস স্বামী, হরিদাসের অবদান। (৯৬-১২০)

সপ্তম অধ্যায়

ধ্রুপদের চরম উন্নতির যুগ

তানসেন, তানসেনের সাঙ্গীতিক অবদান, সুরস্রষ্টা তানসেন, ধ্রুপদের চারটি বাণী, গৌরহার খাণ্ডার, ডাগর, নৌহার, নবাৎ খাঁ, তানতরঙ্গ, বিলাস খাঁ, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল, শাহজাহানের রাজত্বকাল, জগন্নাথ কবিরায়, শেখ বহাউদ্দীন, শেখ শের মহম্মদ, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল। (১২১-১৩৭)

অষ্টম অধ্যায়

খেয়াল গানের উদ্ভব ও বিকাশ

খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ, হুসেন শাহ শর্কী, সদারঙ্গ, অদারঙ্গ, মহারঙ্গ, মনরঙ্গ। (১৪৮-১৬৮)

নবম অধ্যায়

টপ্পা গান

শোরী মিঞার টপ্পা, নিধুবাবুর টপ্পা, শ্রীধর কথক এবং কালী মীর্জা। (১৬৯-১৭২)

দশম অধ্যায়

ঠুংরী গান

খাড়ী, লচাও ঠুংরী, ওয়াজেদ আলী শাহ। (১৭৩-১৭৮)

একাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা

ধ্রুপদাঙ্গের কীর্তন, ধ্রুবপদের চর্চা, ধ্রুপদ চর্চার বিভিন্ন কেন্দ্র, খেয়ালের চর্চা, টপখেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী চর্চা। (১৭৯-২০২)

দ্বাদশ অধ্যায়

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ঘরানা

ঘরাণার বৈশিষ্ট্য, ঘরাণার উদ্ভব, সেনী ঘরাণা, বিভিন্ন ঘরাণা। (২০৩-২১৯)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত

মেলকর্তা, দক্ষিণ ভারতীয় ও হিন্দুস্থানী ঠাট ও রাগ। (২২০-২২৬)

চতুর্দশ অধ্যায়

তাল প্রকরণ : উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয়

তাল, তালের প্রয়োজনীয়তা, তালের দশপ্রাণ, ছন্দ ও তাল, দক্ষিণ ভারতীয় তাল পরিচয়। (২২৭-২৩৭)

পরিশিষ্ট (২৩৮)

সাঙ্গীতিক পরিভাষা (২৩৮)

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত

Bharatiya Uchchanga Sangeet

by

Dr. Utpala Goswami

প্রথম প্রকাশ ॥ ১৩৯৭

দ্বিতীয়-সংস্করণ ॥ আশ্বিন ১৪০৫

প্রকাশক ॥ নমিল সাহা

২০ কেশব সেন স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রাকর ॥ সোনা মুদ্রণ

৭৬/২ বিধান সরণী ॥ কলকাতা ৭০০০০৬

একশত টাকা

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত

উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা

ডঃ উৎপলা গোস্বামী এম. এ. পি. এইচ. ডি. সঙ্গীতশাস্ত্রী
অধ্যক্ষ, বেঙ্গল মিউজিক কলেজ, কলিকাতা
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ও ডিন, চারুকলা অনুষদ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

দীপায়ন ॥ ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট ॥ কলকাতা-৭০০ ০০৯

অন্যান্য প্রকাশনা

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতি

বাংলায় দ্বাদশ খণ্ডে প্রকাশিত। প্রতিটি খণ্ডে মূল পুস্তকের সম্পূর্ণ মূলানুগ প্রাঞ্জল অনুবাদ, তত্ত্বগত আলোচনা ও শাস্ত্রীয় পরিচয়, স্বরবিস্তারসহ প্রতিটি রাগের বিশদ পরিচয়, স্বরলিপিসহ প্রতিটি গানের বাণী ও ভাবার্থ দেওয়া হয়েছে।

রাগ-তত্ত্ব মালা

পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস

পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিতব্য সহস্রাধিক রাগের বিস্তারিত শাস্ত্রীয় পরিচয়সহ নানান মতান্তরে প্রতিটি রাগ পরিচয়, আরোহ, অবরোহ, পকড় ও চলন ইত্যাদি সহ এটি রাগসংক্রান্ত একটি বিশাল কোষগ্রন্থ। ইতিপূর্বে এরূপ রাগ সংক্রান্ত কোষগ্রন্থ ভারতীয় কোন ভাষায় প্রকাশিত হয় নি। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

ঠুমরী লহরী

পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস

(তিন খণ্ডে প্রকাশিত)

বিভিন্ন রাগে তিন শতাধিক ঠুমরী স্বরলিপি ও গানের ভাবার্থসহ এই গ্রন্থমালায় গ্রথিত হয়েছে। ইতিহাস ও শাস্ত্রীয় পরিচয়সহ ঠুমরীর বিভিন্ন ঘরাণার গায়কী এবং বিস্তারের ক্রিয়াত্মক কৌশল ক্রমানুসারে তিন খণ্ডে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে ও প্রত্যেক খণ্ডের পরিশেষে গানগুলির একটি রাগানুযায়ী সূচি সংযোজিত করা হয়েছে।

ভজন ও ভক্তিগীতি মালিকা

(দুই খণ্ডে প্রকাশিতব্য)

ভারতের বিশিষ্ট সাধক-সাধিকাগণের প্রায় তিন শতাধিক ভজন ও ভক্তিগীতি স্বরলিপিসহ সংগৃহীত হয়েছে। ইতিহাস, তত্ত্বগত ও ক্রিয়াত্মক বিষয়সমূহের বিস্তারিত আলোচনাসহ একটি অনন্য গ্রন্থ।

পরমপূজনীয়
শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীমতি রাণী মুখোপাধ্যায় স্মরণে

প্রকাশিত অন্যান্য বই

□ সপ্ত-তন্ত্রিকা তত্ত্ব □

পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস

সমগ্র গ্রন্থটি আনুমানিক সাত হাজার পৃষ্ঠার। এই গ্রন্থমালাটি নয় ভাগে প্রকাশিত হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়েছে, প্রতি ভাগের দুই খণ্ড হিসাবে মোট চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী খণ্ডগুলির কাজ চলছে। এই গ্রন্থে সেতারসহ সমগোত্রীয় সমস্ত ধরনের তারযন্ত্রের বিস্তারিত পরিচয়, সেতার বাদন পদ্ধতি, বিস্তারিত শাস্ত্রীয় আলোচনা, স্বরবিস্তারসহ ৩১২টি রাগ-পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি রাগ-পিছু ৬ থেকে ৩৫টি পর্যন্ত গৎ এবং সম্পূর্ণ গ্রন্থটিতে ১৫০টি বিভিন্ন তালে মোট গৎ সংখ্যা ৩৭০০ দেওয়া হয়েছে। সেতার সহ তত, বিতত ও শুষির জাতীয় সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের (যাতে স্বরসপ্তক বাজানো যায়) তত্ত্ব ও অনুশীলনের বিষয়ে এটি একটি মৌলিক আকর গ্রন্থ। এরূপ গ্রন্থ এখনও পর্যন্ত শুধু বাংলা ভাষায় নয়, ভারতীয় কোন ভাষাতেই প্রকাশিত হয়নি। এই গ্রন্থটি এ বিষয়ে একটি কোষগ্রন্থের মর্যাদা লাভ করবে বলে আশা করা যেতে পারে। পাঠকবর্গের সুবিধার্থে প্রতিটি ভাগের প্রতিটি খণ্ডের মধ্যে সমগ্র গ্রন্থটির নয় ভাগের সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু এবং পূর্ণাঙ্গ সূচীপত্র দেওয়া হয়েছে।

□ গজল-এ-গুলিস্তাঁ □

পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস

(তিন খণ্ডে)

ভারতবর্ষের বিশিষ্ট কবি ও গায়কগণের প্রায় ২২৫টি গজল গানের বাণী স্বরলিপি ও ভাবার্থসহ তিন খণ্ডে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গজলের ইতিহাস, গায়নের তত্ত্বগত ও ক্রিয়াত্মক বিষয়সমূহের বিস্তারিত আলোচনাসহ এটি একটি অনন্য গ্রন্থ।

'ধ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' নামে যে বইটি আমি লিখেছিলাম সেটা পি এইচ. ডি-র গবেষণাপত্র। গবেষণাপত্রটি গৃহীত হবার পরে এবং বইটি সম্পর্কে আগ্রহ পরিলক্ষিত হওয়ায় আমি স্থির করি যে, বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে এর পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করব। সেটা করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে একটা নতুন বই-এর কলেবর ধারণ করায় আমি বইটির নতুন নামকরণ করলাম। এখানে আমি সামগ্রিকভাবে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটা মোটামুটি পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। তবে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার পরিচয়ই বিস্তৃত করা হয়েছে। আলোচনা ধ্রুপদ ও খেয়াল—মাত্র এই দুটি সঙ্গীত ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি বলেও নতুন করে নামকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

'ধ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ'-এর মুখবন্ধ

পড়াশুনায় হাতেখড়ি আর সুরের সাধনা একই সঙ্গে আমার জীবনে শুরু হয়েছিল। তাই আজও কোনওটিকে জীবন থেকে পৃথক করতে পারি না। পড়াশুনা আর গান একই সঙ্গে চলে আসায় গানের ব্যবহারিক দিকটার দিকে যত জোর দিয়েছি, ঔপপত্তিক জ্ঞানের তৃষ্ণা তত বেড়েছে। এরই ফল এই গ্রন্থ।

যে বিষয় নিয়ে আমি গবেষণা করেছি সে সম্পর্কে বহু মত ও বহু পথ বর্তমান। আমাদের দেশের সঙ্গীতের ইতিহাসটি কিংবদন্তীর আড়ালে চাপা পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কিংবদন্তীর ওপরে ঐতিহাসিক কাহিনী দাঁড় করানো হয়েছে, চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এইগুলিই আজ আবার ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। অথচ প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রগ্রন্থের অভাব নেই। তাছাড়া মধ্যযুগের বিদেশী ঐতিহাসিকেরা রাজরাজড়াদের উত্থান-পতনের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে, সমাজ, সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীতেরও পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি সম্ভবত ঐ সব সঙ্গীত-শাস্ত্রগ্রন্থ ও ইতিহাস থেকে ধ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারার একটা স্পষ্ট পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। কতটা সার্থক হয়েছি তার বিচার করবেন সহৃদয় পাঠকেরা।

তবে একটি কথা আমি এখানে সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই এবং তা হচ্ছে এই যে, তথ্য অনুসন্ধানের সময় পণ্ডিত রতন জংকার-এর এই কথাটি আমি সব সময়ে মনে রেখেছি—'ধর্ম', ভাষা ও শিল্পের মত সঙ্গীতও মানুষের সৃষ্টি। হতে পারে, সচেতন প্রচেষ্টা ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঙ্গীত এসেছে। কিন্তু সব সঙ্গীতই মানবধর্মী।'

'ধ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ'—এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণার কাজে আমাকে উৎসাহিত করেন সঙ্গীত রত্নাকর রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই, তাই এই গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষণে তাঁকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি।

যে গবেষণালব্ধ ফল এই গ্রন্থ সেই গবেষণার কাজ আগাগোড়া স্বামী প্র‌– ‌ন্দ মহারাজের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে। এ জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ তাঁর অকৃপণ স্নেহ ব্যতীত এই গবেষণা সুষ্ঠুভাবে চালান সম্ভব ছিল না।

এই গবেষণার কাজে আরও যাঁদের সহৃদয় সহযোগিতা লাভ করেছি তাঁরা হলেন শ্রীনিত্যপ্রিয় ঘোষ দস্তিদার, শ্রীউদয় ভূষণ ভট্টাচার্য, এসিয়াটিক সোসাইটির ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান শ্রীদ্বিজেন্দ্র গুপ্ত, সুজাতা গুহ ও অঞ্জলি ঘোষ দস্তিদার।

উৎপলা গোস্বামী

সঙ্গীতের ইতিহাস লেখা বেশ কঠিন কাজ, কারণ সঙ্গীতের সঙ্গে এত রকম বিষয় জড়িয়ে রয়েছে যেগুলোর সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকলে যে কোনও শ্রেণীর সঙ্গীতের সঠিক ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। যেমন, স্বর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে ধ্বনিবিজ্ঞান বা নাদবিদ্যার প্রগাঢ় জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এটি না থাকলে গানের সুরগত বিবর্তন সম্বন্ধে কোনওরকম আলোকপাত করা সম্ভব নয়। আবার মজা এই যে, নাদবিদ্যাকে আয়ত্ত করতে হলে একদিকে পদার্থবিদ্যার সঙ্গে এবং অপরদিকে সংস্কৃত ভাষায় লেখা প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকা আবশ্যক। গানের আছে সাহিত্যাংশ বা পদ যার আলোচ্য বিষয় ভাষা, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দ, ভাব ইত্যাদি। গানের তাল অংশেও আছে ছন্দ, লয়, গ্রহ, প্রস্তার ইত্যাদি। সঙ্গীতের দুটি দিক: (১) ক্রিয়াত্মক, (২) ঔপপত্তিক। ঔপপত্তিক দিকগুলো যদিও-বা দীর্ঘকাল পড়াশুনা করে আয়ত্ত করা গেল, কিন্তু ক্রিয়াত্মক বা ব্যবহারিক দিকটি সঠিকভাবে আয়ত্ত করা এবং তার মান ঠিক রাখা সহজ ব্যাপার নয়। সাধারণত একটি বা দুটি সঙ্গীত-শৈলী শিখতেই জীবনের বেশ কিছুটা সময় চলে যায়—জনপ্রিয়তার মঞ্চ পাওয়া গেলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, সঙ্গীতের সার্বিক জ্ঞানার্জনের ভাবনাগুলো জলসাঘরের মায়াময় ভুল-ভুলাইয়ায় পথ হারায়। যে কোনও বিষয়ের ইতিহাস রচনায় লেখনী ধরলে প্রয়োজন হয় সেই বিষয়টি ছাড়াও দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উত্থান-পতনের রূপরেখার পূর্ণ জ্ঞান। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এটি অত্যন্ত জরুরি।

সঙ্গীত হল 'পারফর্মিং' আর্ট' (ক্রিয়াত্মক কলা বা বিদ্যা)। আগে সুর, তবে তার পরিভাষা। আগে ছন্দ, তবে তার সংজ্ঞা। এই বিদ্যা একের শরীর থেকে অন্যের শরীরে যায় শ্রবণ, নয়ন, প্রতিভান এবং (বার্তাবাহী) বাতাসের সাহায্যে। ফিলিং এবং জাজমেন্ট-এর পরিখা পার হয়ে হৃদয়ের ভূমিতে সঙ্গীতের শেকড় প্রোথিত করার ভূমিকাকে লেখনীর আঁচড়ে ধরে রাখা যেন আলেয়ার পিছে ছোটা। তবু যুগে যুগে মানুষ এই কাজে ব্রতী হয়েছে—আমিও তারই একজন উত্তরসূরি মাত্র। পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া বিদ্যার অবগাহন করে আমার মতো সামান্য মানুষের বোধের ঘরে যতটুকু সঙ্গীত-ইতিহাসের আলো পড়েছে তা থেকে বুঝেছি যে বৈদিক যুগে সামগানের যে রূপ ছিল গবেষকগণ তার ক্ষীণমাত্র খুঁজে পেলেও সে গানের শৈলী বৈদিক বাতাসে মিলিয়ে গেছে। প্রতিটি মানুষের চলা এবং চলার চাল আলাদা। ঠিক তেমনি প্রতিটি যুগের ভাবনার গতিপ্রকৃতিও এক নয়। তবু মানুষের কালজয়ী অনুভবের রূপরেখা ঐতিহাসিকের উৎসাহে আলো ফেলে।

গবেষকগণ শিলালিপি, ধ্বংসাবশেষ-স্তূপ থেকে মুদ্রা, মূর্তি ইত্যাদির পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে অতীতের দিনপঞ্জী অথবা ইতিহাস রচনা করেন। শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, রাজ্যেশ্বর মিত্র প্রমুখ পণ্ডিতগণের দীর্ঘ গবেষণা সঙ্গীতের ইতিহাসের অনেক অন্ধকার দূর করেছে। কিন্তু তবুও 'তবু' শব্দটি থেকেই যায়। কারণ আজ যখন বিজ্ঞানের আশীর্বাদে পারফর্মিং আর্ট-এর স্বভাবকে ধরে রাখার যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও ভারতের মূল (বর্তমানের নিরিখে) সঙ্গীত (গীত, বাদ্য, নৃত্য) বেঁচে থাকার পথ পাচ্ছে না—তখন হাজার হাজার হাজার বছর আগের খুঁজে পাওয়া অস্থি অথবা মূর্তি সে সময়ের সুর-ছন্দ-লয়ের কতটুকুর খবর দিতে পারবে? তবুও তার ইতিহাস লেখা হয়েছে-হচ্ছে-হবে। স্মৃতির প্রেরণা যুগে যুগে মানুষকে অন্বেষণের পথে ঠেলে দিয়েছে। যা কিছু সত্য, যা কিছু সুন্দর, তার উৎসে পৌঁছতে মানুষকে অনুমানের তরী বাইতেই হবে।

'ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হল। এর জন্য আমি শ্রী সলিল সাহা মহাশয় এবং দীপায়ন প্রকাশনার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রী অসীম কুমার সাহা মহাশয়কেও। পরিশেষে জানাই—পাঠক-পাঠিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই গ্রন্থ গ্রহণীয় হলে তবেই আমার শ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হবে ☐

উৎপলা গোস্বামী
২৬।৭।৯৪

ভারতবর্ষের সমাজ ও সভ্যতা পর্যালোচনা করে একাদশ শতাব্দীতে মনীষী আল্‌বেরুণী বলেছিলেন, 'হিন্দুরা এক এবং অবিভক্ত এক জাতি।'[1] ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ ভারতবর্ষ সম্পর্কে লিখেছেন, 'India offers unity in diversity'—অর্থাৎ ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বিরাজমান। আর এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লেখা 'The Music of India' বইতে (পৃঃ ১) হার্বার্ট এ. পপ্‌লে লিখেছেন, 'ভারতীয় সঙ্গীতে একটি অন্তর্নিহিত ঐক্য রয়েছে। এই সঙ্গীতের আত্মা এক।' তিনি আরও লিখেছেন, 'ভারতবর্ষ সম্পর্কে যিনি জ্ঞানলাভ করতে চান, তিনি যদি উত্তর থেকে দক্ষিণে ভ্রমণ করতে থাকেন, তা হলে দেখতে পাবেন বার বার একই ভারতবর্ষ কথা বলছে। একই রহস্যময় ভক্তির পরিবেশ, সমস্ত ভক্তের অন্তরে একই রকম ভক্তি, বীর ও সাধুদের সম্পর্কে একই ধরনের কাহিনী ও কিংবদন্তী প্রচলিত, একইভাবে কৃষিকার্য চলছে, ব্যবসায়ও চলেছে একই ভাবে, একই ধরনের পল্লীগৃহ এবং সমস্ত কলাশিল্পের পিছনে একই মনোবৃত্তি কাজ করছে' (পৃঃ ১)। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায়, এই বিরাট ভারতবর্ষের প্রকৃতি এবং জনসাধারণের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও একটা সাংস্কৃতিক ঐক্য রয়েছে। সংস্কৃতির অন্যতম ঐকান্ত্র সঙ্গীত সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিচিত্ররূপ সত্ত্বেও সমস্ত রাজ্যের সঙ্গীত একই ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর ভাণ্ডারে যেমন সিন্ধুর সৈন্ধবী, বঙ্গের বাঙ্গালী, সুরাটের সৌরাটি, কর্ণাটের কর্ণাটি, কলিংগের কালেংগরা, মুলতানের মুলতানীর একত্র সমাবেশ ঘটেছে, তেমনি মূল গায়নপদ্ধতিও দাঁড়িয়ে আছে একই ঐতিহ্যসমন্বিত ভিত্তির ওপরে।

ইদানীংকালে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত এবং দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত, প্রধানত এই দুটি নামে ভারতীয় সঙ্গীত চিহ্নিত হয়েছে এবং দুটি সুস্পষ্ট ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। আবার একদিকে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা, ভজন, কীর্তন, রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং কত লোকসঙ্গীতের ধারা, অন্যদিকে রাগমালিকা, কৃতি, পদম, জাবলি, তিল্লানা, স্বরজতি, জাতিস্বরম্, বর্ণম—এমনি কত বিচিত্র ধারা। এগুলির গতি প্রকৃতি অনুধাবন করলে আমরা দেখতে পাব—এই প্রবাহ ভারতের নদীগুলরই মতো। মানস সরোবর থেকে হিমালয়ের বুক বেয়ে

১। আলবেরুণীর পুরো নাম আবু রয়হান মহম্মদ ইব্‌নে আহ্‌মদ আল বেরুণী। সুলতান মামুদের আমলে (১১শ শতাব্দী) ইনি ভারতে আসেন। ইনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন তার নাম 'কিতাব-আত্‌ তহকীক আল্‌-হিন্দ্‌'। এই গ্রন্থেই উল্লিখিত মন্তব্যটি করা হয়েছে।

যে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-সিন্ধুর ধারা সমতলভূমিতে নেমে এসেছিল তা নানান প্রবাহে বিভক্ত হয়েছে, নানা ধারা এসে তাদের সঙ্গে মিশেছে, নানান নামে চিহ্নিত হয়েছে, তারপর এসে মিশেছে একই মহাসাগরে। তেমনি, আজ যে সঙ্গীত-ধারাগুলিকে নানা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদেরও উৎসস্থল এক। যুগে যুগে যেমন ভারতের তীর্থক্ষেত্রে বহু মানুষের ধারা এসে মিলেছে এবং তার ফলে গড়ে উঠেছে এক বিশাল জাতি—ভারতবাসী, ঠিক তেমনি যুগে যুগে নানা বিচিত্র সঙ্গীতের ধারা ভারতীয় সঙ্গীতকে পুষ্ট করেছে এবং মিশে গেছে ভারতীয় সঙ্গীতের বিরাট কলেবরে। এই বিচিত্র ধারার মধ্যে রয়েছে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা।

এই পৃথিবীতে অনেক কিছুরই উদ্ভব ঘটে এবং অনেক কিছুই হারিয়ে যায়। তবুও কবি বলেছেন—

'যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।"

এটা শুধু কবির বিশ্বাস নয়, এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। নদীর প্রাণচঞ্চল উচ্ছল ধারা হারিয়ে যায় মরুভূমির বালুকা-রাশির মধ্যে। কিন্তু সেইখানেই তার শেষ নয়। সেই হারিয়ে যাওয়া ধারাই অন্যভাবে এবং অন্যরূপে প্রবাহিত হয়, কিংবা অন্তঃসলিলা ফল্গু-ধারার মতো অন্তরে রস বিস্তার করে চলে। তেমনি জাতির প্রাণ-রস শুকিয়ে যখন মরুর সৃষ্টি হয় তখন তার সংস্কৃতির ধারা যায় সেই মরুতে হারিয়ে। যেমন এদেশে হারিয়ে গেছে সামগান, মার্গসঙ্গীত এবং প্রবন্ধ সঙ্গীতের ধারা। আজকের সঙ্গীতের কলেবরে সেইসব ধারার প্রকাশ্য স্বাক্ষর খুঁজতে গেলেও আমাদের অসুবিধায় পড়তে হবে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতীয় সঙ্গীতের অন্তরে তাদের মন্দাকিনী ধারা অব্যাহত। মূল ভূমিকা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে কোনও জাতি জাতীয় সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে না এবং তা করলে তা আর যা-ই হোক জাতীয় সংস্কৃতি হয় না। এ-যুগের একটি স্বতন্ত্র সঙ্গীত-ধারার স্রষ্টা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উক্তি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়: 'ভারতবর্ষের বহুযুগের সৃষ্টি করা যে সঙ্গীতের মহাদেশ, তাকে অস্বীকার করলে দাঁড়াব কোথায়।...সেই সঙ্গীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি।'[১] 'তবুও যত দৌরাত্ম্যই করি না কেন, রাগরাগিণীর এলাকা একেবারে পার হতে পারিনি। দেখলাম তাদের খাঁচাটা এড়ানো চলে কিন্তু বাসাটা তাদের বজায় থাকে।'[২] তাই আমিও বলতে চাই যে, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিচিত্র বিহঙ্গ আপন আপন ডানায় ভর করে মুক্ত আকাশের যেখানেই উড়ে চলুক তাদের 'বাসাটা' (অর্থাৎ বুনিয়াদ) প্রাচীন ভারতীয় অভিজাত সঙ্গীতের মহাদেশে।

১। সুর ও সঙ্গতি, পৃঃ ৮।
২। 'সঙ্গীতের মুক্তি', প্রবন্ধ ছন্দ, পৃঃ ১৮১।

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস অতি প্রাচীন। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী এই সব ধারা স্বতন্ত্রভাবেই পরিচিতি লাভ করেছে। ভারতের যে মূল সঙ্গীত-কাঠামো থেকে ধীরে ধীরে এইসব ধারাগুলির সৃষ্টি হয়েছে তা অতি প্রাচীন। কারণ ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস যে সামবেদ, তার রচনা কাল কমপক্ষে ১২০০-১০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ।[১] আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ২৫০০ থেকে খ্রিঃ পূঃ ২০০০ এর মধ্যে আর্যরা ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁরা ভারতবর্ষে যে সভ্যতা গড়ে তোলেন সেই সভ্যতার যুগ শুধু ভারতের নয়, বিশ্ব সভ্যতার একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। এই অধ্যায়ে রয়েছে সাহিত্য, শিল্প, দর্শনের সঙ্গে সঙ্গীতের স্বাক্ষর।

গ্রামগেয়, অরণ্যগেয়, ঊহ্য ও ঊহ—এই চারটি গানভাগ নিয়ে সামবেদের সঙ্গীতাংশ গঠিত হয়েছে। গ্রামগেয় গান—মূল গান। ঊহ ও ঊহ্য গানের মূল সুর ঐ গ্রামগেয় গান থেকেই সৃষ্টি হত। অরণ্যবাসী ঋত্বিক ও সাধকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল অরণ্যগেয় গান এবং গ্রামবাসী, গোষ্ঠী বা সাধারণ শ্রেয়কামীদের জন্য গ্রামগেয় গান।

গ্রামগেয় গান গাওয়া হত সাধারণ সমাজে। এতে পূর্বার্চিকের (ছন্দরূপ আর্চিককে পূর্বার্চিক বলে) সংযোজন ছিল। অরণ্যগেয় গান নির্ধারিত ছিল অরণ্যবাসী যাজ্ঞিকদের জন্য। এই গানকে অলৌকিক এবং পবিত্র হিসাবে গ্রহণ করা হত। এই গানের অন্তর্ভুক্ত ছিল আরণ্যক সংহিতা। ঊহ গানগুলি গ্রামগেয় গানের মতোই ছিল। ঊহ অর্থ উপযোগী করে সংযুক্ত করা।

গ্রামগেয় গান সাধারণ সমাজের জন্য নির্দিষ্ট থাকায় সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের সমাজে তার আদর হয়। অন্যদিকে অরণ্যগেয় গান অরণ্যচারী অধ্যাত্ম শান্তিকামী ঋষি ও ঋত্বিকদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। এই দু-প্রকার গানের মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীনতর তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও দুটিই যে বৈদিক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বৈদিক যুগ বলতে শুধু চারটি বেদের প্রচলন কালকেই বোঝায় না, উপনিষৎ, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ ও সূত্র সাহিত্যগুলির প্রণয়ন, সংকলন এবং প্রচলন কালকেও বোঝায়। তাই বৈদিকযুগের পরিসর ঋক্‌বেদের কাল থেকে 'শিক্ষা' ও 'প্রাতিশাখ্য'-এর কাল পর্যন্ত (খ্রিঃ পূঃ ৩০০০—১ম শতাব্দী)। বৈদিকগান বা সামগানের প্রচলন এই কাল ব্যবধানের মধ্যেই ছিল। বৈদিকোত্তর যুগে অর্থাৎ খ্রিঃ পূঃ ৬০০-খ্রিঃ পূঃ ৫০০-এর মধ্যে গান্ধর্ব সঙ্গীত তথা মার্গসঙ্গীত নবজন্ম লাভ করে। বৈদিক সঙ্গীতের উপাদান নিয়ে এই গান্ধর্বের কাঠামো রচিত হয়েছিল। রামায়ণ-এর যুগে (খ্রিঃ পূঃ ৪০০) গান্ধর্ব তথা মার্গসঙ্গীতের প্রচলন দেখা যায়। খ্রিস্টীয় শতাব্দীর প্রথম থেকে 'প্রবন্ধ' সঙ্গীতের কথা পাওয়া যায়।

১। ম্যাক্সমূলারের মতে বেদ ও ব্রাহ্মণের রচনাকাল এইরূপ। কোনও কোনও ঐতিহাসিক ঋকবেদের রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ শতক বলে মনে করেন। উইন্টারনিৎস-এর মতে ঋকবেদের সংকলনের বয়স খ্রিঃপূঃ ২৫০০ বছরের বেশি নয়।

ধ্রুপদ সঙ্গীতের সৃষ্টি বহু পরে, তবে এটা এসেছে মার্গ এবং প্রবন্ধ সঙ্গীতের ধারা বেয়ে।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত

খ্রিস্টীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দী ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ের মধ্যে রাগ-নাম কল্পনা, রাগরূপ, রাগবিকাশের মধ্য দিয়ে রাগের আভিজাত্য সৃষ্টি হয়। সমগ্র ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই একটা শুদ্ধিযজ্ঞের সূচনা হয়। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে রাগ-নামগুলিই তার প্রমাণ। এই শুদ্ধিযজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল আর্য ও অনার্য অধিবাসীদের দেশীয় ও জাতীয় গানের সুরগুলিকে পরিশুদ্ধ করে অভিজাত রাগগোষ্ঠীভুক্ত করা। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের দেশীয় ও জাতীয় সুরগুলি এই সময় সংস্কৃত হয়ে অভিজাত রাগতালিকায় স্থান পেল বটে, কিন্তু তাই বলে এই তালিকায় উত্তর ও দক্ষিণ, এই ধরনের কোনও চিহ্ন রইল না, বরং সবগুলিই অখণ্ড ভারতের রাগ বলে গণ্য হতে লাগল।

প্রখ্যাত তামিল নাটক 'শিলপ্পাদিকরম্'-এ দক্ষিণ-ভারতের প্রাচীন সঙ্গীতের উল্লেখ আছে। এতে কড়ু (দ্রুত), তাসেই (লয়), তুক্কু (গুরু), অলবু (প্লুত) এবং চীর (অনুদ্রুত) প্রভৃতি কাল বা তালের পরিচয় আছে। তামিল সাহিত্য প্রধানত ইয়াল, ইসাই ও নাটকম—এই তিন ভাগে বিভক্ত এবং ষড়জাদি সাতটি লৌকিক স্বরের নাম কুরাল, তুতাম, কৈক্কলাই, উলাই, ইলাই, বিলারি ও তারম। উত্তর ভারতীয় ষড়জাদি সাত স্বর থেকে এরা নামে পৃথক, কিন্তু প্রয়োগ পদ্ধতি পৃথক ছিল না।

চালুক্য রাজাদের রাজত্বকালে লেখা রাজা সোমেশ্বর-এর 'মানসোল্লাস' গ্রন্থে (১১৩১ খ্রিঃ) সঙ্গীত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই গ্রন্থে আলোচিত গীতবিনোদ (গীতাধ্যায়) ও বাদ্যবিনোদ (বাদ্যাধ্যায়) পার্শ্বদেবের 'সঙ্গীত সময় সার' (খ্রিঃ ৯ম থেকে ১১শ শতাব্দীর মধ্যে লেখা) এবং শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত-রত্নাকর' গ্রন্থে আলোচিত গীত ও বাদ্য অধ্যায়েরই অনুরূপ। সুতরাং দেখা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে গীতি, রাগ ও বাদ্যের অভিজাতরূপ, গতি ও বিকাশ প্রায় এক ধরনেরই ছিল।

এই সময় আমরা পাই সঙ্গীতশাস্ত্রী শার্ঙ্গদেবকে (১২১০-৪৭ খ্রিঃ)। শার্ঙ্গদেব দেবগিরি রাজ্যের যাদব বংশীয় রাজসভায় প্রধান সঙ্গীতাচার্য ছিলেন। এই সময় মারাঠা সাম্রাজ্য দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই জন্যই অনুমান করা চলে যে, শার্ঙ্গদেব দক্ষিণ ও উত্তর ভারত—এই দুই অঞ্চলের সঙ্গীত ধারারই সংস্পর্শে আসেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'সঙ্গীত-রত্নাকর' পাঠ করলে সেই কথাই মনে হয়। তবে তিনি দুটি ধারার কোনও পার্থক্য নির্দেশ করেননি।

উত্তর ভারতীয় (হিন্দুস্থানী) এবং দক্ষিণ ভারতীয় (কর্ণাটক)—এই দুই

নামে ভারতীয় সঙ্গীত নতুনভাবে চিহ্নিত হয় শার্ঙ্গদেবের প্রায় ১০০ বছর পরে। তখন খিলজী সুলতানরা দিল্লীর মসনদে সমাসীন। এই সময় চালুক্যরাজ হরিপালের লেখা 'সঙ্গীত-সুধাকর' গ্রন্থে এই দুটি পৃথক নাম দেখতে পাওয়া যায়। গ্রন্থটি ১৩০৯ থেকে ১৩১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লেখা।

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে উত্তর ভারতের সঙ্গীতে পারসীক সঙ্গীতের অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে এবং তার ফলে ভারতীয় সঙ্গীতের রূপ পদ্ধতির পরিবর্তন সূচিত হয়। তথাপি অনেকের মতে, এই সময়েও দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের এই দুটি স্পষ্ট ও পৃথক ধারার উৎপত্তি হয়নি। চতুর্দশ শতাব্দীতে মাধব বিদ্যারণ্য প্রবর্তিত ১৫টি মেল রাগ তথা জনক রাগ এবং ৫০টি জন্য রাগ ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করলেও তার ফলে ভারতের অখণ্ড সঙ্গীত-ধারার মধ্যে কোনও ব্যবধান সৃষ্টি হয়নি। তাই কারও কারও মতে যখন মাধব বিদ্যারণ্যের জনক ও জন্য রাগগুলির ওপর ভিত্তি করে পণ্ডিত রামামাত্য ২০টি জনক মেল ও ৬০টি জন্য রাগ এবং সোমনাথ ২৩টি মেল রাগ ও ৭৭টি জন্য রাগ সৃষ্টি করেন, তখন থেকেই পার্থক্যের লক্ষণ সূচিত হয়। তারপর ১৭শ শতাব্দীতে বেংকটমখী যখন ৭২টি মেল রাগ তথা মেল কর্তার প্রচলন করেন, তখন থেকে বলতে গেলে উত্তর ও দক্ষিণ দুটি স্বতন্ত্র ধারা স্পষ্ট হয়।

কিন্তু এই পার্থক্যও বৈচিত্র্যের জন্য পার্থক্য। কারণ সুর, তাল একটু হাল্কা এবং দ্রুত, কি ছোট তান দিয়ে সুরের বিস্তার, এমনকি রাগ-রাগিণীর নামের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে ঐক্যসূত্র বর্তমান, কারণ, উভয় সঙ্গীতের ভিত্তি এক।

সঙ্গীতের প্রবহমান ধারা

ভারতীয় সঙ্গীতের ভিত্তি বৈদিক যুগেই রচিত হয়েছিল। যদিও একথা অনস্বীকার্য যে, সুপ্রাচীন আদিম লোকসঙ্গীতের ধারা ও অনুশীলন সকল দেশেই বিদ্যমান ছিল। তার পর থেকে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। বিভিন্ন হিন্দু রাজা সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এঁদের মধ্যে কোনও কোনও নরপতি নিজেরাই সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ নাম করা যেতে পারে সমুদ্রগুপ্তের (৩৩০—৩৭৫ খ্রিস্টাব্দ)। সাহিত্যিক, কবি, শাস্ত্রজ্ঞ এবং সঙ্গীতানুরাগী হিসাবে তিনি অসামান্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। হরিষেণ রচিত 'এলাহাবাদ-প্রশস্তি'তে তাঁকে 'কবিরাজ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর নামাঙ্কিত বহু মুদ্রায় তাঁর বীণা বাদনরত মূর্তি আছে।

সমুদ্রগুপ্তের পরে আর-একজন বিদ্যোৎসাহী নরপতি হর্ষবর্দ্ধন (৬০৬-৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁর অর্থ ও অনুগ্রহপুষ্ট নালন্দা যেমন এশিয়ার বৃহত্তম বিদ্যাচর্চার

কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, তেমনি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীতেরও যথেষ্ট উন্নতি ও প্রসার ঘটেছিল। হর্ষবর্দ্ধন নাট্যকার ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। প্রতিহার বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি ভোজের পুত্র মহেন্দ্র পালের রাজত্বকালে (৮৮৫-৯১০ খ্রিস্টাব্দ) শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল। 'কর্পূরমঞ্জরী' নাটকের রচয়িতা রাজশেখর মহেন্দ্র পালেরই সভাসদ ছিলেন।

সপ্তম শতাব্দী থেকেই ভারতে মুসলমানদের আক্রমণ শুরু হয়। সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করেন একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মহম্মদ ঘোরী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন এবং এই সময় থেকেই মুসলমান যুগের শুরু। এই দ্বাদশ শতাব্দীতে আমরা জয়সিংহ, সোমেশ্বর, নান্যদেব, পরমর্দী, জগদেবমল্ল, হরিপাল, সোমরাজ প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞের নাম পাই। এঁরা সবাই প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতেরই অর্থাৎ মার্গ এবং প্রবন্ধ সঙ্গীতের চর্চা করেছেন। প্রাচীন সঙ্গীতের সুবর্ণযুগের অবসান এই দ্বাদশ শতাব্দীতেই ঘটে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতীয় সঙ্গীতের জয়যাত্রা আবার নতুন করে শুরু হয়।

মুসলমান রাজশক্তি উত্তর ভারতে যত সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, দক্ষিণ ভারতে তা পারেনি। তাঁদের রাজধানী ছিল উত্তর ভারতে এবং সমগ্র দক্ষিণ ভারত তাঁরা কোনও দিনই জয় করতে পারেননি। প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব দক্ষিণ ভারত জয় করতে গিয়ে নিজের জীবনের অবসান ঘটান।

উত্তর ভারতে মুসলমান রাজশক্তির সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল। মুসলমান বাদশাহদের রাজসভায় হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর গুণী ব্যক্তিরাই স্থানলাভ করেছিলেন। সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের মতো ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে আরব ও পারস্যের সঙ্গীতেরও মিশ্রণ ঘটেছিল। তার ফলে উত্তর ভারতের সঙ্গীত-ধারা নতুন পথে প্রবাহিত হচ্ছিল। এই সংস্কৃতি সমন্বয়ের যুগেও, এমনকি তার পরবর্তীকালেও দেখা যায়, খাঁটি ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখবার লোকের অভাব হয়নি। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বৃন্দাবনের সঙ্গীতচর্চাই তার প্রমাণ। পরবর্তীকালে প্রাচীন ধারা একেবারে লুপ্ত হয়ে না গেলেও মুসলমান যুগ থেকে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তা চলতে থাকে এবং নতুন নতুন সঙ্গীতধারার সৃষ্টি হয়। এই পরিবর্তনের ধারাতেই আমরা যেমন পেয়েছি ধ্রুপদ এবং খেয়াল, তেমনি পেয়েছি ঠুংরী, টপ্পা প্রভৃতি।'

ভারতীয় সঙ্গীত ও তার উৎস

সঙ্গীতসৃষ্টির সঙ্গে আমরা যেমন আমাদের দেবদেবীদের যুক্ত করে দিই, পাশ্চাত্য দেশেও ঠিক তেমনটিই করা হয়ে থাকে। ইংরেজি music শব্দটা এসেছে muse থেকে। গ্রীক দেবতা Zeus এবং দেবী Nemesis-র নয় কন্যাকে বলা হয় muse। এরূপ বিশ্বাস প্রচলিত যে, এঁরাই কবি ও গায়ককে অনুপ্রাণিত করেন এবং ফলে কবিতা, গান প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। আজকের মানুষ অবশ্য জানে সঙ্গীত মানুষেরই সৃষ্টি এবং তার প্রত্যক্ষ প্রেরণাও মানুষ ও তার প্রতিবেশ।

Music শব্দের আভিধানিক অর্থ ইংরেজিতে এইরূপ: "Art of combining sounds with a view to beauty of form and expression of emotion." বাংলায় আমরা বলতে পারি—স্বরসমূহের যে বিশিষ্ট রচনা মানুষকে উদ্দীপিত করে, তাই সঙ্গীত। সঙ্গীতকে 'পরাবিদ্যা' বা 'ব্রহ্মবিদ্যা' বলা হয়ে থাকে। সঙ্গীত মূলত নাদ-বিদ্যা। বৃহদ্দেশী রচয়িতা মতঙ্গ থেকে শুরু করে অন্যান্য সঙ্গীতশাস্ত্রীগণ প্রায় সকলেই বলেছেন সূক্ষ্ম শব্দ "নাদ"ই সঙ্গীতসৃষ্টির কারণ।

নাদ দু'রকম—অনাহত এবং আহত। শুধুমাত্র শব্দতরঙ্গে ধ্বনিত হতে থাকে অনাহত নাদ আর আহত নাদের বিকাশ হতে থাকে প্রাণবায়ু ও ইচ্ছাশক্তির মিলনে। এই আহত নাদই রয়েছে সঙ্গীতসৃষ্টির মূলে।

সঙ্গীতকে পুরোপুরি বিশ্লেষণ করতে গেলে তিনটি দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত : (১) সঙ্গীতের উৎপত্তিগত বর্ণনা, (২) কলা ও বিজ্ঞান, এই উভয় শাখায় সঙ্গীতের প্রকৃত স্বরূপ, (৩) নানান দার্শনিক ধারণায় ভারতীয় সঙ্গীতের স্থান।

সঙ্গীতের উৎপত্তিবাচক শব্দসমষ্টি হচ্ছে সম্—গৈ—ক্ত অর্থাৎ 'সম্যক গীত'। 'সম্' শব্দের দুটি অর্থ অভিধানে পাওয়া যায় : (১) সমানভাবে বা সমবেতভাবে, (২) সম্যক।

মিঃ উইলিয়মস্ ভারতীয় সঙ্গীতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"It is the art and science of singing with instrumental music and dancing, it is sung in chorus and harmonic. সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে' 'সম্' অর্থে সমানভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বা সমবেত হয়ে। এই সংজ্ঞা থেকে আরও ধারণা করা সম্ভব যে, উইলিয়মস্ যখন এই বর্ণনা দিয়েছেন তখন ভারতে প্রধানত সমবেতভাবে গান করার রীতিই চালু ছিল।

'সম্' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে সম্যক। সম্যক বলতে বোঝায় শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ এবং সর্বশেষে মনোজ্ঞ রূপে। অর্থাৎ সবকটি বিশেষণই একাধারে সঙ্গীতের বর্ণনায় প্রচলিত।

গীত অর্থে সোজা কথায় আমরা গান মনে করে থাকি। কিন্তু গান শব্দটির অর্থ ভারতীয় সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত ব্যাপক। গীত হল তিনটি বিভিন্ন ধ্বনির ও শিল্প বিকাশ রীতির সমবেত রূপ, যা নৃত্য গীত ও বাদ্যে পরিবেশিত হয়।

'গান' শব্দের অন্য একটি অর্থ পাওয়া যায়, যার আখ্যা দেওয়া যায় 'কথন'। সঙ্গীতকে অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত intensified speech বলে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মানুষের কথা বলার, স্বরের উচ্চতা ও নীচতার উপর জোর দিয়েছেন এবং সাঙ্গীতিক সুরের বিকাশকে বলেছেন 'কথা'-ভাষার সুরূপ। রবীন্দ্রনাথ এই তথ্যটির ইঙ্গিত পেয়েছিলেন হারবার্ট স্পেন্সারের লেখা থেকে।

ভারতীয় সঙ্গীত

পাশ্চাত্যের অনুকরণে সঙ্গীতকে কণ্ঠসঙ্গীত (vocal music), যন্ত্রসঙ্গীত (Instrumental music) এভাবে ভাগ করলেও ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রকাররা কিন্তু সঙ্গীত বলতে গীত, বাদ্য, নৃত্য—এই তিনটির একত্র সমাবেশকেই সঙ্গীত বলেছেন। শার্ঙ্গদেব কৃত সঙ্গীত রত্নাকরে বলা হয়েছে—

"গীতং বাদ্যং চ নৃত্যং চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে"—অর্থাৎ গীত, বাদ্য এবং নৃত্য, এই তিন-এর সমাবেশকে সঙ্গীত বলে।

পণ্ডিত অহোবল কৃত সঙ্গীত পারিজাত গ্রন্থে এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করে বলা হয়েছে—

"গীত বাদিত্রনৃত্যানাং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে
গানস্যাদত্র প্রধানত্বাৎ তৎ সঙ্গীতমিতীরিতম্।"

অর্থাৎ গীত, বাদ্য এবং নৃত্য—এই তিনটির সম্মিলিত পরিবেশনের নাম সঙ্গীত। এদের মধ্যে প্রধান কণ্ঠসঙ্গীত। তাই কণ্ঠসঙ্গীতকেই সাধারণভাবে সঙ্গীত বলা হয়ে থাকে। গীত বলতে আমরা বুঝি কন্ঠসঙ্গীত। অর্থাৎ অর্থযুক্ত শব্দ সহযোগে তালের সাহায্যে যে সুর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত ভাবরূপ সৃষ্টি করে বা গায়কের ভাব প্রকাশ করে, তাকেই গীত বলা যায়। বাদ্য বলতে আমরা বুঝি বাদ্যযন্ত্রের যে সুর তাল সহযোগে প্রকাশিত হয়ে সুরের মূর্তি গড়ে তোলে বা ভাব সৃষ্টি করে।

নৃত্য-এর মাধ্যমে অর্থাৎ ছন্দ সহযোগে সুললিত অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে যে ভাব প্রকাশ করা হয়।

সুতরাং গীত, বাদ্য এবং নৃত্য—এই তিনটি পৃথক বস্তু। কিন্তু একই সঙ্গে তিনটির সমাবেশ সম্ভব শুধু নয়, অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্যও। গীত, বাদ্য এবং নৃত্য পৃথক পৃথক ভাবে অনুষ্ঠিত হলেও এই তিনটির বা যে কোন দুটির একত্র সমাবেশ প্রায়ই দেখা যায়।

ভারতীয় সঙ্গীতের দার্শনিক তাৎপর্য

ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস যে সামগান তা একই সঙ্গে পাঠ ও গান করা হত। অর্থাৎ সামগান ও সামপাঠ—এই দুটি শব্দ অভিন্নার্থক ছিল।

তখন কথা এবং গানের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ছিল। এ সম্পর্কে ডঃ ফেলবার বলেছেন, "Speech and music has descended from a common origin in a primitive language which was neither speaking nor singing but something both."

কবিতা এবং গানের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমি যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে থাকি সে বিশেষভাবে সঙ্গীতশাস্ত্র নয়, কাব্য শাস্ত্র নয়, তাকে বলে ললিত কলা শাস্ত্র—সঙ্গীত ও কাব্য দু-ই তার অন্তর্গত। এই কথাটি একটু ঘুরিয়ে বলা যায় যে, কবিতা এবং গান এ দুটী মানুষকে যে রসলোকে উদ্দীপিত করে তা মূলত এক।

সেই রসলোকের বিশ্লেষণ করতে গেলে দর্শনের যে বিশেষ শাখার দ্বারস্থ হতে হয় তাই নন্দনতত্ত্ব। এই নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সঙ্গীত সহ যে কোন শিল্প-কলার বিচার করতে হয়। সামবেদের মন্ত্রগুলি সুর ও তাল সহযোগে গান করা হত। ঋষিরা কল্পনা করেছিলেন যে, সামগানের সুরের মধ্যে প্রবেশ করে বা স্বরকে আশ্রয় করে দেবতারা এক সময় অমৃতত্বে পৌঁছেছিলেন।

মহাভারতে নাদ বা শব্দের কারণ স্বরূপ অসীমশক্তি কল্পনা করা হয়েছে, পরবর্তী দার্শনিকরা ওই মতেরই পোষকতা করেছেন। অন্যদিকে সংগীতে ব্যবহৃত যে তাল তারও উৎপত্তি ছন্দ থেকে। সে-ই অনন্ত সময়কে নির্দিষ্ট

স্বরূপে বেঁধে রাখে। একদিকে অনন্ত আকাশ নাদকে আপন স্বরূপে ধরে রাখে, অন্য দিকে অনন্ত সময় নিজে বিভাজিত হয়ে ছন্দের সৃষ্টি করে। অর্থাৎ শব্দ ও ছন্দ অনন্ত আকাশ ও অনন্ত সময়ের মধ্য থেকে জন্মলাভ করে। সেই জন্য আমাদের কাছে স্বরূপে ব্রহ্মের আস্বাদন এনে দেয়। ভারতীয় সঙ্গীতের দার্শনিক তাৎপর্য এইভাবেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

...য় সঙ্গীতের উৎস

ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস নির্ধারণ করতে হলে ভারতীয় সভ্যতার প্রথম ...কাল নিরূপণ করা প্রয়োজন। কিন্তু পণ্ডিতেরা এখনও এ বিষয়ে একমত ...পারেননি। ভারতের আদি সভ্যতা হিসাবে বৈদিক সভ্যতাকেই মেনে ...া হয়েছিল। কিন্তু ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদারোর এবং অবিভক্ত পঞ্জাবের মণ্টগোমারি জেলায় হরপ্পায় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে আগের ধারণাকে পাল্টাতে হয়েছে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় সুপ্রাচীন সভ্যতার যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তা থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, আর্যরা ভারতে আসার আগে ভারতে উন্নততর সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এই সভ্যতার নাম সিন্ধু-সভ্যতা।

সিন্ধু-সভ্যতার যুগ

প্রাক্-বৈদিক সভ্যতা অর্থাৎ সিন্ধু-সভ্যতার কাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য বর্তমান। বর্তমানে মোটামুটিভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০, থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে সিন্ধু-সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। সিন্ধু-সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও খননকার্যে যাঁরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ স্যর জন মার্শাল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দয়ারাম সাহানী প্রমুখের মতে সিন্ধু-সভ্যতা প্রাক্-বৈদিক সভ্যতা। কিন্তু ডঃ লক্ষ্মণ স্বরূপ প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে ঋগ্বৈদিক আর্যরাই সিন্ধু-সভ্যতার জনক। প্রকৃতপক্ষে আর্যরা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আসেননি। তাঁরা এই অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন।

উপরের সিদ্ধান্ত মেনে নিলে স্বীকার করতেই হয় যে, বৈদিক যুগের আগেই ভারতে সঙ্গীতকলার প্রসার ঘটেছিল। কারণ মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পা থেকে সঙ্গীতকলার অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে যা থেকে সে যুগের সঙ্গীত ও নৃত্যকলার একটা সুসম্বদ্ধ রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন করে সাতটি ছিদ্রযুক্ত বাঁশি, তন্ত্রীযুক্ত বীণা, চামড়ার

১। স্যর জন মার্শাল ও তাঁর অনুসরণকারীদের অনেকে সিন্ধু-সভ্যতার কাল নির্ণয় করেছেন খ্রিঃ পূঃ ৫০০০—খ্রিঃ পূঃ ৩১০০ অব্দ। Mr. Gadd এবং Prof. Langdon বলে করেন সিন্ধু-সভ্যতার বয়স ২০০০ বছরের বেশি।

'বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র, নৃত্যরত নারী ও ব্রোঞ্জে তৈরি নর্তকের ভগ্নমূর্তি' প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে।

ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট পিগট তাঁর Pre-Historic India গ্রন্থে (পৃঃ ২৭০) লিখেছেন—'নৃত্যের সঙ্গে সে-যুগে করতালের সহযোগ থাকত। এছাড়াও নৃত্যের সঙ্গে মৃদঙ্গ, বেণু বা বাঁশি, তন্ত্রীযুক্ত বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রের (harp, lyre) সহযোগ থাকত। এগুলিতে ধ্বনিত হত সাতটি স্বর।' ঐতিহাসিক রায়বাহাদুর দীক্ষিত তাঁর Pre-Historic Civilisation of Indus Valley গ্রন্থে লিখেছেন—"এটা বেশ বুঝতে পারা যায় যে, সে যুগে (সিন্ধু সভ্যতার যুগে) নৃত্য ছাড়াও কণ্ঠসঙ্গীতের অনুশীলন চলত। তন্ত্রীযুক্ত বীণা প্রভৃতি এবং চামড়ার তৈরি মৃদঙ্গ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র তো ছিলই ; গান ও নৃত্যের সঙ্গে তাল ও লয় রক্ষা করত এই বাদ্যযন্ত্রগুলি। ধ্বংসস্তূপ থেকে যে সব মূর্তি পাওয়া গিয়েছে সেগুলির মধ্যে একটির গলায় এক ধরনের মৃদঙ্গ ঝুলতে দেখা যায়। এছাড়া দুটি সীলমোহরে বর্তমানকালের মৃদঙ্গের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই মৃদঙ্গের দুটি দিকই চামড়ায় আবৃত থাকত। সীলমোহরে পাওয়া বাদ্যযন্ত্রের নিদর্শনের সঙ্গে বীণার কিছুটা মিল দেখা যায়।

শুধু সঙ্গীতের নয়, নৃত্যকলারও একটা সুসম্বদ্ধ রূপের পরিচয় পাওয়া যায় সিন্ধু-সভ্যতায় ডঃ লক্ষ্মণ স্বরূপের The Rigveda and Mohenjodaro (Indian culture, October, 1937) শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে এ বিষয়ে জানা যায় : "একটি সীলমোহরে স্পষ্টভাবে নৃত্যের ছবি খোদাই করা রয়েছে ; একজন একটি বাঁশি বাজাচ্ছে, আর সবাই সেই মৃদঙ্গ বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করছে।" হরপ্পার একটি সীলমোহরে একটি বাঘের পাশে একটি নৃত্য- নারীমূর্তি পাওয়া যাচ্ছে। আর একটিতে একজন পুরুষের গলায় একটি মৃদঙ্গ ঝোলানো। ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ নরেন্দ্র লাহা, ডঃ লক্ষ্মণ স্বরূপ এঁরা একটি পাথরের নটমূর্তির পরিচয় দিয়েছেন। দয়ারাম সাহানী যে নৃত্যরতা নারীর ব্রোঞ্জমূর্তি আবিষ্কার করেছেন সেটি নগ্ন এবং তার হাতে রয়েছে বড় বড় অলংকার। এই অলংকার দেখে স্যর জন মার্শাল ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই নারীকে আদিবাসী (aboriginal type) শ্রেণীভুক্ত করেছেন। তাঁর এই অভিমতের সমর্থনে আরো কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, 'নৃত্যকলায় বংশগত অধিকার ছিল অনুন্নত আদিবাসীদের। সুতরাং এই মূর্তি আদিবাসীর হওয়ারই সম্ভাবনা।'

সিন্ধু উপত্যকায় খননকার্যের ফলে পাওয়া সঙ্গীতসাধনার নিদর্শন থেকে সে যুগের সুসম্বদ্ধ সঙ্গীতকলার কথা প্রমাণ করে। যদি সপ্ত-ছিদ্র-যুক্ত বাঁশিতে সে যুগে সাত স্বরের ব্যবহার হয়ে থাকে, তবে তৎকালীন সঙ্গীতচর্চা যে বেশ উন্নত ছিল এ কথাও মনে করা যেতে পারে। কিন্তু তবুও সিন্ধু-সভ্যতার যুগের সঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীতে কোন ধারার সৃষ্টি করতে পারে নি। সিন্ধু-

সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতার মধ্যবর্তী কালের কোন সাঙ্গীতিক ইতিহাস না থাকায় ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস হিসাবে সামবেদকেই মেনে নেওয়া হয়েছে। কারণ এই বৈদিক যুগ থেকেই সঙ্গীতের একটা প্রবহমান ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বৈদিক যুগের সঙ্গীত

মধ্য এশিয়া থেকে ইরানের মধ্য দিয়ে এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে আর্যরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন।

ভারতবর্ষে আর্যদের প্রথম পদক্ষেপের দিন-ক্ষণ সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা যায় না। তবে অধিকাংশ পন্ডিতেরা মনে করেন খ্রিঃ পূঃ ২০০০ অব্দে আর্যরা ভারতে প্রথম পদার্পণ করেন। তাঁরা 'সপ্তসিন্ধু' নামক স্থানে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। 'সপ্তসিন্ধু' নামটি বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়, সিন্ধু প্রমুখ সাতটি নদ-নদীর অধ্যুষিত ভূ-ভাগকেই 'সপ্তসিন্ধু' বলা হয়েছে। খ্রিঃ পূঃ ১৫০০-৮০০ অব্দের মধ্যে তাঁরা সমগ্র উত্তর এবং মধ্য ভারত অধিকার করে নেন।

আর্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ 'বেদ'। বেদমন্ত্রসমূহকে দেবকুল থেকে শ্রুত বাক্য বলা হয়; এই জন্য বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। বেদ চার ভাগে বিভক্ত: ঋক, সাম, যজু, অথর্ব। প্রত্যেক বেদ আবার 'সংহিতা' ও 'ব্রাহ্মণ' এই দুই অংশে বিভক্ত। সংহিতা ভাগ পদ্যে রচিত। এটি গাথা ও বেদমন্ত্রের সমষ্টি। ব্রাহ্মণ ভাগ গদ্যে লিখিত। এই অংশ প্রধানত তত্ত্বকথা ও যাগযজ্ঞের বিধিনির্দেশ। এই দুই ভাগ ছাড়াও বেদের 'আরণ্যক' ও 'উপনিষদ' নামে আরো দুটি বিভাগ পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছিল। ঋক্ সংহিতার রচনাকাল সম্ভবত খ্রিঃ পূঃ ২০০০ থেকে ১৫০০ অব্দের মধ্যে। অন্যান্য সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলি ১৫০০ থেকে ৮০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দের মধ্যে এবং উপনিষদগুলি ৮০০ থেকে ৫০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে রচিত হয়। বেদকে ভিত্তি করে আর্য সভ্যতার বিকাশ ঘটে বলে বলা হয়ে থাকে এবং মোটামুটিভাবে ২০০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে ১০০০ খ্রিঃ পূঃ পর্যন্ত সময়কে 'বৈদিক যুগ' বলা যেতে পারে। এই বৈদিক যুগের সাহিত্য যে বেদ তার অন্যতম ঋক্‌বেদে ১০টি মণ্ডল বা অধ্যায় আছে। সবগুলি মণ্ডলে ১০২৮টি (কারও কারও মতে ১০১৭টি) সূক্ত আছে। অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সোম, বিশ্বামিত্র, ব্যাসদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি দেবতা ও ঋষিদের প্রশংসাসূচক মন্ত্রই ঋক্। এই ঋক্ সুর সহযোগে গাওয়া হত। অষ্টম মণ্ডলের ৯২টি সূক্তের সমগ্রভাবে নাম প্রগাথ বা প্রগাথা। ঋক্‌বেদের নবম মণ্ডলের ১১৪টি সূক্ত সোমদেবতার বা চন্দ্রদেবতার উদ্দেশে রচিত। সোমলতা থেকে সোমরস আহরণের সময় এগুলি গাওয়া হত। এই গানও বৈদিক যুগের গান, তথা সামগান।

গানের উপযোগী ঋক্‌গুলিকে নিয়েই সামবেদ রূপায়িত। সামবেদের স্তোত্রগুলির সংখ্যা ১৮১০ বা ১৮০৮। যাগযজ্ঞের সময় উদ্‌গাতাগণ এগুলি গাইতেন। সামবেদ সংহিতা মোটামুটি দু-ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম

'আর্চিক' এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম 'স্তৌভিক'। আর্চিকে যে ৫৮৫টি সূক্ত আছে তার মধ্যে ৫৩৯টি ঋক্‌বেদ থেকে নেওয়া হয়েছে। স্তৌভিক-এর ১২২৩টি সূক্তের মধ্যে ৭৯৪টি ঋক্‌বেদ থেকে নেওয়া হয়েছে। 'স্তোভ' অর্থ প্রশংসা অর্থাৎ দেবতা বা ঋষিদের উদ্দেশে প্রশংসাসূচক সূক্তই স্তোভ।

আর্চিকের তিন ভাগ—(১) পূর্বার্চিক, (২) উত্তরার্চিক, এবং (৩) অরণ্য-সাহিত্য। পূর্বার্চিক মূল সূত্রের সমষ্টি। উত্তরার্চিক প্রধানত ত্রিঋচ (এই সূক্তগুলিতে তিনটি করে ঋক্ থাকত বলে এই নাম) নিয়ে রচিত। পূর্বার্চিকের মন্ত্র, মূল গানকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে: অগ্নিদেবতার উদ্দেশে রচিত, ইন্দ্র দেবতা এবং সোম পবনের উদ্দেশে রচিত।

সামবেদকে ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস বলে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য বর্তমান। কারণ বৈদিক সভ্যতার আগেও ভারতে সভ্যতা ছিল এবং অনার্য দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির ভাষা ও সঙ্গীত ছিল। তবে এইটাই দেখা যায় যে, সামবেদের যুগেই ভারতীয় সঙ্গীতের একটি স্পষ্ট রূপ ফুটে ওঠে।

গ্রামগেয়, অরণ্যগেয়, উহ্য এবং উহ (রহস্য গান)—এই চারটি গান ভাগ নিয়ে সামবেদের গাথা, গান বা সঙ্গীতাংশ গড়ে উঠেছে। গ্রামগেয় গান মূল গান। উহ বা উহ্য গান ওই গ্রামগেয় গান থেকেই সৃষ্টি। অরণ্যেগেয় গান অরণ্যবাসী ঋত্বিক ও সামগদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। আর গ্রামগেয় গান নির্দিষ্ট ছিল গৃহবাসী, গোষ্ঠী বা সাধারণ শ্রেয়কামীদের জন্যে। যাগযজ্ঞের সময় অগ্নিকে ঘিরে গান করা হত। যজ্ঞশালার বাইরেও গান করার রীতি ছিল। "এই গ্রামগেয় গান থেকেই নাকি বৈদিকোত্তর গান্ধর্ব বা মার্গ এবং মার্গ থেকে ক্রমশ ক্ল্যাসিকাল অভিজাত দেশী গানের সৃষ্টি হয়েছে।" [স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫]

চারটি বেদের আবার অনেকগুলি করে শাখা। প্রত্যেক শাখাতেই সামগানের বিধি ছিল, তবে পৃথক পৃথক ভাবে। ভিন্ন ভিন্ন শাখার সামগরা পৃথক পৃথক স্বরে বিভিন্ন সামগান করতেন। স্বরসংখ্যার প্রয়োগ দ্বারা তাঁদের গানের প্রকৃতি ও শ্রেণীর পার্থক্য বোঝা যেত। কেউ গাইতেন পাঁচ স্বরে, কেউ-বা ছ' অথবা সাত স্বরে সামগান গাইতেন। ঋগ্বেদীরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন স্বরে সামগান করতেন। সামিক যুগের গান ছিল মাত্র তিনটি স্বরযোগে। আর্চিক যুগে ছিল একটি মাত্র স্বরের ব্যবহার। সামগানে নিম্নলিখিত সাতটি স্বরের ব্যবহার ছিল: প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, ক্রুষ্ট ও অতিস্বার।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিন্ধু-সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে যে সপ্তছিদ্র যুক্ত বাঁশি পাওয়া গেছে তা থেকে সে যুগে সাত স্বরের ব্যবহার ছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না ঠিক কোন সময় সাত স্বরের বিকাশ ঘটে। ডঃ ফেলবার (ভিয়েনা), ডাঃ হুগ্ (হল্যান্ড), রিচার্ড সাইমন প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে, বৈদিক যুগের বিভিন্ন স্তরে নতুন নতুন

শ্রেণীর সামগানের জন্ম হয়েছিল এবং প্রথমদিকে সামগানে স্বরমণ্ডলের প্রয়োগ না থাকলেও শেষের দিকে তার সমাবেশ ঘটেছিল। স্বরমণ্ডলের পরিচয় প্রসঙ্গে নারদ বলেছেন, 'সাত স্বর, তিন গ্রাম (ষড়্জ, মধ্যম, গান্ধার), মূর্চ্ছনা, একোন-পঞ্চাশৎ তান প্রভৃতির সমবেত রূপই স্বরমণ্ডল।' অবশ্য অনেকে মনে করেন 'সপ্তস্বরা' বলতে নারদ ষড়্জাদি সাত স্বরের কথাই বলেছেন, বৈদিক প্রথমাদির কথা বলেন নি। তাঁদের মতে, সামগানে লৌকিক স্বর ব্যবহৃত হত না। একুশ মূর্চ্ছনা, শ্রুতি, তান প্রভৃতির বিকাশ ঘটে বৈদিক পরবর্তী যুগে।

বৈদিক সাহিত্য থেকে বৈদিক যুগের বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্য সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। ঋক্ সংহিতায় নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোণী, আঘাতি, ঘাতলিকা, কাণ্ডি, বাণ, ঔদুম্বরী, কাত্যায়নী, পিচ্ছোরা প্রভৃতি বেণু ও বীণার প্রচলন ছিল বৈদিক যুগে। চামড়ার বাদ্যযন্ত্র হিসাবে দুন্দুভি, ভূমি-দুন্দুভি প্রভৃতি এবং গর্গর, পিঙ্গ, নাড়ী, বনস্পতি, কর্করি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। শত-তার যুক্ত বাণ-বীণা, গো-সাপের চামড়ার গোধোবীণা এবং ধনু বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়।

উপনিষদে সঙ্গীত

'বেদ' বলতে সংহিতা (অর্থাৎ মন্ত্রভাগ) এবং ব্রাহ্মণ (যাগযজ্ঞের কথা) বোঝায়। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য আরও ব্যাপক। ব্রাহ্মণের পরে রয়েছে অরণ্যক এবং উপনিষদ। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মতে উপনিষদগুলি খ্রিঃ পূঃ ১৪০০-এ রচিত হয়।

ব্রাহ্মণের মধ্যেই রয়েছে আরণ্যক। আরণ্যক-এ রয়েছে যাগযজ্ঞ বিষয়ের সাংকেতিকতায় ব্যাখ্যা এবং আধ্যাত্মিক আলোচনা। এই আরণ্যক-এর শেষ ভাগ উপনিষদ। যেখানে লোকেরা চারদিকে ঘিরে বসে তাকে বলা হয় পরিষদ। তেমনি শিষ্যেরা গুরুর নিকটে (উপ অর্থ নিকট) গিয়ে যখন বসতেন তখন সেই ছোট বৈঠককে বলা হত উপনিষদ। ধীরে ধীরে শব্দটির অর্থ পরিবর্তিত হয়ে গেল, ওই সকল উপনিষদে অর্থাৎ বৈঠকে যে বিদ্যার আলোচনা হত তাকেই বলা হত উপনিষদ। এই বিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা।

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারি বেদেরই উপনিষদ আছে। উপনিষদগুলির মধ্যে কিছু পদ্যে এবং কিছু গদ্যে রচিত।

উপনিষদ অনেকগুলি—যেমন ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ঐতরেয়, বৃহদারণ্যক, মৈত্রায়ণী, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে মাত্র তিনটি উপনিষদে আমরা সঙ্গীতের উপাদান পাই। এই তিনটি হল ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং তৈত্তিরীয়। এই তিনটির মধ্যে ছান্দোগ্যই প্রধান।

ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রথমে ওঙ্কারকে উদ্গীথ রূপে উপস্থাপন করার নির্দেশ রয়েছে, দ্বিতীয় মন্ত্রে ওঙ্কারকে কেন উদ্গীথ বলা হয় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং তৃতীয় মন্ত্রে উদ্গীথকে সামবেদের রস বা সারাংশ বলা হয়েছে। ছান্দোগ্য

উপনিষদে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের উল্লেখ আছে। এতে দেখা যায় যে যজ্ঞের সময় বিচিত্র ছন্দে যে স্তব পাঠ করা হত তাতে থাকত ছন্দ, তাল ও সুর। এতে দেখা যায় যে, সে যুগে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত স্বরের ব্যবহার ছিল।
সামোপাসনায় প্রত্যেকটা সাম্যক গান করার আগে মূর্তিমান ভেবে তাদের অধিদেবতার ধ্যান করার বিধি ছিল। সামও বিভিন্ন রকমের ছিল। বৃহৎ সাম, বৈরাজ সাম, শক্করী সাম, রেবতী সাম, যজ্ঞ যজ্ঞীয় সাম প্রভৃতি। সামগানের অবলম্বন ছিল ৭টি ভক্তি বা ২২টি অক্ষর। গান করার সময় এই সাতটি ভক্তি (হিংকার, প্রস্তাব, উদ্‌গীথ, আদি, উপদ্রব, প্রতিহার ও নিধন) কে চিন্তা করতে হত। এই সাতটি সাম ভক্তির মধ্যে হিংকার—৩, প্রস্তাব—৩, আদি—২, প্রতিহার—৪, উদ্‌গীথ—৩, উপদ্রব—৪, নিধন—৩ অক্ষর বিশিষ্ট। মার্গ ও আধুনিক সঙ্গীতের অবলম্বনও সাতটি স্বর। ছান্দোগ্য উপনিষদ উদ্‌গানে ব্যবহৃত আরও সাতটি স্বরের পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলির নাম : বিনদি, অনিরুক্ত, নিরুক্ত, মৃদু, শ্লক্ষ্ণ, ক্রৌঞ্চ, অপধ্বান্ত।
অনেকে মনে করেন যে, সামের বাইশটি অক্ষর থেকেই পরবর্তীকালে বাইশটি শ্রুতি পরিকল্পিত হয়েছিল।
বৃহদারণ্যক উপনিষদে উদ্‌গান (সামগানের একটি শ্রেণী) নিয়ে আলোচনা আছে। এই উপনিষদে গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা আছে। অন্যান্য সঙ্গীতের উপাদান ছান্দোগ্য উপনিষদের মত।
তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিক্ষা বল্লীর গোড়ার দিকে অতি সামান্য সঙ্গীতের ইঙ্গিত আছে। ঐতরেয় আরণ্যকে গীতির শিক্ষা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। এছাড়া কঠ উপনিষদে যম ও নচিকেতা সংবাদে নৃত্যগীতের উল্লেখ রয়েছে। ঐতরেয় আরণ্যকে গীতির শিক্ষা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আছে।

পুরাণ সাহিত্যে সঙ্গীত

কোন দেশের বা জাতির অতি প্রাচীন কাহিনীকে বলে 'পুরাণ'। যেমন হিন্দু পুরাণ, গ্রিক পুরাণ, ইহুদি পুরাণ। ব্রাহ্মণ ও উপনিষদেও পুরাণের উল্লেখ আছে। বৈদিক সাহিত্যে আখ্যান, উপাখ্যান, পুরাণ, ইতিহাস প্রায় একই অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 'পুরাণ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'পুরাকালীন' এবং ইতিহাস শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'এইরূপ' ছিল (ইতি-হ-আস)। মহাভারতেও কোন ইতিহাসের কাহিনী বলার সময় তাকে পুরাতন বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাই অনেকের ধারণা 'ইতিহাস' বলতে যে কোন অতীত ঘটনা, আর সুদূর অতীত বোঝাতে 'পুরাণ' শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। মহাভারতেও 'পুরাণ' শব্দের উল্লেখ আছে। তাই পুরাণ যে প্রাচীন সাহিত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।
পুরাণের সংকলিতা ব্যাসদেব। আলোচ্য বিষয় অনুসারে পুরাণগুলি নিজেদের পাঁচটা লক্ষণ এইভাবে নির্ধারণ করেছে : (১) সর্গ (সৃষ্টি), (২) প্রতি-সর্গ

(প্রলয়কালে পূর্বসৃষ্টির ধ্বংসের পর নতুন সৃষ্টির বিকাশ), (৩) বংশ (দেবতা ও ঋষিগণের বংশ বর্ণনা), (৪) মন্বন্তর (মনুগণের শাসন কাল), (৫) বংশানুচরিত (নৃপতিগণের বংশের ইতিহাস)। প্রধান এবং প্রাচীন 'পুরাণ'-এর সংখ্যা ১৮টা। এছাড়াও কিছু উপপুরাণ আছে।

পুরাণগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। কতকগুলি রাজবংশ সম্বন্ধে এগুলির মধ্যে যে তথ্য পাওয়া যায় তা বিশেষ মূল্যবান। ভারতবর্ষের ইতিহাস, বিশেষত ধর্মের ইতিহাস আলোচনার জন্য পুরাণের প্রয়োজন স্বীকার করতেই হয়। আর পুরাণগুলিতে সঙ্গীত সম্পর্কে যে তথ্য আছে সঙ্গীতের ইতিহাসের দিক থেকে তা অত্যন্ত মূল্যবান। এই ধরনের বই ছাড়া প্রাচীন যুগ সম্পর্কে জানবার উপায় বেশি নেই।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে সঙ্গীত

'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' পুরাণগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন পুরাণ হিসাবে স্বীকৃত। মার্কণ্ডেয় ঋষির নাম অনুসারে এই পুরাণের নামকরণ হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ২৩৮ অধ্যায়ে বিভক্ত। অবশ্য সব অধ্যায়েই যে সঙ্গীতের কথা আছে তা নয়।

মার্কণ্ডেয়, বায়ু, বৃহত্তম পুরাণগুলি (৩য়-৭ম শতাব্দী) গুপ্তযুগে সংকলিত হয়েছিল। গুপ্তযুগের সাঙ্গীতিক প্রচেষ্টার কথা এইগুলি থেকে জানা যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রথম অধ্যায়ে ৩৪-৩৫ এই দুটি শ্লোকে নৃত্য ও নর্তকের গুণাগুণ সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ আছে। সেখানে এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়: দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় দেবর্ষি নারদ ও রম্ভা, মিশ্রকেশী, উর্বশী, তিলোত্তমা, মেনকা প্রভৃতি উপস্থিত রয়েছেন। ইন্দ্র নারদকে বললেন, আপনি অপ্সরাদের নৃত্য করতে আদেশ দিন। নারদ তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "তোমাদের মধ্যে নিজেকে সকলের চেয়ে রূপগুণ ও ঐশ্বর্যশালিনী বলে যে মনে করে সে আমার সামনে নৃত্য করুক। কেননা রূপগুণবিহীনা নারী নাট্যশাস্ত্রে সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। সুন্দর অঙ্গ সৌষ্ঠব নৃত্যই নৃত্যরূপে পরিগণিত হয়, অন্যথায় বিড়ম্বনা মাত্র।" নাট্যশাস্ত্রে আছে—নৃত্যে সকলের অধিকার নেই। কারণ, রস ও ভাবের অভিব্যক্তি না হলে নৃত্য বিফল হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে সেই এক কথাই বলা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রে যা বলা হয়েছে মার্কণ্ডেয় পুরাণেও তাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ নৃত্যে সকলের অধিকার নেই। দর্শনধারী হতে হবে এবং তার অঙ্গসৌষ্ঠব থাকা প্রয়োজন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ২৩ অধ্যায়ে সঙ্গীত সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আছে: নাগরাজ অশ্বতর দেবী সরস্বতীকে তপস্যার দ্বারা সন্তুষ্ট করে তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করেন, "আমার ভাই কম্বল ও আমার যেন সঙ্গীতশাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞান অধিগত হয়।" তখন দেবী তাঁকে যে কথা বলে বর দান করেছিলেন, সঙ্গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে তার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। তিনি

বলেছিলেন, "নাগরাজ, তোমরা দুজনে সাতটি স্বর, সাতটি গ্রামরাগ (জাতি রাগ থেকে উদ্ভূত রাগকে গ্রামরাগ বলা হয়েছে) সাত প্রকার গীতি, সাতটি মূর্চ্ছনা, উনপঞ্চাশটা তান এবং ষড়জাতি তিনটি গ্রাম (ষড়্জ, মধ্যম, গান্ধার), চার প্রকার আতোদ্য (বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র), তিন প্রকার জ্যোতি এবং তিনটি লয় ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে। আমার প্রসাদে এদের অন্তর্গত স্বর, ব্যঞ্জন যাবতীয় উপাদানের অধিকারী হবে। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে, কার্যত সর্বলোকে সঙ্গীতের ধারক ও বাহক হিসাবে সমাদর লাভ করবে তোমরা।" এই অশ্বতর এবং কম্বল—এঁরা হয়তো ঐতিহাসিক সঙ্গীতশাস্ত্রী ছিলেন।

পুরাণে সঙ্গীতের এই উপাদান সংগ্রহ থেকে বোঝা যায়, নারদ তাঁর "শিক্ষা" গ্রন্থে যে সাতটি গ্রামরাগের কথা বলেছেন—ষাড়ব, পঞ্চম, মধ্যমগ্রাম, ষড়্জগ্রাম, সাধারিত, কৌশিকমধ্যম ও কৌশিকের প্রচলন মার্কণ্ডেয় পুরাণের যুগে ছিল। যে সাতটি গীতের কথা বলেছেন, সেই সাতটি গীতের কথা মতঙ্গ তাঁর বৃহদ্দেশী গ্রন্থে বলেছেন। যথা—শুদ্ধা, ভিন্নকা, গৌড়িকা, রাগগীতি, সাধারণী, ভাবা, বিভাবা ইত্যাদি। যদি মার্কণ্ডেয় পুরাণের কাল পঞ্চম শতাব্দীর পরে হয় তাহলে যে সাতটি গীতের কথা নারদ বলেছেন, সেই সাতটি গীত বৃহদ্দেশীতে আছে। বৈদিক সঙ্গীতে ব্রহ্মগীতির কথা বলা হয়েছে (ঋক, পানিনে, ওবেনক, রবীন্দ্রক, আশারীত, উল্লোক, দুন্দক)।

তিনটি গ্রামের মধ্যে গান্ধার গ্রাম অবলুপ্ত হলেও তার উল্লেখ আছে। তিন প্রকার লয় বলতে—বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত। দুরকম পদ বলতে—নিবদ্ধ, অনিবদ্ধ। তিনটি যতি বলতে—সমা, স্রোতগতা, গোপুচ্ছা বোঝায়। তালের লয় রক্ষার জন্য যে নিয়মিত বিশ্রাম, তাকে যতি বলে। যতি তিনপ্রকার:

(১) আদিতে—মধ্য ও অন্তে যদি একটি লয়ের সমাবেশ থাকে, তাকে সমর যতি বলে।

(২) গীতির আদিতে বিলম্বিত, মধ্যে ও অন্তে দ্রুতলয়ে রসমাবেশ থাকলে তাকে স্রোতগতা বলে।

(৩) গীতির পূর্বভাগে দ্রুত, মধ্য ও শেষে বিলম্বিত লয়ের সমাবেশ থাকলে তাকে গোপুচ্ছা বলে। কারও কারও মতে দ্রুত, মধ্য ও শেষে বিলম্বিত লয়ের সমাবেশকে গোপুচ্ছা বলে।

চারটি তাল বলতে আবাপ, নিস্ক্রাম, বিক্ষো, প্রবেশক গ্রামের উত্তর মন্দ্রটি, ৭টি করে মূর্চ্ছনার উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পুরাণের ২৩ অধ্যায়ে ৬৮ এবং ১০৬ নম্বর শ্লোকে বীণ, বেণু, দর্দুর পণব, পুষ্কর, মৃদঙ্গ, পটাই, দেব-দুন্দুভি প্রভৃতি বহু বাদ্যের উল্লেখ আছে।

নৃত্য প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রের ১২৭ অধ্যায়ে যে সমস্ত হাবভাব ও অঙ্গভাব মুদ্রাদির যথাযোগ্য প্রয়োগ ভাবের উল্লেখ আছে, সেইগুলি অপ্সরারা অনুসরণ করে নৃত্য করতেন, তারও উল্লেখ রয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের যুগে নৃত্য, বাদ্য ও গীতের সমন্বয়ে সঙ্গীত যে পূর্ণরূপে বিকশিত ছিল তার প্রমাণ ভালভাবেই পাওয়া যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের যুগে নাট্যাভিনয়েরও প্রচলন ছিল। বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরার নৃত্যের কথা তো আছেই, উপরন্তু এটাও জানা যায় যে, এই যুগে বিবাহবাসরে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের অবাধ প্রচলন ছিল। সুরাপানে রত রাজাকে বারবিলাসিনীরা নৃত্যগীতে পরিতুষ্ট করতে—একথা এই পুরাণ থেকেই জানা যায়।

বায়ু পুরাণে সঙ্গীত

এই পুরাণ 'শৈব পুরাণ' বা 'শিব পুরাণ' নামেও উল্লিখিত হয়েছে। গ্রন্থে শিব উপাসনার বহুল আলোচনাই এর কারণ বলে মনে হয়। বায়ু পুরাণকে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের একটি অংশ বলে কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন। বায়ু পুরাণকে মহাভারত ও হরিবংশের পরেই সবচেয়ে প্রাচীন বলে মনে করা হয়। হরিবংশের কয়েক জায়গা থেকে বায়ু পুরাণে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। ৭ম শতাব্দীতে কবি বলেছেন যে তিনি বায়ু পুরাণের পাঠ শুনেছেন এবং তাতে গুপ্ত রাজাদের কাহিনী ছিল। সুতরাং বায়ু পুরাণ খ্রিষ্টীয় তৃতীয়, চতুর্থ শতাব্দীতে লেখা হয়েছে বলা যেতে পারে।

এই পুরাণের ৮৬ এবং ৮৭তম অধ্যায়ে সঙ্গীতের আলোচনা রয়েছে। এই পুরাণে সঙ্গীতকে গান্ধর্ব বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে কোন একদিন ঋষি সূতনন্দনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে সূতনন্দন, যে গান শুনে রেবতক রাজা সুদীর্ঘ কালকে মুহূর্ত মাত্র মনে করেছিলেন, সে গান কি রকম?" তিনি সে প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন গান বা গান্ধর্ব স্বরমণ্ডল সমন্বিত এবং স্বরমণ্ডলে ৭টি স্বর, ৩টি গ্রাম, ২১টি মূর্চ্ছনা, ৪৯ তানের সমাবেশ আছে। বায়ু পুরাণের একটি শ্লোকে নারদী শিক্ষার স্বরমণ্ডলের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। শিক্ষাকার নারদ উল্লেখ করেছেন সৌবীরি, কলপবলা (কলোপনতা), শুদ্ধ মধ্যমা, হরিণাশ্বা, শার্ঙ্গী, পাবনী ও দৃষ্টকা—এই ৭টি মূর্চ্ছনা মধ্যম গ্রামে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতে মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা হল—সৌবীরী, হরিণাশ্বা, কলোপনতা, শুদ্ধ মধ্যমা, মার্গবী, পৌরবী ও হৃষ্যকা। শিক্ষাকার নারদ, নাট্যশাস্ত্রকার ভরত, সঙ্গীত মকরন্দকার নারদ ও শার্ঙ্গদেব মোটামুটি বায়ু পুরাণের মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনাগুলির নাম ও বিভেদ উল্লেখ করেছেন। সুতরাং নারদী শিক্ষাকে বাদ দিলে দু-একটি নামের বিকৃতি ছাড়া আর সকলের সঙ্গেই সাদৃশ্য আছে।

গান্ধার গ্রামের মূর্চ্ছনা সম্বন্ধে উল্লেখ করে অগ্নিষ্টোমিক, বাজপেয়িক, অশ্বমেধিক, রাজসূয়, চক্র সুবর্ণক, গোতর, মহাবৃষ্টিক, ব্রহ্মদান, প্রাজাপাত্য, নাগপক্ষাশ্রয়, হয়ক্রান্ত, মৃগক্রান্ত, বিষ্ণুক্রান্ত, সূর্যক্রান্ত, সুবর্ণ, বিষ্ণু, বিনত প্রভৃতির নাম করেছেন। এগুলি যথার্থ মূর্চ্ছনা না তান তা বিচার্য।

তান ও মূর্চ্ছনাগুলিকে যদি মতঙ্গের বৃহদ্দেশী গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যায় তা হলে মনে হয় বায়ু পুরাণকার সাঙ্গীতিক উপাদান সংগ্রহের জন্য মতঙ্গের কাছে ঋণী। বায়ু পুরাণকার মূর্চ্ছনাগুলির নামের কি সার্থকতা আছে তার

একটা সম্বন্ধ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের অধিদেবতার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছেন। যেমন মূর্চ্ছনার নাম মার্গী হয়েছে এজন্যে যে সিদ্ধগণের বর্ণ পথ প্রদর্শনের সময় বনের মৃগের সঙ্গে এরা বিচরণ করে। এর অধিদেবতা মৃগেন্দ্র। এইভাবে মূর্চ্ছনার নামকরণ করা হয়েছে। বায়ুপুরাণের ৮৭তম অধ্যায়ের ৪৬তম শ্লোকে সঙ্গীতের স্থান, বর্ণ, বর্ণালংকার, গীতালঙ্কার, স্বরের মন্দ্র-মধ্য তার অনুসারে স্থান ও কাল প্রভৃতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

এই পুরাণে ৩০০ গীতালঙ্কারের উল্লেখ আছে। নাট্যশাস্ত্রে ৩৩টি অলংকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। সঙ্গীত রত্নাকরে ৬৩ প্রকার অলঙ্কারের উল্লেখ আছে। এই পুরাণে বহির্গীতের পরিচয় রয়েছে। তবে তার সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয়েছে এইভাবে: যথাযথভাবে স্বরগুলি আলাপে ব্যবহৃত হলে তাকে গীত বলা হয় এবং গীত যদি তার নির্দিষ্ট স্বর ছাড়া অন্য স্বরে বিস্তারিত হয় তাহলে তাকে বহির্গীত বলে। বায়ুপুরাণে গীত ও বহির্গীতের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ নতুন মনে হয়। তখন যেভাবে এদের প্রয়োগ হত সেই প্রয়োগ লোপ পেয়েছে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত গীত ও বহির্গীতের যে পরিচয় দিয়েছেন তার সঙ্গে বায়ু পুরাণকারের কোন মিল নেই। ভরত গীত বা গীতি বলতে গ্রামরাগ গীতি, ব্রহ্মগীতি, মাগধী প্রভৃতি বিচিত্র রকমের গীতির পরিচয় দিয়েছেন। বহির্গীত সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, এই গান রঙ্গের বহির্ভাগে গীত হয়। ভরতের বহির্গীত বৈদিক, বহিস্পমান স্তোত্র গীতেরই যেন পরবর্তী রূপ। কাজেই নাট্যশাস্ত্রে বৈদিকের সঙ্গে লৌকিকের একটি যোগসূত্রের আভাস পাওয়া যায়। বায়ু পুরাণে মদ্রক গীতির উল্লেখ আছে। তবে ভরতের বর্ণনার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। এছাড়া পুরাণকার গীতির পদভেদ, রীতিভেদ প্রভৃতি অনেক কথা বলেছেন, তবে অনেক জায়গায় এগুলি বলতে তিনি যে কি বুঝিয়েছেন তা নির্ণয় করা যায় না।

বৃহৎধর্ম পুরাণে সঙ্গীত

বৃহৎধর্ম পুরাণের মধ্যম খণ্ডের চতুর্দশ অধ্যায়ে সঙ্গীতের আলোচনা আছে। দেবর্ষি নারদ দেবী বীণাপাণিকে নিয়ে ভূমিকা আরম্ভ করেছেন। বিষ্ণু শ্রোতা, নারদ বক্তা। চতুর্দশ অধ্যায়ে নারদ সঙ্গীত ও বিষ্ণুকে অভিন্ন রূপে ব্যক্ত করেছেন এবং দুই-ই যে ব্রহ্মের স্বরূপ একথাও উল্লেখ করেছেন। বলা হয়েছে যে, "গানঞ্চ ব্রহ্ম।" এই পুরাণে প্রত্যক্ষভাবে সঙ্গীত কথাটির উল্লেখ নেই। কিন্তু "গানঞ্চ ব্রহ্ম"—এই কথাটিরই উল্লেখ আছে। এই পুরাণে সঙ্গীতের রাগকে স্ত্রী, পুরুষ দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বৃহৎধর্ম পুরাণ খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী বা তার পরবর্তীকালের বই। অর্থাৎ এটা চতুর্দশ শতাব্দীর সঙ্গীত মকরন্দের পরে লেখা বই। এই পুরাণে রাগ-রাগিণীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—ছয়টি রাগ ও ছত্রিশটি রাগিণী আছে এবং এদের পরিচারিকারও অভাব নেই। এই বইতে বলা হয়েছে যে, সঙ্গীতের স্বরূপ হবে

সুনির্দিষ্ট স্বর এবং গায়কের শাস্ত্রে বর্ণিত বিধি-নিষেধের জ্ঞান থাকবে। অভিজাত সঙ্গীতকে অনুশীলন করতে হলে স্বরপ্রয়োগের কৌশল, তার মনোহারিত্ব জানা উচিত এবং ব্যাকরণগত অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। নতুবা তা মার্গসঙ্গীত হয় না, দেশীসঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে।

এই পুরাণে বলা হয়েছে যে, সঙ্গীতের ভাষা পদগত অর্থ প্রকাশ করে। সেই পদে যদি স্বর সন্নিবেশিত হয়, তাহলে তা সমস্ত প্রাণীর মনোরঞ্জন করে এবং রস সৃষ্টি করে। "রসসাক্ষাৎকারী"—এই কথাটি থেকে বোঝা যায় পুরাণ রচয়িতা শান্ত, দাস্য প্রভৃতি আটটি অথবা নয়টি রসকে লক্ষ্য করেছেন।

রস থেকে ভাবের অভিব্যক্তি হয়। পুরাণকার সেই জন্য সঙ্গীত প্রসঙ্গে রসের প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয়তাকে বাদ দিতে পারেননি। সাত স্বরের কোন স্বরে কয়টি শ্রুতির সন্নিবেশ আছে তাও উল্লেখ করেছেন। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তিনি বাইশটি শ্রুতির কথা বললেও চব্বিশটি শ্রুতির সংস্থান দেখিয়েছেন। যেমন—ষড়্জের চার, ঋষভের দুই, গান্ধারের তিন, মধ্যমের চার, পঞ্চমের তিন, ধৈবতের দুই, নিষাদের ছয়—এই অনুযায়ী বাইশটি শ্রুতির স্থলে চব্বিশটি শ্রুতির সংস্থান পাওয়া যায়। এই পুরাণের শ্রুতিসংস্থান নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের শ্রুতিসংস্থান থেকে ভিন্ন। মার্কণ্ডেয় ও বায়ু পুরাণকার এই বাইশটি শ্রুতি নিয়ে মাথা ঘামাননি। অথচ গ্রাম, গ্রামরাগ, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতে শ্রুতির সংখ্যা বাইশটি এবং মতঙ্গ তাঁর বৃহদ্দেশী গ্রন্থে (পঞ্চম শতাব্দী) মন্দ্র, মধ্য ও তার বিশেষে ২২ X ৩ = ৬৬টি শ্রুতির উল্লেখ করেছেন। বৃহদ্ধর্মকারও এই ৬৬টি শ্রুতির কথা বলেছেন। বৃহৎ-ধর্মকার এই সাতটি শুদ্ধ স্বর ছাড়া কোন বিকৃত স্বরের বিশেষ পরিচয় দেননি। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে রাগ-রাগিণীদের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে সাতটি স্বরের আরোহণ ক্রমে, ৫ কোটি ৫ লক্ষ ১ হাজার রাগ-রাগিণী। তবে এই পুরাণ-রচয়িতা ছয়টি প্রধান রাগ ও ছত্রিশটি রাগিণীর কথা বলেছেন এবং তাদের পরিচারক ও পরিচারিকা হিসাবে অন্যান্য রাগ-রাগিণীর পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে ছয়টি রাগ হল—কামোদ, বসন্ত, মল্লার, বিভাস, গান্ধার ও দীপক। এই রাগ-রাগিণীর ও পরিচারক-পরিচারিকাদের তালিকাও এই সঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

বৃহদ্ধর্ম পুরাণে উল্লিখিত রাগ-রাগিণীগুলির নাম অধিকাংশই বর্তমানে প্রচলিত রাগ-রাগিণীর থেকে পৃথক। এই পুরাণে উপরোক্ত রাগ-রাগিণীগুলির কোন মেল বা ঠাটের পরিচয় দেওয়া হয়নি। চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে মেলের প্রচলন থেকে গেছে। সঙ্গীত রত্নাকরের সময়ে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাগের গঠন ও প্রকৃতি মূর্চ্ছনা দিয়ে ঠিক করা হত। সাতটি শুদ্ধ ও পাঁচটি বিকৃত স্বরের আরোহণ ও অবরোহণ থেকে মেল বা মেলকর্তার সৃষ্টি হয়েছে। রাগের বিকাশও এমনি সাত স্বরের আরোহণ ও অবরোহণ থেকেই হয়। রাগের গঠন ও প্রকৃতি মূর্চ্ছনা দিয়ে ঠিক করা হলেও পুরাণকার

বৈতালিক, সূত প্রভৃতিরা এ গান গাইতেন। শিবের স্তুতির জন্যও মঙ্গলগান গাওয়া হত। মহাভারতের যুগে গানের সঙ্গে তো বটেই এবং গান ছাড়াও বাদ্য ও নৃত্যের অনুশীলন হত। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে সপ্তবীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ঝর্ঝরা, আনক, গোমুখ, আরম্বর, পণব, তুরি, ভেরী, পুষ্কর, ঘণ্টা, গজঘন্টা, বল্লকী, শিঞ্জির, নূপুর, পটহ, থারিজ, দুন্দুভি, দেব-দুন্দুভি প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারতে 'বাদিত্র' শব্দটি দ্বারা তত, শুষির, অনদ্ধ বা বিতত ও ঘন—এই চার প্রকার বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। সে যুগে পুরুষদের মত নারীদের, এমনকি অন্তঃপুরচারিণীদেরও গীত-বাদ্য-নৃত্য চর্চা নিষিদ্ধ ছিল না।

মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশেও সঙ্গীতের যথেষ্ট উপাদান পাওয়া যায়। এতে হল্লীস নৃত্য, ছালিকাগান, উগ্রসেন ও যাদবদের জলক্রীড়া, ভদ্রনটের সহায়তায় যাদবদের রামায়ণের অভিনয় ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে এই সময় তুম্বীবীণা, বল্লকী, মৃদঙ্গ, তূর্য, ভেরী, শঙ্খ, বেণু, বীণা, পণব, ঝঝরী, ডিণ্ডিম প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থে গান্ধর্ব গানের বর্ণনা আছে। সামগানের বর্ণনাও আছে। যাগযজ্ঞ, অভিষেক, পুণ্য রাজকর্ম, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে সামগানের আয়োজন থাকত। হরিবংশের সমাজেও লৌকিক এবং বৈদিক গান্ধর্ব ও সাম, এই উভয়-বিধ গানের অনুশীলন ছিল। হরিবংশে বিষ্ণু উপাসনার প্রাধান্য থাকলেও তখন শৈব মতেরও প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। সামগানে ব্রাহ্মণেরা হরি তথা বিষ্ণু-নারায়ণ, কৃষ্ণ-বাসুদেবের পূজা করতেন, আর বিদ্যাধর, নৃত্যশীলা দেবদাসী অপ্সরাগণ শঙ্করের স্তুতিগান করত।

উৎস থেকে ক্রমবিকাশের পথে

ভারতীয় সঙ্গীতের জয়যাত্রা শুরু বৈদিক যুগ থেকে। এই বৈদিক যুগের আরম্ভ আবার ঋকবেদ থেকে।

পূর্বার্চিক, আরণ্যক সংহিতা ও উত্তরার্চিক—এই তিনটি নিয়ে সামবেদের পাঠ-ভাগ গঠিত। গ্রামগেয়, অরণ্যগেয়, উহ এবং উহ্য—এই চারটি গানভাগকে নিয়ে সামবেদের সঙ্গীতাংশ গঠিত।

'সাম' শব্দের অর্থ সুর অথবা সুনির্দিষ্ট স্বর। ঋক্ ছন্দের ওপর এই সুর সংযোজিত হয় এবং তা থেকেই সামগানের বিকাশ। 'সাম' অর্থ তাই স্বরযুক্ত ঋক্ এবং স্বরযুক্ত ঋক্ বা সামের সমষ্টিই সামবেদ। এই সামবেদই ভারতীয় সঙ্গীতের উৎস। এই সামগান থেকেই সঙ্গীতের ধারা অব্যাহতভাবে চলে আসছে।

বৈদিকোত্তর যুগের সঙ্গীত

আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ৬০০ থেকে খ্রিঃ পূঃ ৫০০-এর মধ্যে বৈদিকোত্তর যুগের আরম্ভ। তখন আর্যরা ক্রমশ ভারতের বুকে ছড়িয়ে পড়ছিলেন এবং গড়ে তুলছিলেন নতুন নতুন জনপদ, সৃষ্টি হচ্ছিল নতুন নতুন রাজবংশ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারার মধ্যে নতুন নতুন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল।

এই নতুন ভাঙাগড়ার মধ্যে ভারতীয় সঙ্গীত অক্ষুন্ন থাকলেও রূপে বা গঠনে ও

বিকাশে নতুন কিছু পরিবর্তন এল। এর ফলে আমরা দেখতে পাই মার্গ-সঙ্গীতের সৃষ্টি ও বিকাশ। এই যুগে সামগান সীমাবদ্ধ ছিল 'সামগ' ও 'মার্গবিলাসী' ব্রাহ্মণ বা ঋত্বিকদের মধ্যে। এ ছাড়া স্তুতিবচন, আশীর্বচন, অভিষেক-উৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানে সামগানের প্রচলন ছিল। তারই পাশাপাশি নতুন ধারায় প্রবর্তিত আভ্যুদায়িক ও নিঃশ্রেয়মূলক মার্গসঙ্গীতের প্রচলন হতে শুরু করে।

সামগানের সৃষ্টি যেমন ঋক্ ও প্রথমাদি স্বরের সমবেত মূর্তি থেকে, মার্গ-সঙ্গীতও তেমনি সাহিত্যের সঙ্গে লৌকিক ষড়্‌জাদি স্বরের সমাবেশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সামগানের মতই মার্গসঙ্গীতও সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। কারণ, বৈদিক সাহিত্যে সাধারণের অধিকার ছিল না এবং মার্গসঙ্গীতের সুরের যে বাঁধন ছিল তাতে নৈপুণ্য লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই আমরা বৈদিকোত্তর যুগেই সামগান ও মার্গসঙ্গীতের পাশে আর-এক শ্রেণীর সঙ্গীত দেখতে পাই। এর নাম দেশী সঙ্গীত। অহোবলের 'সঙ্গীত পারিজাত' গ্রন্থে বলা হয়েছে—"মার্গ দেশীয় ভেদেন দ্বেধা সঙ্গীত-মুচ্যতে।" অর্থাৎ সঙ্গীত দু-রকমের ঃ মার্গ ও দেশী। এই দু-শ্রেণীর সঙ্গীতকেই সুখদায়ক বলা হয়েছে—

"তদ্দেশীয় মিতি প্রাহুঃ সঙ্গীতং দেশভেদতঃ।
তদ্দ্বয়ং সুস্বরস্থানৈরুপেতং সুখসাধনম্॥"

অর্থাৎ দেশভেদে সঙ্গীতপদ্ধতিও বিভিন্ন। তাই এই সঙ্গীতকে দেশী সঙ্গীত বলে। এই দু-রকম সঙ্গীত (মার্গ ও দেশী) সুস্বরে গীত হলে সুখদায়ক হয়। দেশী সঙ্গীত দেশ, কাল, পাত্র ভেদে বিভিন্ন প্রকারে গাওয়া হত। মার্গ এবং দেশী এই দু-শ্রেণীর সঙ্গীতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, মার্গসঙ্গীত আলাপ, তান, লয়, মূর্চ্ছনা প্রভৃতি অলংকারের সমাবেশে সুসম্বদ্ধ এবং তার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ—অন্যদিকে দেশী সঙ্গীতে এ সবেরই অভাব।

গান্ধর্ব ও মার্গ সঙ্গীত

'গান্ধর্ব' এবং 'মার্গ'—এই দুটি শব্দ নিয়ে কেউ কেউ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ বিভ্রান্তির কোনও কারণ নেই।[১] বৈদিকোত্তর যুগের মার্গসঙ্গীতই প্রকৃতপক্ষে গান্ধর্ব সঙ্গীত। গান্ধার দেশের অধিবাসী সঙ্গীত-কুশলী গন্ধর্বরাই প্রকৃতপক্ষে মার্গসঙ্গীতের স্রষ্টা। পূর্বে গান্ধার বলে যে অঞ্চল অভিহিত ছিল তার প্রায় সবটাই আফগানিস্তানের পূর্বে অবস্থিত এবং অবিভক্ত ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গান্ধারের ভৌগোলিক অবস্থিতি সম্বন্ধে বায়ুপুরাণে বলা হয়েছে ঃ—

১। নাট্যশাস্ত্র রচয়িতা ভরত বলেছেন, গান্ধর্বদের প্রিয় বলে বৈদিকোত্তর মার্গ-সঙ্গীত গান্ধর্ব নামে পরিচিত। এই গান দেবতাদের কল্যাণ ও প্রীতিকর ছিল—"অত্যর্থমিষ্টং দেবানাং তথা প্রীতিকরং পুনঃ।" (২৮।৯)

গান্ধার বিষয়ে নিম্নে:

তয়োঃ পুত্রৌহি মহাত্মনোঃ

তক্ষস্য দিক্ষু বিখ্যাতা

রম্যা তক্ষশীলা পুরী

পুষ্করস্যাপি বীরস্য বিখ্যাতা

পুষ্করাবতী ॥

এ থেকে বোঝা যায় দুটি বিখ্যাত নগরীকে ধারণ করত প্রাচীন গান্ধার— একটি তক্ষশীলা এবং অপরটি পুষ্করাবতী বা পুস্কলাবতী। তক্ষশীলা অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি জেলায়; আর ব্রিটিশ আমলের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের এবং বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ার জেলায় অবস্থিত পুষ্করাবতী। বর্তমানে এর নাম হয়েছে চারসাদা।

উপরোক্ত গান্ধারের অধিবাসী গন্ধর্বদের প্রবর্তিত 'গ্রৌষত্রিক' বিদ্যাই সে যুগে ছিল গান্ধর্ব তথা বৈদিকোত্তর মার্গসঙ্গীত। গন্ধর্ব সামগানোত্তর, অথচ এই গান সামগানের গুণ ও প্রকৃতিধর্মী সঙ্গীত। নাট্যশাস্ত্রের ২৮শ অধ্যায়ে গান্ধর্ব গানের পরিচয় প্রসঙ্গে ভরত বলেছেন—

"যত্তু তন্ত্রীগতং প্রোক্তং নানাতোদ্য সমাশ্রয়ম্।

গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম্ ॥"

'তন্ত্রী' শব্দের দ্বারা বীণা বোঝাচ্ছে। নানা আতোদ্য, বীণাদি তন্ত্রী-বাদ্যযন্ত্র, সুষির বা বাঁশি, ঘন ও মুরজাদি অনবদ্ধ। অর্থাৎ বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে স্বর, তাল ও পদযুক্ত সঙ্গীতের নামই গান্ধর্ব:

"গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিদ্যা স্বরতালপদাত্মকম্

ত্রিবিধস্যাপি বক্ষ্যামি লক্ষণং চৈব কর্মভিঃ ॥"

অর্থাৎ স্বর, তাল, পদের সমবেত রূপ যে গান্ধর্ব, সেগুলির পরিচয় রয়েছে নাট্যশাস্ত্রে। স্বরের পরিচয় দেওয়া হয়েছে তার অপরিহার্য আঙ্গিক উপাদানগুলি নিয়ে। তাই 'স্বর' প্রসঙ্গে ষড়্‌জাদি সাত স্বর, তাদের অন্তর্বর্তী সূক্ষ্মস্বর হিসেবে শ্রুতি, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, স্থান, সাধারণ আঠারো জাতিরাগ, অলংকার, ধাতু-বর্ণ, গীত ও বীণা প্রভৃতির নামোল্লেখ রয়েছে।

গান্ধর্বগানের আঙ্গিক উপাদানগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাতে রয়েছে:

স্বর—স্বর, শ্রুতি, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, স্থান, সাধারণ আঠারো জাতি (জাতি রাগ), চার বর্ণ, অলংকার, ধাতু ও গীত।

তাল—আবাপ, নিস্কাম, বিক্ষেপ, প্রবেশক বা প্রবেশ, শম্যা, তাল, সন্নিপাত, পরিবর্ত, বস্তু, মাত্রা, বিদারী, আঙ্গুলি, যতি, প্রকরণ, গীতি, অবয়ব, মার্গ, পাদ, ভাগ, পাণি প্রভৃতি।

পদ—ব্যঞ্জন, স্বর, বর্ণ, সন্ধি, বিভক্তি, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, তদ্ধিত, ছন্দ, বৃত্ত, জাতি প্রভৃতি।

গান্ধর্বগানের যে উপাদান স্বর, তাল, পদ এবং তাদের মধ্যে স্বর সামান্যভাবে শ্রুতি ও গ্রামাদির বোধক হলেও তার নিজস্ব রূপ লৌকিক ষড়্‌জাদি সাত স্বরকে নিয়ে গড়ে উঠেছে।

রামায়ণে কুশীলব যে গান গাইতেন সেটি প্রকৃত পক্ষে গান্ধর্ব সঙ্গীতই। সেই জন্যই রামায়ণ রচয়িতা তাঁদের প্রশংসা করে বলেছেন—"মার্গবিধানসংপদা। গানং দ্বিবিধম্‌। মার্গো দেশী চেতি। তত্র প্রাকৃতাবলম্বি গানং দেশী। সংস্কৃতাবলম্বি তু গানং মার্গ।"

মহাভারতের সমাজেও গান্ধর্ব গানের প্রচলন ছিল। মহাভারতে গায়ক, নর্তক, বাদক, দেবদুন্দুভি, অপ্সরাগণের নৃত্য-গীত, গান, শঙ্খ, বেণু, মৃদঙ্গ, স্তুতি, স্তোম, তান, লয়, মূর্ছনা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তবে গান্ধর্বগানের কি রূপ ছিল তার সুনির্দিষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। রামায়ণে সাঙ্গীতিক রূপ ও ভাবের কিছু উল্লেখ আছে।

শার্ঙ্গদেব 'সঙ্গীত রত্নাকর'-এর প্রবন্ধ অধ্যায়ে গান্ধর্বগানের যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে গান্ধর্বগানের দুটি শ্রেণীর উল্লেখ আছে: মার্গ ও দেশী। গান্ধর্ব গানের সূত্র নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"অনাদিকাল ধরে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় যে সঙ্গীত গন্ধর্বরা অনুশীলন ও প্রচার করেছে এবং যা নিরত বা গ্রহ-অংশ-মূর্ছনাদিযুক্ত মোক্ষপ্রদ ও কল্যাণকর, তাকেই গান্ধর্ব বলে। আর বাগ্গেয়কারেরা গ্রহ অংশাদি দশলক্ষণযুক্ত করে যে দেশীয় ও জাতীয় সুর বা রাগগুলিকে অভিজাত শ্রেণীভুক্ত করে নিয়েছিলেন, তাদের দেশীয় সঙ্গীত বলে।"[১] প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন গান্ধর্বগানই পরবর্তীকালে পরিবর্তিত আকারে এবং উপাদানে দেশী সঙ্গীত রূপে আখ্যাত হয়। তাই দেশী বলতে গ্রাম্য বা লোকসঙ্গীত (Folk song) বোঝায় না।

শার্ঙ্গদেবের দ্বারা উল্লিখিত অনাদি সম্প্রদায় শব্দটির ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। 'অনাদি' শব্দের আভিধানিক অর্থ আদি-হীন, উৎপত্তি শূন্য, অর্থাৎ যা কোনও কিছু থেকে সৃষ্টি হয়নি এমন। কিন্তু এই অনাদি শব্দের অন্য অর্থ স্বয়ম্ভূ ভগবান বা পরমেশ্বর অর্থাৎ আদি নেই যাঁর।

টীকাকার কল্লিনাথ বলেছেন—"গান্ধর্বং মার্গঃ। গানং তু দেশীত্যবগন্তব্যম্‌।" মার্গসঙ্গীত বৈদিক সঙ্গীতের মালমশলা এবং রীতিনীতি নিয়ে রচিত। এই জন্য গান্ধর্ব-কে বৈদিকত্বের কৌলিন্য দান করা হয়। শার্ঙ্গদেবও এই জন্য 'অনাদি সম্প্রদায়ং' কথাটি গান্ধর্বের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। 'অনাদিসম্প্রদায়ং' সম্পর্কে কল্লিনাথ বলেছেন—"গন্ধর্বস্য বেদবদপৌরুষেয়ত্বমিতি সূচিতং

---

১ অনাদিসম্প্রদায়ং যদ্‌গান্ধর্বৈঃ সংপ্রযুজ্যতে।
নিয়তং শ্রেয়সো হেতুস্তদ্‌গান্ধর্বং জগুর্বুধাঃ॥
যত্তু বাগ্গেয়কারেণ রচিতং লক্ষণান্বিতম্‌।
দেশীরাগাদিষু প্রোক্তং তদ্‌গানং জনরঞ্জনম্‌॥
—সঙ্গীত রত্নাকর, ৪।২-৩

ভবতি", অর্থাৎ কল্লিনাথ 'অনাদিসম্প্রদায়'-এর দ্বারা গান্ধর্ব সঙ্গীতে বেদের মতই অপৌরুষেয়ত্ব সূচিত হয়েছে বলে মনে করেন। টীকাকার সিংহ ভূপাল বলেছেন—"তস্য গীতস্যগান্ধর্বং গানমিতি ভেদদ্বয়মুক্তং ভরতাদিভিঃ"—অর্থাৎ ভরত প্রভৃতিও গান্ধর্ব গানের পার্থক্যের কথা স্বীকার করেছেন। সিংহ ভূপাল 'অনাদিসম্প্রদায়ং' কথাটির অর্থ করেছেন এইভাবে—"গুরুশিষ্যপরম্পরয়া পরিজ্ঞানম্ তস্মাদেব নিয়তং গ্রহাংশমূর্ছনাদিনিয়মযুক্তম্ ; শ্রেয়স ঐহিকমুখস্য স্বর্গাপবর্গরূপস্য হেতুঃ করণম্।" সিংহ ভূপালের এই উক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, গান্ধর্বরা যে গান গাইতেন তা তাঁরা নিজেরা সৃষ্টি করেননি। সিংহ ভূপালের "অনাদিমান্যো যঃ সংপ্রদায়ো গুরুশিষ্যপরম্পরয়া পরিজ্ঞানম্, তস্মাদেব নিয়তং গ্রহাংশমূর্ছনাদিনিয়মযুক্তম্"—এ থেকে বোঝা যায় যে বৈদিকোত্তর মার্গসঙ্গীত সাম-সঙ্গীতের (অর্থাৎ সামগানের) মালমশলা ও নিয়মকে ভিত্তি করেই রচিত এবং সাম-সঙ্গীত ও মার্গ-সঙ্গীতের মধ্যে যোগ-সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে বিধিবদ্ধ অনুশীলন দ্বারা। তবে লোকপরম্পরায় কোনও কিছু প্রবর্তিত এবং অনুশীলিত হলে পরবর্তী ধারায় আংশিক অথবা অধিক পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন হয়ে থাকে। এর ফলে মূল বস্তুর বা মূল রূপের কোনও পরিবর্তন ঘটে না। একথা মানতে হয় যে পরবর্তী মার্গ-সঙ্গীতে যদি মেল, গ্রহ, অংশ, ন্যাস, মূর্চ্ছনা প্রভৃতির ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে মার্গ-সঙ্গীতের আগের রূপ যে বৈদিক সাম-সঙ্গীত তাতে এ-সবের ব্যবহার ছিল, এটা অনুমান ক'রে নেওয়া যায়।

মার্গ-সঙ্গীত বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে অহোবল তাঁর 'সঙ্গীত-পারিজাত' গ্রন্থে লিখেছেন—

"মার্গাখ্য সঙ্গীতং ভরতাদ্বা ব্রবীংস্বয়ম।
ব্রহ্মনোঽধীত্য ভরতঃ সঙ্গীতং মার্গ সংজ্ঞিতং।
অপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্বৈঃ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তবান।।"

এর অর্থ : ভরতকে মার্গসঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা এবং ভরত আবার তা শিখিয়েছিলেন অপ্সরা ও গন্ধর্বদের—মহাদেবের নিকট পরিবেশন করবার জন্য।

মার্গসঙ্গীত সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব তাঁর 'সঙ্গীত রত্নাকর'-এ লিখেছেন—

"যো মার্গিতোবিরিঞ্চ্যাদৈঃ প্রযুক্তো ভরতাদিভিঃ।
দেবসঃ পুরতঃ শম্ভোর্নিয়তোঽভ্যুদয়প্রদঃ ।।

'মার্গ" শব্দের অর্থ 'পথ', আবার মার্গ বলতে 'অন্বেষণ'ও বোঝায়। এক্ষেত্রে মার্গ অর্থ 'অন্বেষণ'ই ধরতে হবে এবং তা ধরলে এই শ্লোকের অর্থ দাঁড়ায় —বিরিঞ্চি অর্থাৎ ব্রহ্মাদি কর্তৃক চতুর্বেদ থেকে অন্বেষিত হয়ে ভরতাদি কর্তৃক মহাদেব এবং অপর দেবগণের সম্মুখে অভ্যুদয় উদ্দেশ্যে যা প্রযুক্ত হয়েছিল, তা-ই মার্গসঙ্গীত। 'মার্গ" শব্দের অর্থ পথ ধরলে উপরোক্ত শ্লোকের অর্থ দাঁড়ায়—বিরিঞ্চি অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রদর্শিত পথে ভরতাদির

দ্বারা মহাদেব এবং অপরাপর দেবগণের সম্মুখে যে সঙ্গীত প্রযুক্ত হয়েছিল, তা-ই মার্গসঙ্গীত। গান্ধর্ব নামও যে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ রামায়ণের 'মার্গবিধানসংপদা' শব্দগুলি থেকেই বুঝতে পারা যায়' বৈদিক সামগানের মত মার্গ শব্দটি মঙ্গলবাচী ছিল। অর্থাৎ যে গান ছিল আভ্যুদয়িক, অধ্যাত্ম উন্নতিকারক, পবিত্র বা অপার্থিব, তাকেই মার্গ বলা হত। অবশ্য 'মার্গ' শব্দের অর্থ যে বৈদিক সঙ্গীতের পরবর্তী গান্ধর্বের বিশেষ বোধক 'যো মার্গিতো বিরিঞ্চাদ্যৈঃ' এই শব্দগুলি থেকে তা বোঝা যায়। শার্ঙ্গদেবের মতে, মার্গিত বা অন্বেষিত অর্থাৎ চার বেদ থেকে সংগৃহীত গানই মার্গ। তাঁর ভাষায়, "সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ।" স্মার্ত যাজ্ঞবল্ক্যের অভিমত হল—এই গান্ধর্বগান মুক্তির পথ দেখায় বলে মার্গঃ "মোক্ষমার্গে স গচ্ছতি।" গান্ধর্ব তথা মার্গগানের যুগেও সমাজে নৃত্য, গীত ও বাদ্য সহযোগে সঙ্গীত বিকশিত ছিল।

দেশী সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত

প্রাচীনকালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বা রাজ্যে প্রচলিত সঙ্গীতকে দেশী সঙ্গীত বলা হত। এর স্রষ্টা ছিলেন শিক্ষিত সমাজের বুদ্ধিজীবীরা। নিয়ম-কানুন থাকলেও এই গানের প্রকাশ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। বর্তমানের লোক-প্রচলিত সঙ্গীতের উৎস 'দেশী সঙ্গীত'। এই 'লোক-সঙ্গীত' কথার অর্থ লোকসঙ্গীত বা Folk song নয়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সীমানার বাইরে সকল প্রকার আঞ্চলিক সঙ্গীতই এই 'লোক-প্রচলিত সঙ্গীত'-এর মধ্যে পড়ে।

বাংলাদেশে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রভাবকে পুরোপুরি স্বীকার করে তার সরাসরি অনুকরণের প্রচেষ্টাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নবম থেকে দ্বাদশ শতকের চর্যাগীতিগুলিতে তো বটেই, ত্রয়োদশ শতকের জয়দেবের গোবিন্দ'-এর পদগুলিতেও ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ছাপ খুবই স্পষ্ট। জয়দেবের লক্ষ্য ছিল প্রবন্ধ সঙ্গীত। তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে—

> "শ্রীবাসুদেব রতি কেলি কথা সমেত
> মেতং করোতি জয়দেব কবিঃ প্রবন্ধম্ ॥"

বাংলাদেশে ধ্রুপদ প্রচলন হবার আগে বাংলা টপ্পার অনুশীলনই অধিক ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিধুবাবু যে বাংলা টপ্পার সৃষ্টি করলেন সে গানের মূলে যে শোরী মিঞার টপ্পার প্রভাব ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিখ্যাত গায়ক রসুল বক্স বলেছেন, "ভাষার দিকে নজর না দিলে নিধুবাবুর টপ্পা আর শোরী মিঞার টপ্পায় কোনও পার্থক্য নাই।" এই উক্তিকে সব দিক থেকে মেনে নিতে না পারলেও একেবারে অযৌক্তিক বলে অস্বীকার করার উপায় আমাদের নেই। শোরী মিঞার দ্রুত গতির এবং মোটা দানার তান কর্তব সমন্বিত (বাংলা) টপ্পায় রূপ পেয়েছে। কিন্তু এতে

রীতি বা Style-এর সংযোজন খুব একটা ঘটেনি। ভাবগত এবং তার ফলে ভাবগত পার্থক্য অনস্বীকার্য।

হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ বাংলাদেশে প্রবেশ করে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতশিল্পীদের মাধ্যমে। এই ধ্রুপদ ধারার অনুকরণের পরিষ্কার রূপ পাওয়া যায় ব্রহ্মসঙ্গীতে। ব্রহ্মসঙ্গীতে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুর এবং আঙ্গিকের প্রভাব তার অধ্যাত্মসাধনার ভাবগম্ভীর রূপটি সুস্পষ্ট করতে সহায়তা করেছে।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ভারতের প্রতিটি রাজ্যেই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলিত হয়ে আসছে। কিন্তু এই অনুশীলনের মধ্যে ধরা পড়েছে প্রতিটি রাজ্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য অনুশীলনকারীকে প্রেরণা যুগিয়েছে সৃষ্টির। এই সৃষ্টি কখনও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে নিজের সম্পূর্ণ নতুন রূপ প্রকাশ করেছে, কখনও-বা সরাসরি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছে। বাংলার কীর্তন গান বাংলার নিজস্ব সম্পদ বলেই কথিত। কিন্তু কীর্তন গানের পদ্ধতি এবং আঙ্গিক বেঁধে দেওয়া হয়েছে। খেতরীর মহোৎসবে নরোত্তম দাস যে লীলাকীর্তন পরিবেশন করেন তা ধ্রুপদাঙ্গের কীর্তন। এখনও দেখা যায় কীর্তন গায়ক গানের পূর্বে কিছুটা আলাপ করেন। কীর্তন গানে যে সব রাগ ও তাল বর্তমান সেগুলি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে ভিত্তি করেই সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং কীর্তন গান ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকলেও সম্পূর্ণ নতুন ধারার সঙ্গীত। ঠিক একই কারণে বাংলার টপ্ খেয়ালের উল্লেখ করা যায়। টপ্পা এবং খেয়াল রীতির মিশ্রণে এই গানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু টপ খেয়াল বাংলার নিজস্ব সম্পদ। এই গানে মোটাদানার তান ও গমক গিটকিরির অলংকার বর্তমান। বাংলার শ্যামাসঙ্গীত, রামপ্রসাদী গান ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের ভিত্তিভূমি থেকে সরে না গিয়েও সজল-শ্যামল নদীমাতৃক বাংলার স্ব-ভাবে পরিপূর্ণ। স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য বাংলা গানে ব্যবহৃত রাগরাগিণীর স্বরসজ্জায় কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়।

পাণিনি ও পতঞ্জলির যুগের সঙ্গীত

পাণিনির যুগেও গান্ধর্ব সঙ্গীতের বিকাশ আমরা দেখতে পাই। খ্রিঃ পূঃ পঞ্চম শতকে পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী[১] ব্যাকরণ রচনা করেন। অষ্টাধ্যায়ীতে পাণিনি যে ভিক্ষু ও নটসূত্রের কথা উল্লেখ করেছেন তা থেকেই বোঝা যায় যে সে যুগের সমাজে নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে নৃত্যগীতের প্রচলন ছিল।

---

১. পাণিনির সময় নিয়ে মতভেদ আছে। স্যর উইলিয়ম হান্টারের মতে পাণিনির সময় প্রায় ৩৫০ খ্রিঃ পূঃ, কিন্তু ম্যাকডোনেল তাঁর India's Past গ্রন্থে পাণিনির সময় নির্ধারণ করেছেন ৫০০ খ্রিঃ। গোল্ড ষ্টুকারের মতে তিনি খ্রিঃ পূঃ অষ্টম শতকে এবং ম্যাক্সমুলার ও ওয়েবারের মতে খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ শতকে জীবিত ছিলেন।

খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় শতকে অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে উল্লেখ করেছেন যে তাঁর সময়ে মঞ্চ এবং নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। তিনি রঙ্গ, আরম্ভক, নট, গ্রন্থিক, শোভনিক প্রভৃতি শব্দের দ্বারা নাটকাভিনয়ের কথাই ব্যক্ত করেছেন। এ ছাড়া সঙ্গীতের উপাদান হিসাবে মৃদঙ্গ, পিথর বীণা, দুন্দুভি প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তাঁর মহাভাষ্যে নৃত্য ও নর্তকীর কথাও রয়েছে।

জাতকের যুগে গান্ধর্ব গান

বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের ইতিহাস হল জাতক। এই বৌদ্ধ জাতকগুলি রচিত বা সংকলিত হয় আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শতাব্দীতে। জাতকগুলির সংখ্যা ৫৫০-এর অধিক। এর মধ্যে ১৫ খানি জাতকে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয় সম্পর্কে যে আলোচনা আছে তা থেকে সে-যুগের সঙ্গীতের পরিচয় পাওয়া যায়। যে জাতকগুলিতে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয় সম্পর্কে আলোচনা আছে সেগুলি হল—নৃত্য-জাতক, ভেরীবাদক-জাতক, বিশ্বন্তর জাতক, কুশ-জাতক, অসদৃশ্য-জাতক, সর্বদংষ্ট্র-জাতক, গুপ্তিল-জাতক, ভদ্রঘট-জাতক, বীণাস্থূণা-জাতক, চুল্ল-প্রলোভন-জাতক, ক্ষান্তিবাদি-জাতক, কাকবতী-জাতক, শঙ্খ-জাতক, মৎস্য-জাতক, বিদুরপণ্ডিত-জাতক। এগুলি থেকে জানা যায় যে জাতকের যুগে বীণার প্রচলন ছিল। দু-একটি জাতকে গীত ও বাদ্যের কিছুটা স্পষ্ট রূপের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে রাগরাগিণীর নির্দিষ্ট কোনও রূপের পরিচয় জাতকে পাওয়া যায় না। একমাত্র মৎস্য-জাতকে 'মেঘ গীতি' এবং গুপ্তিল-জাতকে উত্তম ও মধ্যম মূর্চ্ছনা দুটির নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমান করা চলে যে জাতকের যুগে রাগ, রাগিণী, অলংকার, শ্রুতি, তাল, মূর্চ্ছনা প্রভৃতির প্রচলন থাকাই সম্ভব।

বৌদ্ধ-জাতক এবং গাথাগুলির (থের গাথা ও থেরী গাথা) পর সঙ্গীতের উপাদান পাওয়া যায় হীনযানী বৌদ্ধদের প্রামাণিক গ্রন্থ 'মহাবস্তু', 'ললিতবিস্তার', 'লংকাবতার সূত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে। 'ললিতবিস্তার'-এ নৃত্য, গীত, বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ থাকলেও তাদের নির্দিষ্ট কোনও রূপের পরিচয় পাওয়া যায় না।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী এবং দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় সঙ্গীতের কী রূপ ছিল তা আমরা জানতে পারি যে দুটি গ্রন্থ থেকে তা হচ্ছে নারদ রচিত 'শিক্ষা' এবং ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'। এই দুটি গ্রন্থ যদিও পুরোপুরি সঙ্গীত সম্পর্কীয় নয়, তথাপি ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমবিকাশকে বুঝতে হলে উপরোক্ত গ্রন্থ দুটি অপরিহার্য।

নারদের 'শিক্ষা'-র মূল আলোচ্য বিষয় বৈদিক ছন্দ। কিন্তু এই গ্রন্থে বৈদিক এবং লৌকিক সঙ্গীতের মূলগত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' মূলত নাট্যপ্রয়োগ সম্পর্কিত গ্রন্থ, কিন্তু নাটকে প্রযুক্ত গান

সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ভরত এই গ্রন্থে সে-যুগের সঙ্গীতের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের গ্রন্থে যে গানের আলোচনা করা হয়েছে তা গান্ধর্ব গান।

ভরতের সময়ে অর্থাৎ খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। ভরত বিস্তারিতভাবে এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে ভারতীয় সঙ্গীত, নৃত্য এবং নাটকের আলোচনা করেছেন। ভরতের সময়ে গান্ধর্ব গানের গায়ন-রীতি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল—ধর্মীয় স্থানের গান, রাজসভার গান এবং নাটকের গান। ধর্মীয় স্থান অর্থাৎ মন্দিরে যে গান গাওয়া হত তা ছিল পবিত্র। রাজসভার গান রাজদরবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। নাট্য-সঙ্গীত অভিনয়ের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হত। ভরত এই নাট্য-সঙ্গীত অবলম্বনেই সঙ্গীতের আলোচনা করেছেন।

নারদের 'শিক্ষা'য় সঙ্গীত

বৈদিক সামগানের প্রকৃত রূপ ও রীতিনীতি এবং সে প্রসঙ্গে লৌকিক, মার্গ ও দেশী-সঙ্গীতের সঙ্গে বৈদিকের সম্পর্ক এবং সে-সম্বন্ধে খুঁটিনাটি তথ্য জানতে হলে যে বইটি অপরিহার্য তার নাম 'শিক্ষা'। এই 'শিক্ষা' গ্রন্থের রচয়িতা নারদ।[১] গ্রন্থটি রচিত হয় খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে।

'শিক্ষা' গ্রন্থে নারদ লিখেছেন যে, বেদে উচ্চ, নীচ, মধ্য তথা উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর তিনটি ব্যবহৃত হত। এই স্বর তিনটি ছাড়াও সামগানের সাত স্বর—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, অতিস্বার্য ও ক্রুষ্ট এবং লৌকিক সাত স্বর—ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদের পরিচয় দিয়েছেন। স্বর সংখ্যার তারতম্যে এবং প্রয়োগে গানগুলির বিচিত্র নাম হত। যেমন আর্চিক গাথিক (গাথা), সামিক, স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ গান। আর্চিকগানে থাকত একটি মাত্র স্বর, গাথিকে বা গাথায় দুটি, সামিকে তিনটি, স্বরান্তরে চার, ঔড়বে পাঁচ, ষাড়বে ছয় এবং সম্পূর্ণগানে সাতটি স্বর। কিন্তু ওই সাতটি শ্রেণীর গান একই সময়ে সৃষ্টি হয়নি, ক্রমবিকাশের ধারাকে অবলম্বন করে সাতটি শ্রেণীর পূর্ণবিকাশ হতে কয়েকশো বছর লেগেছিল। মোটামুটি সাতটি যুগের অবদান সাত স্বর ও সাত শ্রেণীর গান। বর্তমানে প্রথম চারটি স্তর লুপ্ত হয়ে গেছে। শেষের ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ শ্রেণী আজও অতীতের স্মৃতি বহন করছে।

এর পরে নারদ পরিচয় দিয়েছেন স্বর-স্থানের। তিনি বলেছেন ঃ

"উরঃ কণ্ঠঃ শিরশ্চৈব স্থানানিত্রীণি বাঙ্‌ময়ে"

অর্থাৎ উর, কণ্ঠ ও শির—এই তিনটি স্থানে স্বর মন্দ্র, মধ্য ও তার অথবা নীচ,

১। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে ষোড়শ-অষ্টাদশ পর্যন্ত আমরা চার জন নারদের নাম পাই। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রের রচয়িতা হিসাবেও নারদের উল্লেখ আছে।

মধ্য ও উচ্চরূপে প্রকাশ পায়। তিনি শাখাভেদে বৈদিক স্বরের প্রয়োগ সম্বন্ধে উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, বেদের প্রতিটি শাখা তাদের সামগানে পৃথক পৃথক প্রণালীতে সাত বা তার কম স্বরের সমাবেশ করত।

'শিক্ষা' গ্রন্থের প্রথমে নারদ সামগানের প্রকৃত পরিচয় দান করেছেন। তারপর তিনি লৌকিক সঙ্গীতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন : 'তান, রাগ, গ্রাম, মূর্ছ্ছনা, অলংকার—এইসব লৌকিক তথা মার্গ ও দেশী সঙ্গীতের অঙ্গাভরণ, সেই সঙ্গে বৈদিক গানের লক্ষণ এবং স্বরূপ তিনি লৌকিক সঙ্গীতের পাশে পাশে উল্লেখ করে গেছেন।

স্বর, গ্রাম ও মূর্চ্ছনার পরিচয় দেবার সময় নারদ বলেছেন :

সপ্ত স্বরাস্ত্রয়ো গ্রামা মূর্চ্ছনাস্ত্বেকবিংশতিঃ।
তানাএকোনপঞ্চাশদিত্যেতৎ স্বরমণ্ডলম্ ॥

"স্বর সাতটি, গ্রাম তিনটি, মূর্চ্ছনা একুশটি ও একোনপঞ্চাশৎ তান আর এদের সমবেত রূপের নাম 'স্বরমণ্ডল'।[১] 'সপ্ত স্বরাঃ' বলতে শিক্ষাকার নারদ প্রথমাদি সাত স্বরের কথা বোঝাননি, তাঁর মতে "ষড়্জশ্চ ঋষভশ্চৈব গান্ধারো মধ্যমস্তথা, পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্তমঃ স্বরঃ।" নারদ যে সময় 'শিক্ষা' রচনা করেন তার বহু আগে থেকেই বৈদিক সমাজে বেদগানের পাশাপাশি লৌকিক গান প্রচলিত ছিল এবং "তার সুস্পষ্ট নিদর্শন অরণ্যগেয়গান ও গ্রামগেয় গানের অনুশীলন থেকে পাওয়া যায়।"[২]

তিনটি গ্রামের কথা নারদ বলেছেন—

ষড়্জমধ্যমগান্ধারস্ত্রয়ো গ্রামাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

এর অর্থ ষড়্জ, মধ্যম এবং গান্ধার, এই তিনটি গ্রাম। 'শিক্ষা'র রচয়িতা নারদের সময়ে গান্ধার গ্রামের প্রচলন ছিল না। কিন্তু গান্ধার গ্রাম সম্পর্কে তিনি যে অবহিত ছিলেন তার পরিচয় আছে তাঁর গ্রন্থে।

শিক্ষাকার নারদ বৈদিক ও লৌকিক, এই দু-রকম গানের দশ রকম গুণের কথা বর্ণনা করেছেন। এই গুণগুলি হল—রক্ত, পূর্ণ, অলংকৃত, প্রসন্ন, ব্যক্ত, বিকৃষ্ট, শ্লক্ষ্ণ, সম, সুকুমার ও মধুর। এই দশটি গুণযুক্ত হলে তান সার্থক হয়। গুণের সঙ্গে সঙ্গে গানের দোষ সম্পর্কেও নারদ বলেছেন। এই দোষগুলি হল—শঙ্কিত, কম্পিত, কাকস্বরবৎ কর্কশ, অতি উচ্চ, তীক্ষ্ণ, বিরস ও ব্যাকুলিত। গায়কের এইসব দোষ থাকলে তার স্বর শ্রুতিমধুর হয় না।

তিনটি গ্রামের নাম ও মূর্চ্ছনার পরিচয় প্রসঙ্গে শিক্ষাকার নারদ সাতটি লৌকিক স্বরের নাম করেছেন :

ষড়্জশ্চ ঋষভশ্চৈব গান্ধারো মধ্যমস্তথা।
পঞ্চমী ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্তমঃ স্বরঃ ॥

১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি', প্রথম খণ্ড, কলিকাতা (১৯৫৫), পৃঃ ২১৭।
২। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি', প্রথম খণ্ড, কলিকাতা (১৯৫৫), পৃঃ ২১৭।

নারদ তাঁর 'শিক্ষা' গ্রন্থে সামস্বর ও সামগানের কিছু কিছু আলোচনা করেছেন বটে, তবে লৌকিক দেশী ও মার্গ সঙ্গীতের সব কিছুর পরিচয় দেবার দিকেই তাঁর বেশি প্রবণতা দেখা যায়। শিক্ষাকার নারদের সময়ে সমাজে গানের প্রচলন এবং সমাদর বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন বৈদিক গান যাজ্ঞিক সামগ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সম্ভবত এই জন্য তিনি লৌকিক সঙ্গীত নিয়ে বেশি আলোচনা করেছেন। "দেশী সঙ্গীতের প্রচলন বৈদিক যুগেও ছিল, সামগানের পাশে পাশে, যার সুস্পষ্ট প্রমাণ পরিচয় পাই বৈদিক অরণ্যগের গান ও গ্রামগেয় গানের মধ্যে। গ্রামগেয় গানই পরে সংস্কৃত ও পরিবর্তিত রূপ নিয়ে লৌকিক গান্ধর্বে ও গানে তথা মার্গসঙ্গীতে ও দেশী সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং একথাও সহজে অনুমান করা যায়, বৈদিক সাত স্বর প্রথমাদির সমসাময়িক লৌকিক সাত স্বর ষড়্‌জাদির প্রচলন ছিল। তবে একথা ঠিক যে, উভয়ের মধ্যে কোন যোগসূত্র ছিল না, উভয়েই সমান্তরাল রেখার মত প্রসারিত, নারদের কৃতিত্ব হল সেই যোগ্যসূত্র রচনায় বা প্রতিষ্ঠায়। তিনি উভয়কেই গণ্য করেছিলেন সমগোত্রীয় হিসেবে। উভয়ের মধ্যে একটি মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করে তিনি ভারতীয় ইতিহাসের অনুসন্ধানী ক্ষেত্রকে চিরপ্রবহমান রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। তাই বৈদিক ও লৌকিক এই দুই শ্রেণীর স্বরগুলির পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ বা উচ্চারণগত একটি সামঞ্জস্যের তিনি সন্ধান দিয়েছিলেন।"[১]

'শিক্ষা'-র রচয়িতা

নারদ বৈদিক স্বর এবং লৌকিক স্বর—এ দুটির মধ্যে ধ্বনিগত ঐক্য দেখিয়ে সাত স্বরের বিকাশ এবং জন্মকাহিনী লিখেছেন। তাঁর মতে—"পশুপক্ষীদের ধ্বনির অন্তিম স্বরের মধ্যে ষড়্‌জাদি সাত স্বরের বিকাশ ঘটেছে।" তিনি আবার কণ্ঠ থেকে ষড়্‌জের, শির থেকে ঋষভের, নাক থেকে গান্ধারের, উরু থেকে মধ্যমের, উরু, শির ও কণ্ঠ এই তিন স্থান থেকে পঞ্চমের, ললাট থেকে ধৈবতের এবং সর্বসন্ধি থেকে নিষাদের উৎপত্তির কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। নারদ সাতটি লৌকিক স্বরের অধিস্বর ও ঋষিদের নাম করেছেন। যেমন ষড়্‌জ ও ঋষভের দেবতা অগ্নি, গান্ধারের সোম বা চন্দ্র, মধ্যমের বিষ্ণু, পঞ্চমের নারদ এবং ধৈবত ও নিষাদের তুম্বুরু। নারদ তাঁর শিক্ষায় শ্রুতি সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। তবে তাঁর গ্রন্থে মাত্র পাঁচটি শ্রুতির নাম পাওয়া যায়। এর পাঁচটি শ্রুতি হচ্ছে—'দীপ্তা, আয়তা, করুণা, মৃদু ও মধ্য'। লৌকিক ষড়্‌জাদি সাত স্বরের শ্রুতি সম্বন্ধেও কোনও কথা নারদ উল্লেখ করেননি।

১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি', প্রথম খণ্ড (১৯৫৬), পৃঃ ২৪৭।

খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকের নাট্য অনুষ্ঠানে সঙ্গীত কিভাবে ব্যবহার করা হত তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ভরতের[১] 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে। ব্রহ্মভরত রচনা করেছিলেন আদি নাট্যবেদ 'ব্রহ্মভরতম্'। পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রীরা এই ব্রহ্মাকেই 'দ্রুহিন ব্রহ্মা' বলেছেন। এই 'দ্রুহিন ব্রহ্মা' রচিত আদি নাট্যশাস্ত্রের সারসংকলনই আচার্য ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্র। 'ব্রহ্মভরতম্' গ্রন্থটিতে আর কোনও প্রাচীন ও প্রামাণিক নাট্যগ্রন্থের উল্লেখ নেই। এতে বিষয়বস্তুর আলোচনাও সংক্ষিপ্ত। এজন্য গ্রন্থখানিকে নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ বলে মনে করেন অনেকেই। "The book forms probably the earliest record of the science."—History of Sanskrit Literature—Dr. Krishnamachari, (p. 825)। আচার্য ভরত রচিত নাট্যশাস্ত্র 'ব্রহ্মভরতম্'-এর সারসংকলন এবং তাঁর স্বীকৃতি অনুসারে তাঁর গ্রন্থের মূল বিষয়, নাটকীয় নৃত্যগীত, ভাব ও রস পর্যায়ের আলোচনা করা হয়েছে তাঁর পূর্ববর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রীদের অনুসরণ করে। সুতরাং ভরত তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর লোক হলেও তাঁর গ্রন্থ যে প্রাচীনতম নাট্যকলা ও নাট্যগীতির পরিচয় বহন করছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ভরতের আলোচনার মূল বিষয় নাট্য-বিজ্ঞান। নাটকের অঙ্গ হিসাবে তিনি সঙ্গীতের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেদিক থেকে 'নাট্যশাস্ত্র'-এর সব অধ্যায়গুলিতেই সঙ্গীতের কোনও-না-কোনও পরিচয় বর্তমান। তবে ২৮ থেকে ৩৩ অধ্যায়গুলিতে বিশেষভাবে নাট্য-সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সে-যুগে গীত, বাদ্য এবং নৃত্য কিভাবে নাটকে প্রয়োগ করা হত এবং সেই সঙ্গীতের রূপের বিস্তৃত পরিচয় তিনি দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে বারো হাজার শ্লোক নিয়ে আচার্য ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' সম্পূর্ণ ছিল। পরে মাত্র ছ-হাজার শ্লোক নিয়ে এই গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করে। এই গ্রন্থের দুটি সংস্করণ বর্তমান। অনেকে এই দুটি সংস্করণের দুটি নামকরণ করেছেন। বড় সংস্করণটির নাম 'নাট্যবেদাগম' এবং ছোট সংস্করণটির নাম 'নাট্যশাস্ত্র'। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নাটকের অঙ্গ বা সহায়ক হিসাবে সঙ্গীতের আলোচনা করেছেন। 'নাট্যশাস্ত্রে' ভরত সঙ্গীতের যে আলোচনা করেছেন তা বেশ সুসম্বদ্ধ এবং বিজ্ঞানসম্মত। ২৮ থেকে ৩৩ অধ্যায়গুলিতে ভরত জাতিগান, ধ্রুবাগীতি, আলোচনা প্রসঙ্গে রাগ ও গানের বর্ণ,[২] অলংকার, মূর্চ্ছনা, রাগ ও

১। ভরত খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর গুণী। ডঃ রাঘবন ভরতের কাল নির্দিষ্ট করেছেন দ্বিতীয় খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত। ডঃ কৃষ্ণমাচারিয়ার, ডঃ ভাণ্ডারকর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নাট্যশাস্ত্রের কাল নির্দেশ করেছেন—খ্রিঃ পূঃ শতাব্দী থেকে ২য় শতাব্দী।

২। ভরত 'বর্ণ' বলতে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ও কম্পিত—এই চার বর্ণ বুঝিয়েছেন। জাতি রাগের বেলায় বর্ণ বলতে আবার তিনি আরোহী, অবরোহী, স্থায়ী ও সঞ্চারীর কথা বলেছেন।

ভাব প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু লৌকিক উদাত্তাদি স্থান-স্বরগুলির সম্পর্কে কিছু বলেননি। তবে সম্ভবত ১৯ অধ্যায়ে পাঠ্যের প্রসঙ্গে স্থান-স্বরগুলির প্রকৃতি ও প্রয়োগের কথা তিনি আলোচনা করেছেন। ভরত উদাত্তাদি চার বর্ণের রসস্ফূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন। যথা—স্বরিত ও উদাত্ত থেকে হাস্য ও শৃঙ্গার রস, উদাত্ত ও কম্পিত থেকে বীর ও রৌদ্র রস এবং অনুদাত্ত, স্বরিত ও কম্পিত থেকে করুণ, বীভৎস ও ভয়ানক রসের স্ফূর্তি হয়।

নাটকের দশরূপ বা দশটি বিভাগ প্রসঙ্গে জাতি, শ্রুতি এবং ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম দুটির কথা উল্লেখ করেছেন ভরত। তাঁর মতে, "জাতি ও শ্রুতি যেমন গ্রাম সৃষ্টি করে তেমনি বিচিত্র বৃত্তি কাব্যবন্ধ বা নাটক সৃষ্টি করে। ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম দুটিতে যেমন সকল স্বরেরই সমাবেশ থাকে, তেমনি নাটক ও প্রকরণে সকল বৃত্তি থাকে।"

প্রেক্ষাগৃহ এবং রঙ্গমঞ্চের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন ভরত। কখন কোন গান হত, কোন গানের সঙ্গে কী বাদ্যযন্ত্র বাজানো হত, গায়ক ও বাদকেরা কোথায় কিভাবে বসত, তার বিস্তৃত বর্ণনা 'নাট্যশাস্ত্রে' রয়েছে।

যবনিকার বহির্ভাগেও নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন ভরত। বৈদিক যুগে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় যাগমণ্ডপের বাইরে 'বহিস্পমানস্তোত্র' নামে যে গান করার রীতি ছিল, কেউ কেউ বলেন যে, যবনিকার বহির্ভাগের গান তারই অনুকরণ।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে গান্ধর্ব গানের পরিচয় পাওয়া যায়। ভরত বলেছেন, "বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে স্বর, তাল ও পদযুক্ত সঙ্গীতের নাম গান্ধর্ব।" এই স্বর, তাল ও পদযুক্ত গান্ধর্বে পদের অর্থ স্বর ও তালের বোধক বা অনুভাবক 'বস্তু' ও যা-কিছু অক্ষর সনিবদ্ধ তাই 'পদ' নামে অভিহিত। পদ দু-প্রকার—নিবদ্ধ এবং অনিবদ্ধ। নিবদ্ধ পদ তালযুক্ত। ধ্রুবা গানে নিবদ্ধ পদ ব্যবহৃত হত। অনিবদ্ধ পদে অক্ষর, ছন্দ ও যতি থাকে কিন্তু তাল থাকে না। অনিবদ্ধের অন্য নাম 'আলাপ'। তবে দু-প্রকার পদেই বেণু, বীণা, ঘন ও মৃদঙ্গাদি বাদ্যের সহযোগ থাকে। মোট কথা, ষড়্জাদি সাতটি স্বর, তালযুক্ত নিবদ্ধ এবং তালহীন অনিবদ্ধ—এই সব নিয়ে হল গান্ধর্বের সামগ্রিক রূপ।

স্বরগোষ্ঠীর মধ্যে ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' সাতটি শুদ্ধ এবং এগারোটি বিকৃত—এই আঠারোটি জাতি রাগের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে, একটি জাতিরাগ বা কয়েকটি জাতিরাগের সঙ্গে মিশ্রিত হলে বিকৃত জাতির সৃষ্টি হয়। এই জাতি রাগশ্রেণীভুক্ত কি না এ বিষয়ে মতানৈক্য বর্তমান। তবে অনেকে এই জাতিকে আদিম ভারতীয় রাগ বলে স্বীকার করেছেন।

ভরত সঙ্গীতের চার বর্ণের কথা বলেছেন। বর্ণের পরে তিনি অলংকার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ভরত বলেছেন, "চন্দ্রহীন রাত্রি বা অলংকারবিহীন রমণী যেমন সৌন্দর্যহীন, তেমনি গানে অলংকার না থাকলে গান অসুন্দর বলে

প্রতিভাত হয়।" প্রসন্নাদি, সম, বিন্দু, কম্পিত, কুহর—এমন বহু অলংকারের নাম ভরত উল্লেখ করেছেন।

স্বর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অলংকারের পরই ভরত 'ধাতু'র উল্লেখ করেছেন। বিস্তার, করণ, আবিদ্ধ ও ব্যঞ্জন—এই চার প্রকার ধাতুর কথা তিনি বলেছেন। এই ধাতুগুলিকে তিনি বাদ্যযন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গরূপ বলেছেন। এই ধাতুর সংখ্যা মোট ৩৪টি।

স্বর প্রবাহের পর ভরত তাল বা তালশ্রেণীভুক্ত উপাদানের আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে তাল দু-প্রকার—(১) সশব্দঃ—শম্যা, তাল ধ্রুব ও সন্নিপাত, (২) নিঃশব্দঃ—আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশক।

'বস্তু' ও 'বিদারী' সম্বন্ধে আলোচনায় ভরত বলেছেন, সব গীতের অংশ বা অবয়বের নাম 'বস্তু' আর আলাপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড হচ্ছে 'বিদারী'।

পদের পরিচয় প্রসঙ্গে ভরত বলেছেন, যা-কিছু অক্ষর দিয়ে তৈরি তাই পদ। স্বর, ব্যঞ্জন, সন্ধি, বিভক্তি, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, তদ্ধিত, ছন্দ, বৃত্ত, জাতি প্রভৃতি পদের উপাদান।

গান্ধর্বের স্বর হিসাবে ভরত নারদের মত লৌকিক ষড়্জাদি সাত স্বর ও তাদের দশ লক্ষণের কথা বলেছেন। তবে পরবর্তী গ্রন্থকারদের মত স্বরের জাতি, কুল, বর্ণ, দেবতা, স্থান প্রভৃতির কথা বলেননি।

ভরতের মতে বাদী, সম্বাদী ও অনুবাদী বিবাদী শ্রুতি-সংখ্যার মাধ্যমে নির্ণয় করা উচিত। তিনি ষড়্জ গ্রামের শ্রুতি বিভাগের পরিচয় দিয়েছেন। মূর্চ্ছনা এবং তান সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। কিন্তু তানের আভিধানিক পরিচয় তিনি দেননি।

জাতি তথা জাতিরাগ নির্ণয়ের জন্য দশ-লক্ষণ স্বীকার করেছেন ভরত। এ থেকে অনেকে সিদ্ধান্ত করেন যে, ভরত কর্তৃক উল্লিখিত শুদ্ধ ও বিকৃত জাতি-গুলি রঞ্জনা শক্তি ও লাবণ্য গুণবিশিষ্ট রাগই। তিনি জাতিরাগে তিনটির বেশি অংশের কথা বলেছেন। ভরতের মতে—"গ্রহ কা অংশাদি যুক্ত জাতিরাগগুলি চিত্রা, আবৃত্তি, দক্ষিণা—এই তিনটি বৃত্তির সহযোগে এবং মাগধী, অর্ধ মাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথক—এই চারিটি গীতির সঙ্গে প্রয়োগ করা হত।"

ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' নিবদ্ধ গান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ছন্দক, আসারিত, বর্ধমানক, ঋক্, পানিকা, গাথা, সাম বৈদিকোত্তর নিবদ্ধ গান। এগুলি বৈদিক গানের উপাদানেই তৈরি। ভরত বলেছেন যে, নাটকে ব্যবহারের জন্য বিবিধ ছন্দে, বৃত্তে, রসে ও ভাবে অনুবিদ্ধ অংশগুলিকে সে-যুগে অনুশীলন করা হত। ধ্রুবা গান উত্তম, মধ্যম, অধম—এই তিন ভাগে বিভক্ত। এই গানের ভাষা সম্বন্ধে ভরত বলেছেন যে ধ্রুবায় শূরসেনী ভাষা প্রয়োগ করা হত। দিব্যভাষা হিসেবে সংস্কৃতের সমাদর স্বভাবতই ছিল। তবে অর্ধ-সংস্কৃতই ছিল মানুষের উপযোগী।

ভরত নাট্য, গীত, বাদ্য ও নৃত্যের স্রষ্টা ছিলেন না। কিন্তু 'নাট্যশাস্ত্রে'

এ-সব বিষয় সম্পর্কে যে-তথ্য ও তত্ত্ব তিনি উল্লেখ করেছেন তা ঐতিহাসিকদের কাছে অমূল্য সম্পদ। কারণ বৈদিক সাহিত্যের মাধ্যমে যেমন সামগানের রূপ ও বিকাশ সম্বন্ধে আমরা কিছুটা ধারণা করতে পারি তেমনি ক্লাসিক্যাল যুগের গান্ধর্ব-সঙ্গীত যে বৈদিক সঙ্গীতের মালমসলা নিয়ে নতুন রূপে ও ভাবে গড়ে উঠেছিল তার সকল কিছুর পরিচয় পাই মুনি ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে।

নাট্যশাস্ত্রোত্তর কয়েকটি গ্রন্থ

ভরতের পর সঙ্গীতশাস্ত্রী হিসাবে যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁরা হলেন স্বাতী, কোহল, শাণ্ডিল্য, বিশ্বাখিল, বিশ্বাবসু, দুর্গাশক্তি, শার্দুল, দত্তিল, নন্দিকেশ্বর, তুম্বুরু, বাষ্টিক, মতঙ্গ প্রভৃতি। এঁরা খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের সঙ্গীতশাস্ত্রী। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন যে ইন্দ্রধ্বজ মহোৎসব রূপে নাট্যাভিনয়ে তিনি স্বাতীকে ভাণ্ডবাদক এবং নারদকে গায়ক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। কোহল 'সঙ্গীতমেরু' প্রমুখ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ষড়্‌জাদি সাত স্বর ও বাইশটি শ্রুতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি স্বর অবিনাশী ও অনন্ত—এই বিচার প্রসঙ্গে জাতিরাগ ও ভাষারাগের উল্লেখ করেছেন। ভরত যে জাতি বা জাতিরাগের কথা বলেছেন তার প্রচলন কোহলের সময় ছিল। তাছাড়া গ্রামরাগ ও ভাষাদিরাগের বিকাশও তাঁর সময়ে ঘটেছিল। জাতিরাগ, গ্রামরাগ ও ভাষাদিরাগের প্রকাশের সার্থকতা ও পরিপুষ্টির জন্য মূর্চ্ছনার প্রয়োজন। কোহল বলেছেন, রাগের লক্ষণ ও প্রকৃতি অনুসারে মূর্চ্ছনার প্রয়োগ দরকার।

রামায়ণের টীকাকার কুশীলব কর্তৃক গীত শুদ্ধ সাতটি জাতিরাগের অনুযায়ী শাণ্ডিল্য অনুমোদিত সাতটি শুদ্ধ জাতির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বিকৃত কোনও জাতিরাগের কথা বলেননি। শাণ্ডিল্য ভরতের অনুগামী। তাসত্ত্বেও বিকৃত জাতিরাগের কথা তাঁর প্রসঙ্গে যে উল্লিখিত হয়নি, তার কারণ শাণ্ডিল্যের সঙ্গীতগ্রন্থ অনেক আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে। মহাভারতে যে বিশ্বাবসুর নাম পাওয়া যায় তিনি গন্ধর্বরাজ এবং তাঁর সঙ্গীতের জ্ঞান ছিল। কিন্তু ভরত এবং নারদ বিশ্বাবসুর নাম না করায় মনে হয় সঙ্গীতশাস্ত্রী বিশ্বাবসু পরবর্তীকালের লোক। এই বিশ্বাবসু শ্রুতির ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, যে সূক্ষ্ম স্বরগুলি কানে শোনা যায় তাদের শ্রুতি বলে। শার্দুলও দীপ্তাদি পাঁচটি শ্রুতির অন্তর্গত বাইশটি শ্রুতির উল্লেখ করেছেন। শার্দুল দেশজরাগগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁর সময়ে গান্ধর্বের পরিবর্তে অভিজাত (মার্গ প্রকৃতি সম্পন্ন) দেশজরাগগুলির সামাজিক প্রচলন আরম্ভ হয়েছিল।

দত্তিল ভরতকে অনুসরণ করে নাট্যের উপযোগী গান্ধর্ব সঙ্গীতেরই আলোচনা করেছেন।[১] ভরত যেমন স্বর-তাল-পদাত্মক গানকে গান্ধর্ব গান বলেছেন,

১। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি', উত্তর ভাগ, কলিকাতা (১৯৬৬)।

দত্তিলও তেমনি বলেছেন পদের মধ্যস্থ স্বরসমূহ এবং তালের দ্বারা যে গান অবধানের সঙ্গে (মনঃসংযোগ এবং সেই অনুসারে একান্ত যত্ন ও অধ্যবসায়) প্রযুক্ত হয়, তাকেই গান্ধর্ব বলে—

পদস্থস্বরসংঘাতস্তালেন সুমিতস্তথা।
প্রযুক্তশ্চাবধানেন গান্ধর্বমভিধীয়তে॥

দত্তিল উল্লেখ করেছেন যে গান্ধর্ব গানকে যে উপাদানগুলি পরিপুষ্ট ও পূর্ণ করে সেগুলি হল: শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা, তান, স্থানবৃত্ত, শুষ্ক বা নিগীত বাদ্য, সাধারণ, জাতি, বর্ণ, অলঙ্কার ও রস। দত্তিলও বাইশটি শ্রুতির পক্ষপাতী, তবে তিনি শ্রুতিকে বলেছেন ধ্বনি। তিনি স্বরমণ্ডলের রূপ বর্ণনা করেছেন। বিকৃত স্বর হিসাবে দত্তিল ভরতের মত অন্তর গান্ধার ও কাকলী নিষাদের নাম উল্লেখ করেছেন।

ভরত ও মতঙ্গের মধ্যবর্তী সময়ে তুম্বুরু, যাষ্টিক, নন্দিকেশ্বর, দুর্গাশক্তি প্রভৃতি সঙ্গীতগুণীদের আবির্ভাব ঘটেছিল। এঁদের গ্রন্থ না পাওয়ার ফলে আমাদের ধারণা হয় যে মতঙ্গই দেশী রাগের সংগ্রাহক ও প্রবর্তক। মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী' প্রকৃতপক্ষে একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ। মতঙ্গ তাঁর গ্রন্থে তাই বার বার পূর্ববর্তী সঙ্গীতাচার্যদের কথা উল্লেখ করেছেন।

মতঙ্গ নিবন্ধ ও অনিবন্ধ ভেদে গানকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন—"নিবদ্ধশ্চানিবদ্ধশ্চ মার্গোঽয়ং দ্বিবিধো মতঃ।" আলাপ হচ্ছে অনিবন্ধ এবং কথা, রাগ, তাল যুক্ত গান হল নিবন্ধ।

ভরতের মতানুবর্তী হয়ে মতঙ্গ[১] বাইশটি শ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন। যে ধ্বনি কর্ণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাকেই শ্রুতি বলা হয়। শ্রুতির দু-প্রকার ভেদ—স্বরশ্রুতি ও অন্তর শ্রুতি।[২] সঙ্গীতে শ্রুতিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ ২২ শ্রুতির কথা, কেউ ৬৬ শ্রুতির কথা, কেউ বা অনন্ত শ্রুতির কথা বলেছেন।[৩] মতঙ্গ মুনি কোহলের বক্তব্যের টীকা করে বলেছেন—শ্রুতির যে ৬৬ ভেদের কথা বলা হচ্ছে—কেউ মনে করেন মন্দ্র-মধ্য-তার স্থান অর্থাৎ বক্ষ, কণ্ঠ, মস্তক—এই স্থানের প্রত্যেকটি থেকে উৎপন্ন ২২ শ্রুতির সমন্বয়ে ৬৬টি শ্রুতি উৎপন্ন হয়েছে। শ্রুতির অনন্ত রূপের ব্যাখ্যায় বলেছেন—গগন বা আকাশে যে অনন্ত ধ্বনি বিরাজিত তার প্রকৃতি উত্তাল পবন বা বাতাস দ্বারা উদ্বেলিত জলরাশি

১। 'দত্তিলম্' গ্রন্থের মুখবন্ধে আছে—
(প্রণম্য পরমেশানং) ব্রহ্মাদ্যাংশ্চ গুরূংস্তথা।
গান্ধর্বশাস্ত্রসংক্ষেপঃ সারতোঽয়ং ময়োচ্যতে॥

২। শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বাদ্ ধ্বনিরেব শ্রুতির্ভবেৎ।
সা চৈকা দ্বিবিধা জ্ঞেয়া স্বরান্তরবিভাগতঃ॥ মতঙ্গের উদ্ধৃতিতে বিশ্বাবসু

৩। দ্বাবিংশতিং কেচিদুদাহরন্তি শ্রুতীঃ শ্রুতিজ্ঞানবিচারদক্ষাঃ।
ষট্‌ষষ্টিভিন্নাঃ খলু কেচিদাসামানন্ত্যমেব প্রতিপাদয়ন্তি॥
মতঙ্গের উদ্ধৃতিতে কোহল

সমুদ্ভব অনন্ত তরঙ্গমালার ন্যায়।[১] মতঙ্গ স্বর, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, তান, বর্ণ প্রভৃতির বর্ণনা করেছেন। 'বৃহদ্দেশী' প্রধানত অভিজাত (দশলক্ষণযুক্ত) দেশী গানের সংগ্রহ ও পরিচিতি গ্রন্থ। এই গ্রন্থে আমরা নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত শুদ্ধ ও বিকৃত ১৮টি জাতি তথা জাতিরাগের পরিচয় পাই। দেশীগানের আলোচনা প্রসঙ্গে মতঙ্গ যে জাতিরাগের পরিচয় দিয়েছেন তার কারণ তিনি এই কথাই সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে জাতিরাগই প্রাচীন। অর্থাৎ জাতিরাগের ভঙ্গী নির্দিষ্ট নিয়মানুসারী অর্থাৎ অপরিবর্তিত—দেশকালভেদে স্থির—কোনও পার্থক্য সূচিত হয় না। কিন্তু দেশী বা আঞ্চলিক জাতির ক্ষেত্রে অঞ্চল ভেদেও কালঅনুযায়ী রূপপরিবর্তিত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সঙ্গীতে এই দু-প্রকার জাতি প্রচলিত আছে—এক অনড় স্থির নিয়মের নিগড়ে বাঁধা গান্ধর্ব জাতি এবং বিভিন্ন অঞ্চল ও কালভেদে দেশী জাতি।[২]

ভরত প্রমুখ সঙ্গীতশাস্ত্রীরা রাগের উল্লেখ বা পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা কোনও ব্যুৎপত্তিগত অর্থের কথা বলেননি। মতঙ্গ বলেছেন—

যোহসৌ ধ্বনিবিশেষস্তু স্বরবর্ণবিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স চ রাগ উদাহৃতঃ॥

* * *

ইত্যেবং রাগশব্দস্য ব্যুৎপত্তিরভিধীয়তে।
রঞ্জনাজ্জায়তে রাগো ব্যুৎপত্তিঃ সমুদাহৃতা॥

স্বরবর্ণ (এবং ব্যঞ্জনবর্ণ)-যুক্ত যে ধ্বনিতরঙ্গ মানুষের মনে প্রীতি ও আনন্দের সঞ্চার করে তা-ই 'রাগ' নামে পরিচিত। স্বরসমূহের বিশিষ্ট রচনা যা মানুষের চিত্তকে মুগ্ধ করে তাকেই রাগ বলে।

কল্লিনাথ বলেছেন যে, জাতি, গ্রামরাগ এবং ষড়্বিধ রাগ গান্ধর্ব পর্যায়ের অন্তর্গত। প্রাচীনকালে যখন রাগরাগিণীর উদ্ভব হয়নি, তখনকার সঙ্গীতের সংজ্ঞা ও ভেদাভেদ নিরূপিত হত জাতিকরণের দ্বারা। পরবর্তীকালে এই জাতিভেদকে ভিত্তি করেই গ্রাম-রাগের উদ্ভব হয়: ষড়্জ গ্রামের রাগ, মধ্যম গ্রামের রাগ ও গান্ধার গ্রামের রাগ। কালক্রমে এই তিনটি গ্রামের মধ্যে 'গান্ধার' লুপ্ত হয়ে গেল এবং গ্রাম-রাগগুলি রূপান্তরিত হল রাগ-এ। এই রাগগুলিকে প্রাচীন গ্রামের ভিত্তিতে জাতিকরণ পদ্ধতিতে শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে রাগ-রাগিণী পরিবারগুলির মধ্যে গোলযোগ পরিলক্ষিত হতে থাকল। এবং শেষ পর্যন্ত উত্তর ভারতে গৃহীত হল দশ ঠাটের বনিয়াদ। অবশ্য এই দশ ঠাটের বনিয়াদ রচিত হয়েছে দাক্ষিণ ভারতের বাহাত্তর মেল-এর অনুকরণেই।

১। ইত্যাদীঃ ষড়বৈচিত্র্যভেদভিন্নাঃ প্রকৃত কথ্যতে। মন্দ্র-মধ্য-তারেষু উরঃ-কণ্ঠ-শিরসস্ত্রিষু স্থানেষু প্রত্যেকং দ্বাবিংশতি প্রকার তথা বিস্থানেষু প্রত্যেকং হি ষট্‌বৈচিত্র্যভেদভিন্না ভবন্তীতি কেচিদিচ্ছন্তে।

২। সা দেশ কালতুল্যা রীতিঃ ভবেৎ দেশ স্বভাবতঃ।

সঙ্গীত রত্নাকর।

বাল্মীকির রামায়ণে (১।১৮-১০)[1] আমরা শুদ্ধ-সপ্ত জাতিগানের উল্লেখ পাই। কুশীলবের কণ্ঠে এই গান লীলায়িত হত। রামায়ণের যুগে গান্ধর্ব জাতি-রাগ ও গ্রামরাগ গানের প্রচলন ছিল—একথা মনে করা যেতে পারে; কারণ 'বালকাণ্ডে' (চতুর্থ অধ্যায়) সাতটি শুদ্ধ জাতিগান ও 'সুন্দর কাণ্ডে' (প্রথম অধ্যায়) "চরিত কৈশিকাচার্যৈরৈরাবতনিষেবতে" শ্লোকে 'কৈশিক' শব্দটি কৈশিক রাগই প্রমাণ করে—'কৈশিক' রাগ বা গ্রাম রাগ।

'মহাভারত', 'হরিবংশ', 'পুরাণাদি', নারদের 'শিক্ষা' এবং ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে এর উল্লেখ রয়েছে। কৈশিক সম্পর্কে টীকাকার বলেছেন, "কৈশিকং গাননৃত্যবিদ্যা তদাচার্যৈস্তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্বৈশ্চরিতে সেবিতে।" 'শিক্ষা'-র রচয়িতা নারদ বলেছেন কৈশিক গ্রামরাগটি ঋষি কশ্যপের উদ্ভাবিত—"কৈশিকং কশ্যপং প্রাহ।" সাতটি শুদ্ধ জাতি গান বা জাতিরাগ গানের তখন প্রচলন ছিল। বিকৃত জাতি বা জাতিগানের উল্লেখ সর্বপ্রথম আমরা পাই ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'। জাতিরাগ ও গ্রাম রাগগুলি ষড়্জাদি সাতটি লৌকিক স্বর, মূর্ছনা, মন্দ্রাদি তিন স্থান, তাল, লয় ও বিচিত্র রসে গান করা হত।

শুদ্ধ-সপ্ত জাতি হ'ল ষাড়জী, আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী, নৈষাদী (জাতয়ো দ্বিবিধা শুদ্ধা বিকৃতাশ্চ তত্র শুদ্ধা ষড়্জগ্রামে ষাড়্জী আর্ষভী স ধৈবতী নিষাদবতী গান্ধারী মধ্যমা পঞ্চমী মধ্যম গ্রামে)। শুদ্ধজাতি বা জাতিরাগগুলিতে ষড়্জ ও মধ্যম দুটি গ্রামের উল্লেখ করা হয়েছে। গান্ধারী ও রক্তগান্ধারী, গান্ধারোদীচ্যবা, মধ্যমোদীচ্যবা, মধ্যমা, পঞ্চমী, গান্ধারপঞ্চমী, আন্ধ্রী, নন্দয়ন্তী, কর্মারবী বা কার্মারবী ও কৈশিকী—এই এগারোটি বিকৃত জাতি মধ্যম গ্রামে লীলায়িত। সাতটি স্বরের নাম অনুসারে শুদ্ধ জাতি রাগগুলি ও বিকৃত জাতিগুলি উভয় গ্রামেই বিকশিত।[2] ভরত ষড়্জ ও মধ্যম যে স্বীকার করেছেন তার কারণ খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গান্ধার গ্রাম দুটি গ্রাম সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল। ভরত বলেছেন, একটি জাতিরাগ আর একটি বা কয়েকটি জাতিরাগের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েই উপরোক্ত বিকৃত এগারোটি জাতি সৃষ্টি করে।

১। মতঙ্গ কোন যুগের, তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাসের রঘুবংশ প্রভৃতিতে মতঙ্গ মুনির উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা যাঁর কথা আলোচনা করছি সেই সঙ্গীতশাস্ত্রী মতঙ্গ মুনি 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে কোনও এক সময় জীবিত ছিলেন।

২। পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্ ॥
* * *
তৌ তু গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞৌ-স্থানমূর্ছনকোবিদৌ
ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ গান্ধর্বাবিবরূপিণৌ ॥

এখন প্রশ্ন হল, রামায়ণের যুগে রক্তিজনক ও অনুরণনযুক্ত সাতটি স্বর ছিল কিন্তু 'রাগ' ছিল কি না। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' পাঁচবার রাগ শব্দটির উল্লেখ আছে। উপরোক্ত জাতি রাগ শ্রেণীভুক্ত কি না সে-বিষয়ে মতভেদ থাকলেও ওই জাতি যে ভারতীয় আদিম রাগ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বৃহদ্দেশী রচয়িতা মতঙ্গ তাঁর গ্রন্থে ভরতের অনুসরণে বলেছেন, সকল রাগের কারণ বা বীজ জাতিরাগ ("জাতিসম্ভূতত্বাদ্ গ্রামরাগানামি")। দেশী রাগের আলোচনায় মতঙ্গ যে জাতিরাগের পরিচয় দিয়েছেন, তার কারণ হচ্ছে সকলকে একথা মনে করিয়ে দেওয়া যে জাতি রাগই গ্রাম রাগ এবং বিভিন্ন ভাষাদি ও দেশী (ক্লাসিকাল) রাগের কারণ। 'জাতি' বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন মতঙ্গ। তিনি বলেছেন, শ্রুতি, গ্রহ, স্বর (অলংকার বর্ণ) প্রভৃতি উপাদান নিয়ে যে স্বরসম্ভার প্রকাশিত হয় তাকে জাতি বলে, যে স্বরসন্দর্ভের লীলায়িত গতি ও বিকাশ থেকে প্রত্যেকটি স্বরের, প্রত্যেকটি স্বর গঠনের বা রাগরূপের রস প্রতীতি হয় তাকে জাতি বলে; গান্ধর্ব ও দেশীরাগগুলি যে মূল রাগ থেকে গ্রহণ করা হয় তাকে জাতি বলে। সুতরাং রাগের মূর্চ্ছনা, বর্ণ, অলংকার প্রভৃতি সকল অঙ্গের বৈশিষ্ট্যই নির্ভর করে 'জনক' জাতির বৈশিষ্ট্যের উপর। জাতির বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই সে-যুগে রাগের গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, সন্যাস, বিন্যাস, বাদী, সমবাদী, অনুবাদী, বিবাদী প্রভৃতি স্বরের প্রয়োগ নিরূপিত হত।

জাতিগানে যে তালের প্রয়োগ করা হত তাকে বলা হয়েছে মার্গতাল। এই মার্গতালে ক্রিয়া দু'প্রকার—সশব্দ ও নিঃশব্দ নিঃশব্দ ক্রিয়ায় হাতের সংকেত এবং আঙুলের সংকোচন বা প্রসারণ বোঝায়। নিঃশব্দ ক্রিয়া চার প্রকারের—আবাপ, নিষ্ক্রাম, প্রক্ষেপ, প্রবেশক। করতলে আঘাত দ্বারা শব্দ করে সশব্দ তালের প্রকাশ হয়। এই সশব্দক্রিয়াও চার রকম—মার্গ, শম্যা, তাল, সন্নিপাত। মার্গ তালে চারটি মার্গের পরিচয় দেওয়া হয়েছে: ধ্রুব, চিত্র, বার্তিক এবং দক্ষিণ। এই মার্গ চারটি মাত্রা দ্বারা নির্দিষ্ট। ধ্রুব মার্গে একটি মাত্রা, চিত্র দ্বিমাত্রিক, বার্তিক, চারমাত্রিক এবং দক্ষিণ আটমাত্রিক।

পরবর্তী যুগে রাগ-সঙ্গীতের প্রাধান্য স্বীকৃত হলেও এই মার্গগুলিকে আশ্রয় করেই গান করার রীতি ছিল। আরও পরবর্তীকালে দেশী সঙ্গীতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মার্গ অবলম্বনে তালরক্ষা বা মাত্রাবিন্যাস দেখিয়ে দেবার রীতি চলে গেলেও মার্গতালের বনিয়াদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছিল এমন প্রমাণ নেই। ভারতীয় সঙ্গীতের জয়যাত্রার পথে বহু বিবর্তনই লক্ষ্য করি আমরা। এর মধ্যে খ্রিস্টীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দীর সময়কালে ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচিত হয়। এই সময়ের মধ্যে রাগ নাম কল্পনা, রাগরূপ ও রাগ বিকাশের মধ্য দিয়ে রাগের আভিজাত্য সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রবন্ধ সঙ্গীত

গান্ধর্ব গান নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ উভয় রূপেই বিকশিত ছিল। শার্ঙ্গদেব 'সঙ্গীত রত্নাকর'-এ বলেছেন—

অনিবদ্ধং নিবদ্ধঞ্চ দ্বিধা গীতমুদীরিতং।
আলপ্তিবদ্ধহীনঃ সাদ্রাগালাপনরূপিনী ॥

—অর্থাৎ গীত অনিবন্ধ ও নিবন্ধ ভেদে দু'প্রকার। আলপ্তি বা আলাপে রাগের শুধু আলাপ হয়। এটি অর্থযুক্ত কথার দ্বারা আবদ্ধ নয়।
নিরর্থক হুংকার 'সা রে গ ম' বা আতানারি প্রভৃতির দ্বারা যে আলাপচারি হয়, তাকে বলে অনিবন্ধ সঙ্গীত। এই গান তালেরও অপেক্ষা রাখে না, তবে অক্ষর, ছন্দ ও যতি থাকে। অনিবন্ধ গীতের অপর নাম 'আলাপ'।
শার্ঙ্গদেব এ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট করে বলেছেন—

"বন্ধং ধাতুভিরঙ্গৈশ্চ নিবন্ধমভিধীয়তে।
আলপ্তিবন্ধহীন ত্বদনিবন্ধমিতীরিতা ॥"—সঙ্গীত রত্নাকর

চারটি ধাতু (উদ্গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, আভোগ) এবং ছটি অঙ্গ (স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট, তাল) যুক্ত হলে নিবন্ধ এবং বন্ধনহীন অর্থাৎ তালাদি বর্জিত আলপ্তির নাম অনিবন্ধ। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত রত্নাকরে নিবন্ধ গানকে প্রবন্ধ বস্তু ও রূপক বলেছেন—"সংজ্ঞাত্রয়ং নিবন্ধস্য প্রবন্ধো বস্তুরূপকম্।"

কালক্রমে শুদ্ধ সপ্ত জাতি বা জাতিরাগ গান প্রবন্ধ জাতীয় ছিল। পরবর্তীকালে 'ধাতু' শব্দের দ্বারা প্রবন্ধ গানের অংশ বা অবয়ব বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ধাতু শব্দের একটি অর্থ 'গেয়'। শার্ঙ্গদেব বলেছেন, "পূর্বং ধাতুশব্দেন গেয়মুক্তং।" এখানে 'পূর্বং' বলতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগের কথাই বলা হয়েছে এবং তখন গেয় শব্দের অর্থ ছিল প্রবন্ধানুগতধর্ম—"গেয়ং নাম সকল প্রবন্ধানুগত ধর্ম্মঃ।" এ থেকেই নিবদ্ধ প্রবন্ধ গানের প্রাচীনত্ব সূচিত হয়। খ্রিস্টীয় শতাব্দীর প্রথম দশকের পর থেকে প্রবন্ধ গানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে এই গানের কথা বলেছেন। মতঙ্গ, পার্শ্বদেব, শার্ঙ্গদেব তাঁদের রচিত গ্রন্থে এই প্রবন্ধ সঙ্গীতের পরিচয় দিয়েছেন।

'সঙ্গীত সার' গ্রন্থে এই প্রবন্ধ সঙ্গীতকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে:
শুদ্ধ, সালগ ও সংকীর্ণ। 'সঙ্গীত রত্নাকর' অনুসারে এই বিভাগ তিনটির নাম—প্রবন্ধ, বস্তু এবং রূপক।

শুদ্ধ সঙ্গীতের নাম প্রবন্ধ—"প্রকৃষ্টো যস্য বন্ধঃ স্যাৎ স প্রবন্ধো নিগদ্যতে।"
অর্থঃ প্রকৃষ্টরূপে যে গানের বন্ধন আছে তাকেই প্রবন্ধ সঙ্গীত বলা হয়। এই গান ধাতু ও অঙ্গ দ্বারা আবদ্ধ। তাই 'প্রবন্ধ' গান বলতে রীতি ও নিয়মে আবদ্ধ ক্লাসিক্যাল গান (গীতি) বোঝায়।

প্রবন্ধের ধাতু

প্রবন্ধ সঙ্গীতের চারটি ধাতু ও ছয়টি অঙ্গ। 'ধাতু' বলতে গানের অবয়ব বা ভাগ বোঝায়। যেমন উদ্গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, আভোগ।

১। উদ্গ্রাহ—গানের প্রথম অংশ বা কলি। গ্রন্থের যেমন মঙ্গলাচরণ, তেমনি উদ্গ্রাহ হচ্ছে গানের ভূমিকা অংশ।

২। মেলাপক—মেলাপক হচ্ছে উদ্গ্রাহ ও ধ্রুবের মেলকারকের মধ্যে অবস্থানকারী অংশবিশেষ। উদ্গ্রাহের পরেই এই অংশ থাকে। প্রথম অংশ উদ্গ্রাহ এবং তৃতীয় অংশ ধ্রুব—মাঝখানে থেকে এই দুই অংশের মিলন ঘটায় বলে এই দ্বিতীয় অংশের নাম হয়েছে মেলাপক।

৩। ধ্রুব—মেলাপকের পরের অংশ ধ্রুব বা ধ্রু-কলি। এই অংশ মধ্যভাগে অবস্থিত। এই অংশের পরিচয় দিতে গিয়ে শার্ঙ্গদেব বলেছেন, "ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবঃ।" আবার টীকাকার কল্লিনাথ ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে নিত্যত্বহেতুই এই অংশের নাম ধ্রুব। প্রবন্ধে এই অংশ কখনও বর্জিত হবে না।

৪। আভোগ—প্রবন্ধের শেষ অবয়বের নাম আভোগ। এই অংশে কবি ও নায়কের নাম থাকে। এই অংশে গান পরিপূর্ণতা অর্থাৎ ভাবের শাখা-পত্র-পল্লব বিস্তার বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করে।

৫। অন্তরা—ধ্রুব ও আভোগের মধ্যে আর একটি ধাতু রয়েছে। এই অংশটি হরিনায়কের মতে "অন্তরা"। এই 'অন্তরা' অংশটি সব রকম প্রবন্ধে দেখা যায় না—সালগসূড় প্রবন্ধে এই অংশের সন্ধান পাওয়া যায়। কল্লিনাথ বলেছেন—

অন্যদন্তরো লৌকিকরূপান্তর ইত্যুচ্যতে।" অর্থাৎ এই অন্তরা লৌকিক রূপান্তর মাত্র। এটা ধীরে ধীরে ধ্রুব-এর স্থান অধিকার করেছে।

প্রবন্ধের অঙ্গ

প্রবন্ধ সঙ্গীতের অঙ্গ ছয়টি : স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাট এবং তাল। 'তেনক' শব্দটি মঙ্গলবাচক। মহাকাব্যের আদিতে যেমন ওঁ তৎ সৎ উচ্চারিত হয়, তেনক অঙ্গে এই ধরনের বাক্য থাকে। তেনক অঙ্গটিকে নেত্রের সঙ্গে এবং পাট, বিরুদকে হস্তদ্বয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এর মধ্যে পাট হচ্ছে বোল (বাদ্যাক্ষর) আর বিরুদ গুণবাচক অংশ। এই অংশ পদের শেষে থাকে। স্বর বলতে ষড়্জাদি স্বর যা—সা, রে, গ, ম প্রভৃতি অক্ষরে প্রকাশ করা হয়। পদ বলতে সমগ্র গানটিকেই বোঝায়। শার্ঙ্গদেব বিরুদ অংশটি ছাড়া গানের অবশিষ্ট অংশকে পদ বলেছেন।

(১) স্বর—স্বর বলতে ষড়্জাদি স্বর যা—সা, রে, গ, ম প্রভৃতি অক্ষরে প্রকাশ করা হয়।

(২) বিরুদ—"গদ্য পদময়ী রাজস্তুতিঃ বিরুদমুচ্যতে" অর্থাৎ স্তুতিমূলক ছন্দ পদকে বিরুদ বলে। শার্ঙ্গদেব, রাজা রঘুনাথ নায়ক প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞরা বলেছেন 'বিরুদ' অর্থে বিরোধ বোঝায়। মহারাষ্ট্রে 'বিরুদ' অর্থ শক্তি শৌর্য। প্রবন্ধগীতির অঙ্গ হিসাবে বিরুদ অর্থে আত্মপ্রকাশের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও স্বাধীনতা বোঝায়। সঙ্গীতের যে অংশে এটি থাকে সেই অংশকে সূচিত করে।

(৩) পদ—যে বিষয় নিয়ে গীত-বস্তু রচিত তাকেই পদ বলে।

(৪) তেনক—মঙ্গলবাচক শব্দ। যেমন তেন, না, তে ইত্যাদি।

(৫) পাট—মৃদঙ্গাদি বাদ্যের অনুকরণে যে বোল বলা হয়।

(৬) তাল—ছন্দ রাখার নিয়মিত আঘাত।

প্রবন্ধ সঙ্গীতের জাতি

মেদিনী, আনন্দিনী, দীপনী, ভাবনী, তারাবলী—প্রবন্ধ সঙ্গীতের এই পাঁচটি জাতি।

> প্রবন্ধ জাতয়ঃ পঞ্চ বর্তন্তে তাঃ ক্রমেণ চ।
> ষড়্ভির্বঙ্গৈর্মেদিনী স্যাদানন্দিনী পঞ্চভির্ভবেৎ॥
> চতুর্ভির্দীপনী প্রোক্তা ত্রিভির্বঙ্গৈস্তু ভাবনী
> বাভ্যাং তারাবলী জাতিরঙ্গাভ্যামুপজায়তে॥—সঙ্গীত পারিজাত

এই শ্লোক থেকে বিভিন্ন জাতীয় প্রবন্ধের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা এ-রকম :

ছয়টি অঙ্গযুক্ত প্রবন্ধ "মেদিনী" জাতীয়
পাঁচটি ,, ,, "আনন্দিনী" ,,

চারটি অসংযুক্ত প্রবন্ধ "দীপনী" জাতীয়
তিনটি " " "ভাবনী" বা পাবনী জাতীয়
দুইটি " " "তারাবলী" "
প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধগীতের জাতি বা প্রকারভেদ অসংখ্য : "ভেদঃ শুদ্ধ প্রবন্ধনামানন্ত্যাদেষ এব হি"

প্রবন্ধের প্রকারভেদ

প্রাচীনকালে বহুপ্রকারের প্রবন্ধগীতি প্রচলিত ছিল। সেগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—সুড়, আলি বা আলিসংশ্রয় এবং বিপ্রকীর্ণ। ধ্রুব প্রবন্ধগীতি সুড় অর্থাৎ সালগসুড় প্রবন্ধের অন্তর্গত : "ধ্রুবাদি সালগ মত" (সঙ্গীতরত্নাকর ৪।৩১১)। শার্ঙ্গদেব সুড় প্রবন্ধকে দু-ভাগে করেছেন—শুদ্ধ এবং মিশ্র (শুদ্ধ এবং সালগ অথবা ছায়ালগ)।
শুদ্ধসুড় প্রবন্ধ বলতে জাতি অথবা জাতিরাগ ; ব্রহ্মগীতি, যেমন কপাল এবং কম্বল ; এর সঙ্গে গ্রামরাগ, উপরাগ, ভাষারাগ, বিভাষারাগ ও অন্তর ভাষারাগ এবং প্রকরণগীতি, যেমন মদ্রক, অপরান্ত, উল্লোপ্য, প্রকরী, ওবেনক, রবিন্দক এবং উত্তর ; এর সঙ্গে গীতি যেমন ছন্দক, আসারিত, বর্ধমানক, পাণিকা, ঋক্‌, গাথা এবং সাম। শার্ঙ্গদেব বলেছেন : "জাত্যাদিন্তর-ভাষান্তম্‌ শুদ্ধম্‌ প্রকরণমভিহিতম্‌।" টীকাকার সিংহভূপাল বলেছেন, "শ্রুতি প্রকরণমারভ্য-অন্তরভাষা-পর্যন্তম্‌।" রাজা রঘুনাথ নায়ক একইভাবে সালগ-সুড় ধ্রুব বর্ণনা করেছেন ('সঙ্গীত সুধা', পৃঃ ৮০৮-৮০৯)।
সুতরাং এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে গান্ধর্ব অথবা মার্গগীতি প্রবন্ধ বলে পরিচিত ছিল। একথা দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভরত এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেব সমর্থন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে নাট্যগীতি, ধ্রুবা সম্পর্কে ভরত যা বলেছেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে।

যা ঋক পাণিকা গাথা সপ্ত-রূপংগমেব চ।
সপ্ত-রূপ-প্রমাণাম্‌ হি সা ধ্রুবেত্যভিসঙ্গীতা ॥

—নাট্যশাস্ত্র, ৩২।২

শার্ঙ্গদেব 'সঙ্গীত রত্নাকর'-এ "এলাদি শুদ্ধ" প্রভৃতির কথা বলেছেন। দেখা যাচ্ছে যে ভরত এবং শার্ঙ্গদেব প্রবন্ধগীতি হিসাবেই গান্ধর্ব এবং ব্রহ্মগীতির ব্যাখ্যা করেছেন। ভরত ধ্রুবাকে দু-শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—নিবদ্ধ এবং অনিবদ্ধ। সিংহভূপাল এলা এবং অন্যপ্রকার প্রবন্ধের প্রসঙ্গে এগুলির কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "ননু ভরতেন এলাদিনাম ছায়ালগত্বং উক্তম তৎ কথম শুদ্ধত্বম্‌ উচ্যতে, তত্রাহ-ছায়ালগত্বমিতি।" এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে ক্ল্যাসিকাল গীতি শ্রেণীর প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। চৌবট্টি প্রকার ধ্রুবার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে ধ্রুবা বিভিন্ন বর্ণে (সম-দুখাক্ষর-কৃত), ধাতুতে, অঙ্গে যেমন স্বর, বিরুদ, তেনক, পদ, পাট ও

তাল প্রভৃতি সহযোগে রচিত হত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ধ্রুবা গান্ধর্ব শ্রেণীর প্রবন্ধগীতি হিসাবে পরিচিত ছিল। পূর্বে বলা হয়েছে যে ভরত কপাল, কম্বল প্রভৃতি ব্রহ্মগীতির আলোচনা করেছেন। কল্লিনাথ শার্ঙ্গদেবের অনুসরণে বলেছেন, "জাতি-কপাল-কম্বল গ্রামরাগোপরাগ-ভাষা-বিভাষান্তরভাষা-পর্যন্ত মিত্যর্থ।" এর অর্থ—জাতিরাগ এবং কপাল ও কম্বল-গীতি প্রভৃতি শুদ্ধ সূড় প্রবন্ধগীতি রূপে পরিচিত ছিল। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শুদ্ধ শ্রেণীর ধ্রুব প্রবন্ধ ভরতের পূর্বে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর আগে প্রচলিত ছিল।

পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রীদের মধ্যে দাত্তিল তাঁর রচিত পুস্তক 'দত্তিলম্'-এ মদ্রক, অপ্রান্তক, উলপ্যক প্রভৃতি প্রকরণের বর্ণনা দিয়েছেন। আগেই বলা হয়েছে যে শার্ঙ্গদেব মদ্রক, অপ্রান্তক প্রভৃতি শুদ্ধ-সালগ-সূড় প্রবন্ধ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও দাত্তিল নির্দিষ্টভাবে ধ্রুব প্রবন্ধের উল্লেখ করেননি তবুও এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তিনি শুদ্ধ-সূড়-প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এটা খুবই প্রত্যাশিত যে তাঁর মনে ধ্রুব শ্রেণীর সালগ-সূড়-প্রবন্ধের কথা ছিল।

মতঙ্গ-র বৃহদ্দেশীতে (পঞ্চম-সপ্তম খ্রিস্টাব্দ) প্রবন্ধগীতির বর্ণনা আছে। মতঙ্গ প্রবন্ধকে বলেছেন 'দেশী' অর্থাৎ আঞ্চলিক ক্লাসিকাল গীতি। তিনি বিভিন্ন প্রকারের প্রবন্ধের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন—ঢেঙ্কি, এলা, দণ্ডক, দ্বিপদী, চতুরঙ্গ, স্বরম্বতিল প্রভৃতি। বৃহদ্দেশীর ত্রিবান্দ্রম্ সংস্করণকে কেউ কেউ দাত্তিলমের মতই অসম্পূর্ণ বলেছেন। সুতরাং এই বইতে ধ্রুব প্রবন্ধের সঠিক উদাহরণ পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু তিনি বৃহদ্দেশীতে শুদ্ধ-সূড়-শ্রেণীর প্রবন্ধের বর্ণনা করেছেন সেই হেতু তিনি সালক-সূড়-এর অন্তর্গত ধ্রুব প্রবন্ধের আলোচনাও করে থাকবেন। কিন্তু পার্শ্বদেব স্পষ্ট করেই শুদ্ধ এবং সালগসূড় প্রবন্ধ (ধ্রুব অথবা ধ্রুবপদ সহ) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাঁর 'সঙ্গীত সময় সার' গ্রন্থে (৭ম-৯ম অথবা ৭ম-১১শ শতাব্দী)। তিনি বলেছেন "সাল-সূড়-ক্রমং ব্যক্তে—আদৌ ধ্রুব ততো মট্ঠো" ইত্যাদি। এখানে "সাল-সূড়" অর্থে সালগ ও সূড় বোঝানো হয়েছে; ধ্রুব অর্থ ধ্রুবপদ এবং মট্ঠো অর্থ মণ্ঠ।

পার্শ্বদেবের পরে শার্ঙ্গদেব বিস্তৃতভাবে তাঁর 'সঙ্গীতরত্নাকর' গ্রন্থে প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথমে তিনটি প্রধান শ্রেণী এবং তার অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার প্রবন্ধের আলোচনা করে শার্ঙ্গদেব সালগ প্রবন্ধের আলোচনা করেছেন।

বিভিন্ন প্রকার প্রবন্ধ

প্রবন্ধের প্রধান বিভাগ তিনটি—(১) সূড়, (২) আলি বা আলি সংশ্রয়, (৩) বিপ্রকীর্ণ। শুদ্ধসূড় আট প্রকার—এলা, করণ, ঢেঙ্কি, বর্তনী, ঝোম্বড়া,

লয়, রাসক এবং একতালী। এই আটটি শুদ্ধসূড়কে সিংহভূপাল 'মার্গসূড়' বলে অভিহিত করেছেন।

আলি জাতীয় প্রবন্ধ চব্বিশ প্রকার—বর্ণ, বর্ণস্বর, গদ্য, কৈবাড়, অংকচারিণী, কাক, তুরগলীল, গজলীল, দ্বিপদী, চক্রবাল, ক্রৌঞ্চপদ, স্বরার্থ, ধ্বনিকুট্টনী, আর্যা, গাথা, দ্বিপথক, কলহংস, তোটক, ঘট, বৃত্ত, মাতৃকা, রাগকদম্বক, পঞ্চতালেশ্বর, তালার্ণব। এই প্রবন্ধগুলি আবার সূড়ক্রমের মধ্যে মিশেও থাকতে পারে। আটটি সূড় জাতীয় প্রবন্ধ এবং চব্বিশটি আলিজাতীয় প্রবন্ধ মিলে মোট প্রবন্ধ সংখ্যা হল বত্রিশ।

সূড় এবং আলিজাতীয় প্রবন্ধ ছাড়া অন্য যে সব গান ছড়িয়ে রয়েছে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে বিপ্রকীর্ণ। এই ছড়ানো গানগুলি থেকে ছত্রিশটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন শার্ঙ্গদেব। এই প্রবন্ধগুলি হল—শ্রীরঙ্গ, শ্রীবিলাস, পঞ্চভঙ্গী, পঞ্চানন, উমাতিলক, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, ষট্পদী, বস্তু, বিজয়, ত্রিপদ, চতুর্মুখ, সিংহলীল, হংসলীল, দণ্ডক, কপট, কন্দুক, ত্রিভঙ্গী, হরবিলাস, সুদর্শন, স্বরাংক, শ্রীবর্ধনী, হর্ষবর্ধন, বদন, চচ্চরী, চর্যা, পদ্ধড়ী, রাহড়ী, বীরশ্রী, মঙ্গলাচার, ধবল, মঙ্গল, ওবী, লোলী, ঢোল্লরী, দন্তী।

বিভিন্ন প্রকারের শুদ্ধ সূড় প্রবন্ধ

শুদ্ধ সূড়ের অন্তর্গত প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধের নাম 'এলা'। এই গীতরূপের উদ্‌গ্রাহ অংশটির তিনটি ভাগ—খণ্ডদ্বয়, প্রয়োগ ও পল্লব। শার্ঙ্গদেব প্রথম অংশটিকে অঙ্ঘ্রি বলেছেন। অঙ্ঘ্রি বলতে চরণ, দুচরণ অথবা চতুর্থাংশ বোঝায়। এই দুটি খণ্ডের পদ অর্থাৎ বাক্যাংশ এক না হলেও গাইবার পদ্ধতি একই রকম। এই এক পদ্ধতিতে গাওয়ার নাম 'এক ধাতু'। গাইবার ধরনে ভিন্নতা থাকলে তাকে বলা হয় ভিন্ন ধাতু। খণ্ড দুটি অনুপ্রাসযুক্ত অর্থাৎ পদান্তে মিল বর্তমান।

খণ্ড দুটির পরবর্তী ভাগ হল প্রয়োগ। গানের মধ্যে স্বল্প আলাপযুক্ত অংশের নাম প্রয়োগ। প্রয়োগ গমকযুক্ত আলাপের মত সুরের কাজ। কিন্তু প্রয়োগে আলপ্তির মত ব্যাপকতার অভাব।

প্রয়োগের পর তৃতীয় ভাগ হল পল্লব। পল্লবের তিনটি পদ আছে—প্রথম দুটি বিলম্বিত এবং তৃতীয়টি দ্রুত।

এই তিনটি ভাগ মিলিয়ে একটি পাদ। সম্পূর্ণ পাদটি উদ্‌গ্রাহের অন্তর্ভুক্ত। উদ্‌গ্রাহ গাওয়া হয় তিন বার। তৃতীয়বার গাইবার সময় প্রয়োগে সম্বোধন পদযুক্ত হয় এবং শুধু প্রয়োগটুকু গাওয়া হয়; পল্লবের অনুষ্ঠান হয় না। শার্ঙ্গদেবের লেখা থেকে জানা যায় যে সোমেশ্বর প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞগণ এই তৃতীয় পদের প্রয়োগটিকেই মেলাপক বলে স্থির করেছেন। শেষের প্রয়োগটি আগের দুবার গাওয়া প্রয়োগের মত হবে না—এটি হবে ভিন্নধাতুক।

এর পরে ধ্রুব অংশে ইষ্টদেবতা, রাজা বা নায়কের নামাঙ্কিত তিনটি পদ

গাওয়া হয়। এই পদগুলি গাওয়া হয় মধ্যবিলম্বিত লয়ে। এই তিনটি ধাতুর প্রথম দুটি একধাতুক অর্থাৎ সমান ভাবে গাওয়া হয় এবং তৃতীয়টি ভিন্নধাতুক অর্থাৎ বিলম্বিতভাবে গাওয়া হয়। এরূপ ধ্রুব গাওয়ার পর আভোগের অনুষ্ঠান হয়। এই আভোগ অংশে বাগ্গেয়কার তাঁর নিজের নামটি জুড়ে দেন। আভোগ গাওয়ার পর ধ্রুবাংশটি আর একবার গেয়ে গান শেষ করতে হয়।

বিলম্ব অর্থাৎ অতীত বা অনাগত-এ এলাজাতীয় গানের আরম্ভ (গ্রহ) হয়। মণ্ঠ, প্রতিতাল, দ্বিতীয়, কঙ্কাল তালে এই গান গাওয়ার রীতি। এই গানে ত্যাগ, সৌভাগ্য, শৌর্য, ধৈর্য প্রভৃতির বর্ণনা পাওয়া যায়।

শার্ঙ্গদেব এলার উদ্গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব এবং আভোগের পদের নাম উল্লেখ করেছেন। ষোলটি পদ নিয়ে এলাটি সম্পূর্ণ হয়। শার্ঙ্গদেব এই ষোলটি পদের ষোলটি অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উল্লেখ করেছেন—পদ্মালয়া, পদ্মিনী, রঞ্জনী, সুমুখী, শচী, বরেণ্যা, বায়ুবেগা, নন্দিনী, মোহিনী, জায়া, গৌরী, ব্রাহ্মী, মাতঙ্গী, চণ্ডিকা, চামুণ্ডা। এই পদগুলির দশটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে—সমান, মধুর, সান্দ্র, কান্ত, দীপ্ত, সমাহিত, অগ্রাম্য, সুকুমার, প্রসন্ন এবং ওজস্বী।

দ্বিতীয় প্রকার শুদ্ধসূড় প্রবন্ধের নাম 'করণ'। স্বকরণ, পাটকরণ, বন্ধকরণ, পদকরণ, তেনকরণ, বিরুদকরণ, চিত্রকরণ ও মিশ্রকরণ—এই আটপ্রকার করণ প্রবন্ধ বর্তমান।

স্বকরণে উদ্গ্রাহ এবং ধ্রুব এই ধাতু দুটি স্বর দ্বারা বদ্ধ। আভোগ বাক্যাংশ দিয়ে তৈরি। এই অংশে বাগ্গেয়কারের বা নায়কের নাম থাকে। গান আরম্ভ করা হয় ইষ্ট বা অভিলষিত স্বরে এবং শেষ করা হয় অংশ স্বরে। তাল—রাস; লয়—দ্রুত।

স্বরগানের প্রভেদ ছাড়া আকৃতির দিক থেকে অন্য করণগুলি স্বরকরণের অনুরূপ।

প্রকারভেদে করণগুলি তিন রকমের হয়—মঙ্গলারম্ভ, আনন্দবর্ধন এবং কীর্তিলহরী।

মঙ্গলারম্ভ করণে আগে উদ্গ্রাহ অংশটি গাওয়া হয় দুবার। এর পর ধ্রুব একবার গাওয়া হয় এবং শেষে আবার একবার আভোগ, ধ্রুব এবং উদ্গ্রাহ গাওয়া হয়।

কীর্তিলহরী করণে ধ্রুব অর্ধেক গাওয়ার পর উদ্গ্রাহের দ্বিতীয়ার্ধ গাওয়া হয় এবং অন্যান্য বিষয় আনন্দবর্ধনের অনুরূপ।

করণে মেলাপক পাওয়া যায় না। এটি ত্রিধাতুক। মোট সাতাশ প্রকার করণ প্রবন্ধ আছে।

ঢেঙ্কী প্রবন্ধে প্রথমে উদ্গ্রাহের পূর্বভাগ দুবার গাওয়া হয় এবং তারপর একবার গাওয়া হয় উত্তরার্ধ। এরপর মেলাপক গাওয়া যেতেও পারে আবার নাও যেতে পারে। এই মেলাপকটি গমকযুক্ত আলাপের মত। উদ্গ্রাহ এবং

মেলাপক—এই দুটি অঙ্গই তাল ছাড়া গাওয়া যেতে পারে। যদি তালে গাওয়া হয় তবে বিলম্বিত ঢেঙ্কি বা কংকাল তাল ব্যবহার করা হয়। তারপর অন্য তালে এবং অন্য লয়ে গাওয়া হয় ধ্রুব এবং আভোগ। ধ্রুব অংশ তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। ধ্রুব গাওয়া হয় দুবার। এর পর আভোগ গাওয়া হয় এবং আর একবার ধ্রুবের অনুষ্ঠানের পর গান শেষ হয়।

ঢেঙ্কি প্রবন্ধ চার প্রকার—(১) মুক্তাবলী, (২) বৃত্তবন্দিনী, (৩) যুগ্মিনী, (৪) বৃত্তমালা। ছন্দহীন গানের নাম মুক্তাবলী। যে গানে ছন্দ অবলম্বন করা হয় তার নাম বৃত্তবন্দিনী। যুগ্মিনী প্রবন্ধে দুটি বৃত্ত বা ছন্দ থাকে। বহু বৃত্ত বা ছন্দসম্পন্ন প্রবন্ধের নাম বৃত্তমালা।

বর্তনী নামক শুদ্ধসূড় প্রবন্ধের লক্ষণ পূর্ববর্ণিত স্বকরণের অনুরূপ। তবে এই গানে রাস তাল এবং দ্রুত লয়ের পরিবর্তে অন্য কোনও বিলম্বিত তাল ব্যবহার করা হয়। দুবার উদ্‌গ্রাহ অংশটি গেয়ে ধ্রুব এবং আভোগ একবার গাওয়া হয়। পরে আর একবার ধ্রুব অংশটি গেয়ে গান শেষ করা হয়। কংকাল, প্রতিতাল, কুড়ুক্ক, দ্রুতমণ্ঠক—এই চারটি তালের কোনও একটিতে যদি বর্তনী প্রবন্ধ গাওয়া হয় তবে সেটির নাম হয় বিবর্তনী প্রবন্ধ।

ঝোম্বড়া প্রবন্ধে উদ্‌গ্রাহের প্রথমার্ধটি দুবার এবং উত্তরার্ধটি একবার গেয়ে গমকযুক্ত মেলাপক গাওয়া হয়। তবে এটি যে গাইতেই হবে এমন কোনও নিয়ম নেই। এরপর ধ্রুব অংশটি দুবার গেয়ে একবার আভোগ অনুষ্ঠানের পর গান শেষ হয়।

ঝোম্বড়া প্রবন্ধে দশটি তালের ব্যবহার দেখা যায়। কল্লিনাথের মতে এই দশটির যে কোন একটি তালে গাওয়া নিয়ম। দশটি তাল হল—নিঃসারুক, কুড়ুক্ক, ত্রিপুট, প্রতিমণ্ঠ, দ্বিতীয়, গারুগী, রাস যতি, লগ্ন, অড্ড এবং একতালী।

ঝোম্বড়া প্রবন্ধ দু-প্রকার—তারজ এবং অতারজ। গদ্যজ, পদ্যজ এবং গদ্যপদ্যজ—এই তিন শ্রেণীর ঝোম্বড়া প্রবন্ধ হওয়াতে এটি অভিনয়ের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হত। ঝোম্বড়া প্রবন্ধের মোট সংখ্যা ৩৫১০।

লম্ভক প্রবন্ধে সমস্ত উদ্‌গ্রাহটি একখণ্ডে অথবা দুটি খণ্ডে ভাগ করে গাওয়া যেতে পারে। ধ্রুব এবং আভোগও একটি অথবা দুটি খণ্ডে বিভক্ত করে গাওয়া যেতে পারে। দুটি খণ্ডে বিভক্ত ধ্রুব ঝোম্বড়ার মত প্রথমার্ধ এবং উত্তরার্ধ এই দু-ভাগে বিভক্ত হয়। এর পর আভোগ গেয়ে আবার ধ্রুবের অনুষ্ঠান করে লম্ভক প্রবন্ধ সমাপ্ত করা হয়। ছয় প্রকার লম্ভক প্রবন্ধ বর্তমান—প্রলম্ভ, ভাগলম্ভ, লম্ভপদ, অনুলম্ভ, উপলম্ভ, বিলম্ভ।

রাসক প্রবন্ধের লক্ষণ ঝোম্বড়া প্রবন্ধের মতই, কিন্তু এটি গমকস্থানবর্জিত। ঝোম্বড়া প্রবন্ধের মেলাপক অংশটি গমকযুক্ত। সুতরাং গমকস্থানবর্জিত অর্থে এ কথাই অনুমান করা যেতে পারে যে রাসক প্রবন্ধ মেলাপক বর্জিত। কল্লিনাথও একথা সমর্থন করেছেন। রাসক প্রবন্ধ রাসতালে গাওয়া হত।

কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে রাসক প্রবন্ধ গণ, বর্ণ এবং মাত্রা ভেদে তিন প্রকারে নিবন্ধ হতে পারে।
শুদ্ধ সূড় প্রবন্ধের শেষ প্রবন্ধ একতালিকা। এই প্রবন্ধে উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব গাওয়া হয় দুবার। আভোগ অংশটিও দুবার গাওয়ার পর আবার ধ্রুব অংশটি গেয়ে গান শেষ করার নিয়ম। কেউ কেউ মনে করেন যে, এই প্রবন্ধের উদ্‌গ্রাহ অংশটি শুধুমাত্র আলাপ এবং তা যদি না হত তবে উদ্‌গ্রাহে পদের অস্তিত্ব থাকত। এটি তারাবলীজাতীয় এবং পদতালবন্ধ মেলাপকবর্জিত প্রবন্ধ।

আলিজাতীয় প্রবন্ধের প্রকারভেদ

প্রথমে আলোচ্য 'বর্ণ' প্রবন্ধ। বেশিরভাগ বর্ণ প্রবন্ধই বর্ণাঢ্য ভাষায় লেখা। এই প্রবন্ধে বর্ণতালের প্রয়োগ হত। বর্ণ প্রবন্ধে কলির উল্লেখ নেই। তবে সব প্রবন্ধেই যখন এগুলির অস্তিত্ব তাকে তখন ঠিক ওইভাবে বর্ণ প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও পদগুলিকে কলি অনুসারে সাজিয়ে নেওয়া হত। কল্লিনাথ বলেছেন যে এই প্রবন্ধটি ত্রিধাতুক এবং বিরুদ-পদ তালবদ্ধ হওয়াতে বর্ণপ্রবন্ধ ভাবনী জাতীয়।
বর্ণপ্রবন্ধের পর গদ্য প্রবন্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। ছন্দ নেই এরূপ পদ-সমষ্টিকে গদ্য বলা হয়। গদ্য প্রবন্ধে এলোমেলো গদ্য ব্যবহৃত হয় না। এই গদ্যের একটি সুসম্বদ্ধ রূপ থাকা প্রয়োজন। ছন্দশাস্ত্রেও গদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। গদ্যপ্রবন্ধ ছ প্রকার—উৎকলিতা, চূর্ণ, ললিত, বৃত্তগন্ধি, খণ্ড এবং চিং। শার্ঙ্গদেবের মতে গদ্যগুলি সৃষ্টি হয়েছে সামবেদ থেকে।
গদ্য প্রবন্ধের প্রাথমিক অনুষ্ঠানে তাল ব্যবহৃত হয় না। আদিতে গমক, বর্ণ এবং স্বর সহকারে প্রণব বা ওঙ্কার বন্দনা করা হয়। বর্ণ অর্থে স্থায়ী প্রভৃতি বর্ণের প্রয়োগ বুঝিয়েছেন কল্লিনাথ। কিন্তু সিংহভূপালের মতে বর্ণ হল পদ এবং অর্থের সংযোগ। এই বাক্যাংশের মাঝে মাঝে বা শেষে স্বর অর্থাৎ সরগমের ব্যবহার দেখা যায়। তালবর্জিত অনুষ্ঠানের পর সতাল অনুষ্ঠানের নির্দেশ পাওয়া যায়। পরের দুটি পদ তাল সহযোগে গাওয়া হয়ে থাকে। কল্লিনাথের মতে প্রথম এবং দ্বিতীয় এই দুটি পদই তালের পার্থক্য না ঘটিয়ে দুবার করে গাওয়া উচিত। এই দুটি পদের নাম প্রবন্ধাংক। এর পর একবার বিলম্বিত লয়ে প্রয়োগের (অর্থাৎ অক্ষরবর্জিত গমকালপ্তি) আচরণ হবে। প্রয়োগের অনুষ্ঠানের পর আবার সতাল অনুষ্ঠান হবে। এই অংশে বাগ্‌গেয়কার এবং নায়কের নাম থাকবে। সতাল অনুষ্ঠানের সময়ে লয়ের পরিবর্তন দেখা যায়। কল্লিনাথের মতে এই গদ্য প্রবন্ধের তালবর্জিত ভাগটি উদ্‌গ্রাহ। পরবর্তী তালবদ্ধ পদদ্বয় ধ্রুবা হিসাবে গণ্য করা হয়। এর পরের প্রয়োগ এবং সতাল অনুষ্ঠানকে আভোগরূপে কল্পনা করে নেওয়া হয়। গদ্যপ্রবন্ধ ত্রিধাতুক এবং যেহেতু এই প্রবন্ধের পদ-সুর তালবদ্ধ সেই হেতু এটি ভাবনীজাতীয় প্রবন্ধ।

গদ্যপ্রবন্ধের পর কৈবাড় নামক প্রবন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়; এই প্রবন্ধে পাটাক্ষর দ্বারা উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুবের আচরণ করা হয় এবং শেষ করার সময়ে উদ্‌গ্রাহ অংশটি আবার গাওয়া হয়। কৈবাড় প্রবন্ধ দু-প্রকার—সার্থক এবং নিরর্থক।

পর পাওয়া যাচ্ছে অংকচারিণী প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে বীর এবং রৌদ্র রস পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধ শুধুমাত্র বিরুদ দ্বারা বদ্ধ। অংকচারিণী প্রবন্ধের আভোগে নায়কের নাম থাকে। কল্লিনাথ এখানে বীর বলতে দানবীর, দয়াবীর, যুদ্ধবীর বুঝিয়েছেন। সিংহভূপাল বিরুদ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন—"গুণো নাম ভুজবলভীমাদি বিরুদশব্দেনোচ্যতে।" বীররসের সঙ্গেই বিরুদ অঙ্গটির প্রাধান্য দেখা যায়। এই প্রবন্ধ ছ-প্রকার—বাসবী, কলিকা, বৃত্তা, বীরবতী, বেদোত্তরা এবং জাতিমতি।

এরপর কর্ণাটদেশীয় ভাষায় প্রচলিত কন্দ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ পাট এবং বিরুদ দ্বারা আবদ্ধ। শার্ঙ্গদেবের মতে কন্দ প্রবন্ধে তাল ব্যবহৃত হয় না। সিংহভূপাল এ বিষয়ে শার্ঙ্গদেবের সঙ্গে একমত—"তালরূপেণ শূন্যো গেয় ইত্যর্থঃ ন তাল্ নিয়মশূন্য ইতি বিবক্ষিতঃ।" এই মতটি স্বাভাবিক, কারণ আর্যাগীতি নামে যে ছন্দ আছে তা কন্দ প্রবন্ধের জন্য নির্দিষ্ট।

কন্দ প্রবন্ধের পরে হয়লীলা প্রবন্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধ হয়লীল তালে গাওয়া হয়। হয়লীলা প্রবন্ধ দুই-প্রকার—গদ্যজ এবং পদ্যজ।

গজলীলা নামক প্রবন্ধ গজলীল নামক তালে গাওয়া হয়। এই প্রবন্ধও গদ্যজ, পদ্যজ ভেদে দুই প্রকার। গজলীল নামে কোনও ছন্দ পাওয়া যায় না তবে 'ঋষভগবিলসিত' নামে একটি ষোড়শাক্ষরা বৃত্তির ছন্দ আছে। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে এটির পরিচয় দিয়েছেন গজবিলসিত নামে। কিন্তু এই ছন্দের সঙ্গে গজলীলা প্রবন্ধের কোনও যোগ ছিল কিনা সে সম্বন্ধে কল্লিনাথ কিছু বলেননি।

দ্বিপদী প্রবন্ধ চার প্রকার: শুদ্ধা, খণ্ডা, মাত্রা এবং সম্পূর্ণা। এই প্রবন্ধ গাওয়া হয় করুণ তালে। দ্বিপদী প্রবন্ধ ত্রিধাতুক। তাল এবং নিয়ম নির্দিষ্ট থাকাতে এটি দুই অঙ্গযুক্ত তারাবলি জাতীয় প্রবন্ধ।

এরপর পাওয়া যাচ্ছে চক্রবাল প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ দুই প্রকার—গদ্যজ এবং পদ্যজ। কল্লিনাথের মতে এই গানে উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব গাওয়া অবশ্যকর্তব্য। আভোগ আচরণের কোনও বাঁধা নিয়ম নেই। এই প্রবন্ধ দ্বিধাতুক। এই প্রবন্ধে তালাদি নিয়ম রক্ষিত হয় তাই এটি নিযুক্ত প্রবন্ধ এবং পদ-তাল বদ্ধ হওয়াতে তারাবলী জাতীয় প্রবন্ধ।

ক্রৌঞ্চপদ প্রবন্ধ প্রতিতালে গাওয়া হয়। কল্লিনাথের মতে এই প্রবন্ধের উদ্‌গ্রাহ হবে স্বর এবং পদ হবে ধ্রুব। স্বর দিয়ে এই গানের শেষ হয়। অর্থাৎ প্রথমে স্বর, পরে ধ্রুব এবং শেষে আবার স্বর আচরণের নিয়ম।

স্বরার্থ প্রবন্ধে কেবলমাত্র 'সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি'—এই স্বরাক্ষর-এর মধ্য দিয়ে

মূর্চ্ছনা ও ঠাট কোনটিরই উল্লেখ করেননি বলে তাঁকে কিন্তু মেল প্রচলন বা সঙ্গীত রত্নাকরের পূর্ববর্তী বলা যায় না। এখানে উল্লেখযোগ্য, দক্ষিণ ভারতে ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ এই চারটি স্বরের তিনটি করে বিকৃত স্বর, মধ্যমে দুটি, অবিকৃত বা অচল ষড়্জ ও পঞ্চম, সবশুদ্ধ ১৬টি স্বর-রূপের অভিব্যক্তি স্বীকার করা হয়। এই ১৬টি শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর থেকে ৭২টি ঠাট বা মেলকর্তা সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।

রাগ পর্যায়ে বৃহদ্ধর্ম পুরাণে যেমন কতকগুলি নতুন রাগের সন্ধান পাওয়া যায়, তেমনি অনেক অভিজ্ঞাত রাগের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে মালব কৌশিক, ককুভ, সৈন্ধবী প্রভৃতি প্রাচীন অতি-প্রসিদ্ধ রাগের নাম নেই। দীপকের নাম অনুযায়ী পত্নীদের পরিচারিকাদের সুন্দর নামগুলির উল্লেখ আছে মাত্র, কিন্তু পুরাণকার এদের স্বররূপের কোন পরিচয় দেননি। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বর্ণিত বৈজয়ন্তী রাগটির উল্লেখ পণ্ডিত অহোবলের 'সঙ্গীত-পারিজাতে'-এ পাওয়া যায় (পঞ্চদশ শতাব্দী)। আরোহী, অবরোহী, সঞ্চারী—"তেন চ ত্রিধা"। অথচ তার আগের সমাজেও বর্ণ বলতে চারটি বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রকার বলেছেন, "বর্ণাশ্চত্বার এ চৈব্য"। সুতরাং শ্রুতি ও বর্ণের বেলায় লক্ষ্য করা যায়। পুরাণকার দেবর্ষি নারদ, বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বিপর্যয় নারায়ণ, মহাদেব, ব্রহ্মাদি দেবতা, লক্ষ্মী ও গঙ্গাকে কেন্দ্র করে বেশ একটি গল্পের অবতারণ করেছেন। উদ্দেশ্য যাতে লোকে যথাযথ সঙ্গীতের অনুশীলন ও পরিবেশন করে শান্তি ও কল্যাণ বহন করে আনে।

বৃহদ্ধর্ম পুরাণের সময় থেকে রাগ-রাগিনীদের ধ্যানের কথা পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত সোমনাথের "রাগবিবোধ" গ্রন্থে আমরা প্রথমে বেশ বিস্তারিতভাবে রাগ-রাগিনীর ধ্যানরূপ পাই। সুতরাং মনে হয় এই বই থেকে পুরাণকার ধ্যানের রূপ গ্রহণ করেছেন। তবে বৃহদ্ধর্ম পুরাণে মাত্র দুটি রাগের ধ্যানরূপের পরিচয় আছে। যেমন গান্ধারী ও শ্রীরাগ। এই রাগ দুটির বর্ণনা দিয়ে বৃহদ্ধর্ম পুরাণে সঙ্গীতের প্রসঙ্গ শেষ হয়েছে।

মহাকাব্যের যুগ

বৈদিক যুগের পরেই মহাকাব্যের যুগ। ভারতবর্ষের দুটি প্রাচীন মহাকাব্যের নাম রামায়ণ এবং মহাভারত। এই দুটির রচনাকালকে 'মহাকাব্যের যুগ' বলা হয়। বাল্মীকী রামায়ণ রচনা করেন এবং এটিই প্রাচীনতর। খ্রিঃ পূঃ ৪০০ অব্দে রচনা শুরু হয়ে রামায়ণ শেষ হয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে। বেদব্যাসের মহাভারতের রচনা আরম্ভ হয় খ্রিঃ পূঃ ৩০০ অব্দে। খ্রিঃ পূঃ ৩০০ অব্দের এবং পূর্বাব্দের শেষের দিকের ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির একটি তথ্যপূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায় এই দুই মহাকাব্যে।

মহাকাব্যের যুগে বৈদিক যাগ-যজ্ঞের মত রাজসূয় যজ্ঞ এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত। এই দু'শ্রেণীর যজ্ঞে গাথা-নারাশংশী (বীরপুরুষদের

প্রশংসাসূচক স্তুতি-গান) ও আখ্যান (অর্থাৎ রাজন্যবর্গ এবং মুনিঋষিদের চরিত্রাবলী ও ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা) সুর করে গাওয়া হত বা সুরে আবৃত্তি করা হত। রাজসূয় যজ্ঞের সময় নৃত্যের আয়োজন থাকত। রামায়ণের কুশীলব এক শ্রেণীর ভ্রাম্যমান গীতশিল্পী। তারা রামচরিত ও রাম-গুণগাথা সুর ও তান সহযোগে দেশে দেশে গেয়ে বেড়াত। মহাভারতের সূত সঞ্জয় (সূত অর্থাৎ মিশ্র জাতি, ব্রাহ্মণ কন্যা এবং ক্ষত্রিয় যোদ্ধার ঔরসে জন্ম। এরা সারথির কাজ করত) সেই সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। ডঃ উইনটারনিজের মতে সঞ্জয় একজন সভাগায়ক ছিলেন এবং তিনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে মহাভারত যুদ্ধের আখ্যান গেয়ে শোনাতেন।

মহাকাব্যের যুগে তো বটেই, প্রাচীন ভারতেও বংশপরম্পরায় মুখে মুখে গান করার রীতি ছিল। রাজন্যবর্গ, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, গন্ধর্ব ও মুনি-ঋষিরাও বিশেষভাবে সঙ্গীতচর্চা করতেন। চারণদলকে রাজদরবারে সঙ্গীত পরিবেশন করতেই হত। দেবদাসীরা ছাড়া সম্ভ্রান্তবংশীয় নারীদেরও নৃত্যগীতে স্বাধীন-ভাবে অংশগ্রহণের অধিকার ছিল বলে জানা যায়। রাজাদের কাছ থেকে নিয়মিত বৃত্তি-ভোগী সূত এবং ভাট জাতীয় পাণিবাদকদের কাজই ছিল নৃপতিদের স্তুতিবিধান। সুর ও তালে তাদের যথেষ্ট দক্ষতা ছিল।

রামায়ণের যুগেও বৈদিক সামগানের প্রচলন ছিল। সামগ ও যাগবিলাসী ব্রাহ্মণ বা ঋত্বিকদের মধ্যে সামগান সীমাবদ্ধ ছিল। স্তুতিবচন, আশীর্বচন, অভিষেক উৎসব প্রভৃতি পুণ্য অনুষ্ঠানে সামগানের অনুষ্ঠান হত। রামায়ণের যুগে গান্ধর্ব সঙ্গীতের প্রচলন ছিল। এই গান্ধর্ব সঙ্গীত হিসাবে জাতিরাগ ও গ্রামরাগের গানের প্রচলন ছিল বলে অনুমান করা হয়। জাতিরাগ ও গ্রামরাগ-গুলি ষড়জাদি সাতটি লৌকিক স্বর, মূর্ছনা, মন্দ্রাদি তিন স্থান, লয় ও বিচিত্র রসে গাওয়া হত। তখন অযোধ্যা, কিষ্কিন্ধ্যা এবং লঙ্কায় সঙ্গীতের অনুশীলন ছিল। নিদ্রা থেকে জাগ্রত করায়, দেবতার আরাধনায়, যুদ্ধাভিযানে, উৎসবে, শবানুগমনে, মৃগয়াকালে—সব অনুষ্ঠানেই নৃত্যগীত ও বাদ্যের সমাবেশ থাকত।

মহাভারতের যুগে লৌকিক ষড়্জাদি সাত স্বরের ব্যবহার ছিল। অশ্বমেধ পর্বে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতেও গানকে 'গান্ধর্ব' বলা হয়েছে, তবে এতে বেশির ভাগ সময় 'গীত' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। এ যুগেও সামগান ছিল। কিন্তু বৈদিক সামগান আর বৈদিকোত্তর সামগান এক নয়, যদিও তা বৈদিক গানের অনুসরণেই রচিত হয়েছিল। মহাভারত গ্রন্থে গায়ক, নর্তকী, বাদক এবং অপ্সরাদের নৃত্যগীত, গাথা, গান, শঙ্খ, বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ, স্তুতি, তাল, লয়, মূর্ছনা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তবে এগুলির সুস্পষ্ট কোন পরিচয় নেই। মহাভারতে 'মঙ্গলগীতি'র উল্লেখ আছে। 'মঙ্গলগীতি' বলতে সাধারণভাবে কল্যাণসূচক ও আশীর্বাদবাচক গানকে বোঝায়। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে সেই অর্থেই এ গান রচিত হত এবং স্তাবক, ব্রাহ্মণ,

বাগ্‌গেয়কারের অভিপ্ট অর্থ প্রকাশ পায়। এই প্রবন্ধ দুই প্রকার—শুদ্ধ এবং মিশ্রিত। এই প্রবন্ধের সমাপ্তি ঘটে গ্রহ স্বরে এবং এই গ্রহই এর ন্যাস স্বর। ধ্বনীকুট্টনী প্রবন্ধে উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব অংশ ভিন্ন তালে গাওয়া হয়। এই প্রবন্ধ মণ্ঠ এবং কঙ্কাল তালের ব্যবহার নিষিদ্ধ। এই গানে প্রত্যেক পদবিরতির মধ্যে মাত্রাসংখ্যা সমান থাকে। শার্ঙ্গদেব বলেছেন যে ধ্বনীকুট্টনী প্রবন্ধ মেলাপক বর্জিত। কল্লিনাথের মতে এই প্রবন্ধে মেলাপকের ব্যবহার বৈকল্পিক। সিংহভূপালের মতে ধ্বনিকুট্টনী প্রবন্ধে মেলাপক অংশটি অক্ষরবর্জিত গমকালপ্তি দ্বারা সম্পাদিত হয়। কল্লিনাথের মতে এটি ত্রিধাতুক, পদ-তাল বদ্ধ তারাবলী-জাতীয় নির্যুক্ত প্রবন্ধ।

আর্যা প্রবন্ধ আর্যাছন্দে গাওয়া হয়। চরণান্তে অথবা প্রথমার্ধের শেষে সা-রে-গা-মা ইত্যাদি স্বর উচ্চারণ করা হয় এবং এই অংশটি দুইবার গাওয়া হয়। দ্বিতীয় অর্ধ গাওয়া হয় একবার। প্রথমার্ধটি হল উদ্‌গ্রাহ এবং দ্বিতীয়ার্ধটি হল ধ্রুব। আভোগ অংশে থাকে গাতা বা নেতার নাম। উদ্‌গ্রাহ অংশের পুনরাবৃত্তির পর গান শেষ হয়।

গাথা প্রবন্ধ প্রাকৃতপদ অবলম্বনে গাওয়া হয়ে থাকে। এই প্রবন্ধের অন্যান্য নিয়মগুলি আর্যা প্রবন্ধের মতই।

দ্বিপথ প্রবন্ধ গাওয়া হয় দ্বিপথ ছন্দ অবলম্বনে। এই প্রবন্ধের শেষে স্বরাচরণ বিধেয়। শার্ঙ্গদেব একে "স্বরমূর্ছিকঃ" বলেছেন। দ্বিপথ প্রবন্ধ তালহীন এবং সতাল দুরকমই হয়। এটি তিন ধাতু বিশিষ্ট। কারণ, এতে মেলাপক নেই। এই প্রবন্ধ চার প্রকার।

কলহংস প্রবন্ধ কলহংস ছন্দে রচিত হয়। কল্লিনাথ দ্বাদশাক্ষর পর্যায়ের হংস নামক ছন্দকে কলহংস ছন্দ নামে অভিহিত করেছেন। এই প্রবন্ধে প্রতিপাদের শেষে স্বরানুষ্ঠানের পর গান শেষ হয়। এই গানে ঝম্পাতাল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। এরও ধাতুর সংখ্যা তিন। কলহংস প্রবন্ধ দুই প্রকার—বর্ণজ এবং মাত্রিক।

তোটক প্রবন্ধ তোটক ছন্দে বাঁধা থাকে। এই গানে প্রতিপাদের শেষে স্বরানুষ্ঠান হয়। এতে উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব এবং আভোগ বর্তমান। তোটক প্রবন্ধ ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত এবং ভাবনীজাতীয়।

এরপর ঘট প্রবন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বোল্লিখিত দ্বিপদী প্রবন্ধের অর্ধেক অংশ নিয়ে ঘট প্রবন্ধের সৃষ্টি হয়। তেনক অঙ্গের অনুষ্ঠানের পর এই গান শেষ হয়।

বৃত্ত-প্রবন্ধ যে কোনও ছন্দে, ইচ্ছামত তালে গাওয়া চলত। এই প্রবন্ধের শেষে স্বরানুষ্ঠান হয়। মতান্তরে স্বরানুষ্ঠান বর্জিত বৃত্ত প্রবন্ধের কথা বলা হয়।

এর পর মাতৃকা প্রবন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। মাতৃকা শব্দের অর্থ বর্ণমালা। প্রথম পদ অ-কার, দ্বিতীয় পদ আ-কার ; এইভাবে ক্রমান্বয়ে ক্ষ-কার পর্যন্ত পদ

এই প্রবন্ধে রচনা করা হয়। এই প্রবন্ধে মার্গতাল এবং দেশী তাল ব্যবহৃত হত। এই প্রবন্ধ দুই প্রকার—গদ্যজ এবং পদ্যজ। মাতৃকা প্রবন্ধ ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত এবং তারাবলী জাতীয়।

রাগকদম্বক প্রবন্ধ দুই প্রকার—নন্দাবর্ত এবং স্বস্তিক। কল্লিনাথের মতে রাগকদম্বক কেবলমাত্র উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব সহযোগে গাওয়া হয়। এটি দ্বিধাতুক।

পঞ্চতালেশ্বর প্রবন্ধে প্রথমে রাগালাপ করা হয়। এর পর পাঁচটি পদ দুই বার করে গাওয়া হয়। এতে আরম্ভে যে আলাপ শেষেও সেই আলাপ করা কর্তব্য।

তালার্ণব হল আলিক্রম পর্যায়ের শেষ প্রবন্ধ। এতে বহু তাল প্রয়োগ করা হয়। তালার্ণব প্রবন্ধ দুই প্রকার—গদ্যজ এবং পদ্যজ। কল্লিনাথ বলেছেন প্রবন্ধ উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব, আভোগযুক্ত ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত এবং মেদিনীজাতীয়।

বিপ্রকীর্ণ পর্যায়ের বিবিধ প্রবন্ধ

বিপ্রকীর্ণ পর্যায়ের প্রথম প্রবন্ধটির নাম 'শ্রীরঙ্গ'। রাগকদম্বক প্রবন্ধের সঙ্গে এই প্রবন্ধের মিল পাওয়া যায়। বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধে চারটি রাগ এবং চারটি তাল ব্যবহৃত হয়। শেষে পদবিন্যাস বর্তমান। এই প্রবন্ধ ত্রিধাতুক নির্যুক্ত এবং মেদিনীজাতীয়।

শ্রীবিলাস প্রবন্ধে পাঁচটি তাল এবং পাঁচটি রাগের ব্যবহার পাওয়া যায়। শেষে স্বরানুষ্ঠান হয়।

পঞ্চভঙ্গি প্রবন্ধের শেষে তেনক যোজিত হয়। এই একটিমাত্র লক্ষণের কথাই শার্ঙ্গদেব বলেছেন। সিংহভূপালের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে এই প্রবন্ধ দুটি রাগ এবং দুটি তালে নিবদ্ধ থাকে।

পঞ্চানন প্রবন্ধের শেষে পাঠ-এর আচরণ হয়। অন্যান্য লক্ষণ পঞ্চভঙ্গি প্রবন্ধের মত।

উমাতিলক প্রবন্ধে তিন প্রকার রাগ এবং তিন প্রকার তাল ব্যবহৃত হয়। শেষে বিরুদ সংযুক্ত হয়।

উপরোক্ত পাঁচটি প্রবন্ধ সম্পর্কে শার্ঙ্গদেব বলেছেন যে এগুলি ছয়টি অঙ্গ যুক্ত।

ত্রিপদী প্রবন্ধে চারটি পদ বর্তমান। এই প্রবন্ধ তালহীন এবং কর্ণাটি ভাষায় রচিত। চারটি পদ থাকা সত্ত্বেও এই প্রবন্ধের নাম ত্রিপদী হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কল্লিনাথ বলেছেন যে এই প্রবন্ধে প্রথম দুটি পদ একই রকম হওয়াতে এদের একটি পদ বলে মনে হয়। ত্রিপদী প্রবন্ধের প্রথম পদ দুটি উদ্‌গ্রাহ এবং বাকি পদ দুটি ধ্রুব। ইচ্ছানুসারে এতে আভোগের পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। কল্লিনাথের মতে এটি তারাবলী জাতীয় নির্যুক্ত প্রবন্ধ।

চতুষ্পদী প্রবন্ধের চারটি পাদের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদের প্রত্যেকটিতে ষোলোটি করে মাত্রা থাকে এবং প্রথম ও তৃতীয় পাদের প্রত্যেকটিতে পনেরোটি করে মাত্রা থাকে। কল্লিনাথ বলেছেন যে, এই প্রবন্ধের পূর্বার্ধ স্বরসংযুক্ত এবং

উত্তরার্ধ তেনক সংযুক্ত। তেনক-এর অনুষ্ঠান দ্বারা এই গান শেষ হয়। এই প্রবন্ধে আভোগের পরিকল্পনাও দেখা যায়। এটি ভাবনী জাতীয়।

ছটি পাদ নিয়ে গঠিত হয় ষট্‌পদী প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ কর্ণাট ভাষায় রচিত হয়। এতে তাল ব্যবহৃত হয় না। এর প্রথম তিনটি পাদ হল উদ্‌গ্রাহ এবং শেষের তিনটি পাদ ধ্রুব। আভোগের অস্তিত্বও কল্পনা করা হয়ে থাকে। এটি তারাবলী জাতীয় নির্যুক্ত প্রবন্ধ।

বস্তু প্রবন্ধে থাকে পাঁচটি পাদ। এটি ত্রিধাতুক। কল্লিনাথ বলেছেন যে এটি পঞ্চাঙ্গযুক্ত, বিরুদহীন, আনন্দিনী জাতীয় নির্যুক্ত প্রবন্ধ।

বিজয় প্রবন্ধ গাওয়া হত রাজাদের বিজয় উৎসব উপলক্ষে। তেন, স্বর, পাট, পদ সহযোগে এই গান গাওয়া হত। এই গানে বিজয়তাল ব্যবহৃত হত। স্বরযুক্ত অংশটি উদ্‌গ্রাহ এবং পাট ও পদযুক্ত অংশটি ধ্রুব। এটি আনন্দিনী জাতীয়।

ত্রিপথক প্রবন্ধে থাকে তিনটি পাদ। কল্লিনাথ বলেছেন, এই প্রবন্ধের প্রথম দুটি উদ্‌গ্রাহ এবং তৃতীয় পাদ ধ্রুব। এতে আভোগও পাওয়া যায়। ত্রিপথক হল আনন্দিনী জাতীয় প্রবন্ধ।

চারটি চরণ এবং চারটি বর্ণ (স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী, সঞ্চারী) ব্যবহৃত হয় চতুর্মুখ প্রবন্ধে। প্রথম পাদদ্বয় উদ্‌গ্রাহ, দ্বিতীয় পাদদ্বয় ধ্রুব। আভোগ রচিত হয় পদান্তর দ্বারা। এই প্রবন্ধ ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত, বিরুদবর্জিত হওয়ায় পঞ্চাঙ্গযুক্ত আনন্দিনী জাতীয় প্রবন্ধ।

এর পর সিংহলীল প্রবন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধ গাওয়া হয় সিংহলীল তালে। এতে স্বর, পাট, বিরুদ, তেনক বর্তমান। কল্লিনাথ বলেছেন যে এই প্রবন্ধের স্বর, পাট দ্বারা গঠিত অংশ উদ্‌গ্রাহ এবং বিরুদ, তেনক দ্বারা গঠিত অংশ ধ্রুব। পদের সাহায্যে আভোগ সৃষ্টি হয়। এটি ত্রিধাতুক মেদিনী জাতীয় প্রবন্ধ।

হংসলীল তালে গাওয়া হয় হংসলীল প্রবন্ধ; প্রথম পাদটি উদ্‌গ্রাহ এবং দ্বিতীয় পাদটি ধ্রুব। পদান্তর করে আভোগ রচনা করা হয়। সুতরাং এটি ত্রিধাতুক। পদ, পাট, তাল এই প্রবন্ধে পাওয়া যায়। এটি ভাবনী জাতীয় প্রবন্ধ।

দণ্ডক প্রবন্ধ গাওয়া হয় দণ্ডক ছন্দে, পদ এবং স্বর সহযোগে। পদ দ্বারা গঠিত দণ্ডকের পূর্বার্ধ উদ্‌গ্রাহ। দণ্ডকের উত্তরার্ধ ধ্রুব। পদান্তর করে আভোগ রচনা করা হয়। সেই হিসাবে দণ্ডক প্রবন্ধ ত্রিধাতুক। এই প্রবন্ধে স্বর, পদ, তাল ব্যবহৃত হওয়ায় এটি ভাবনীজাতীয়।

ঝম্পট প্রবন্ধ গাওয়া হয় ঝম্পট ছন্দে, ক্রীড়াতালে। কল্লিনাথ বলেছেন, এই প্রবন্ধের প্রথম দুটি পাদ উদ্‌গ্রাহ এবং তৃতীয় পাদ ধ্রুব। যদি আভোগ কল্পনা করা হয় তবে এটি হবে ত্রিধাতুক। এটি নির্যুক্ত এবং তারাবলী জাতীয়।

কন্দুক প্রবন্ধের প্রথম পাদদ্বয় উদ্‌গ্রাহ এবং তৃতীয় পাদ ধ্রুব। এটি নির্যুক্ত এবং দীপনীজাতীয় প্রবন্ধ।

ত্রিভঙ্গি প্রবন্ধে স্বর, পাট, পদ বর্তমান। এই প্রবন্ধ পাঁচ প্রকার। প্রথম প্রকার ত্রিভঙ্গী তালে গাওয়া হয়। দ্বিতীয় প্রকারে ত্রিভঙ্গী ছন্দ ব্যবহৃত হয়। তৃতীয় প্রকার ত্রিভঙ্গ প্রবন্ধে তিন রকম রাগ ও তিন রকম তাল ব্যবহৃত হয়। চতুর্থ প্রকার গাওয়া হয় তিন রকম ছন্দে। পঞ্চম প্রকারে তিনটি দেবতার স্তুতি সংযোজিত হয়।

হরিবিলাসক প্রবন্ধে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ডে যথাক্রমে বিরুদ, পাট এবং তেনকের অনুষ্ঠান হয়।

প্রথম খণ্ড হল উদ্‌গ্রাহ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড হল ধ্রুব। পদান্তর দ্বারা আভোগ সৃষ্ট হয়। কল্লিনাথ বলেছেন এটি ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত এবং আনন্দিনী জাতীয় প্রবন্ধ।

সুদর্শন প্রবন্ধ হরিবিলাসক প্রবন্ধের মত। এতে পদ, বিরুদ এবং তেনকের ব্যবহার দেখা যায় এবং এতে স্বর ও পাঠের ব্যবহার না থাকায় কল্লিনাথ এই প্রবন্ধকে দীপনীজাতীয় বলেছেন।

স্বরাংক প্রবন্ধে পদ, স্বর এবং বিরুদ ও তিনটি ধাতু বর্তমান। এতে ক্রমান্বয়ে তিনটি তালের ব্যবহার হয়। তবে শার্ঙ্গদেবের বর্ণনা থেকে এটিকে মেলাপক বর্জিত বলে মনে হতে পারে। সিংহভূপালও এই প্রবন্ধে মেলাপক আছে বলে মনে করেন না। তবে কল্লিনাথ এই প্রবন্ধের পদকে উদ্‌গ্রাহ, স্বরকে মেলাপক এবং বিরুদকে ধ্রুব বলে বর্ণনা করেছেন। শার্ঙ্গদেবের মতে এই প্রবন্ধ গাইতে হবে মালবশ্রী রাগে। এই প্রবন্ধে মেলাপক এবং আভোগ আছে বলে মেনে নিলে এটিকে চতুর্ধাতুক প্রবন্ধ বলতে হবে—এই মত প্রকাশ করেছেন কল্লিনাথ। এটি নির্যুক্ত এবং দীপনীজাতীয়।

শ্রীবর্ধন প্রবন্ধে বিরুদ, পাট, পদ ও স্বর বর্তমান এবং এর বিরুদ ও পাট নিয়ে উদ্‌গ্রাহ এবং পদ ও স্বর নিয়ে ধ্রুব অংশটি সংগঠিত।

হর্ষবর্ধন প্রবন্ধেও পদ ও বিরুদ, স্বর, পাট বর্তমান। অবশ্য সিংহভূপাল বলেছেন যে এই প্রবন্ধে শুধুমাত্র পদ ও বিরুদ থাকে।

বদন প্রবন্ধে ছ-গণ (S S S I), প-গণ (S S) এবং দ-গণ (S)—এর ব্যবহার হয়। এই মাত্রা গণ তিনটি হচ্ছে উদ্‌গ্রাহ। স্বর ও পাট দ্বারা রচিত পরের পদটি ধ্রুব। এই মতটি কল্লিনাথের।

উপবদন এবং বস্তু-বদন প্রবন্ধেও স্বর এবং পাট যুক্ত পদ থাকে। পদান্তরের সাহায্যে আভোগের পরিকল্পনাও করা হয়। এটি দীপনী জাতীয়।

চচ্চরী তালে হিন্দোল রাগে গাওয়া হয় চচ্চরী প্রবন্ধ। এই গান বসন্তোৎসবে গাওয়া হয়। ক্রীড়াতালেও কেউ কেউ এই গান গেয়ে থাকেন। কল্লিনাথ বলেছেন, এতে উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব এবং আভোগ বর্তমান। এটি ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত, তারাবলী জাতীয়।

চর্যা প্রবন্ধ পদ্ধড়ী ছন্দে এবং আধ্যাত্মিক বিষয় অবলম্বনে রচিত। কল্লিনাথের মতে এটি ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত এবং তারাবলী জাতীয় প্রবন্ধ। চর্যাগীতি দু'প্রকার—পূর্ণা ও অপূর্ণা।

পদ্ধড়ী প্রবন্ধ পদ্ধড়ী ছন্দে রচিত হয়। এতে বিরুদ, স্বর এবং পাট বর্তমান। কল্লিনাথের মতে এটি ত্রিধাতুক, নির্যুক্ত এবং আনন্দিনী জাতীয়।

সংগ্রাম উপলক্ষে স্তুতিবাচক প্রবন্ধ হল রাহড়ী। এটি বীররসাত্মক ও বহু পাদ সম্পন্ন। এটি ত্রিধাতুক এবং তারাবলী জাতীয়।

বীরশ্রী প্রবন্ধে পদ, বিরুদ যথাক্রমে উদ্‌গ্রাহ ও মেলাপক। এটি ত্রিধাতুক এবং ভাবনী জাতীয়।

মঙ্গলাচার প্রবন্ধ কৈশিকী রাগে, নিঃসারু তালে, স্বরাচরণ সহযোগে গাওয়া হয়। তিন প্রকার মঙ্গলাচার প্রবন্ধ বর্তমান—গদ্যজ, পদ্যজ এবং পদ্যজ-গদ্যজ। এটি ত্রিধাতুক, নিযু্ক্ত এবং ভাবনী জাতীয়।

ধবল প্রবন্ধে থাকে আশীর্বাণী। এই প্রবন্ধের পূর্বার্ধ উদ্‌গ্রাহ এবং উত্তরার্ধ ধ্রুব। পৃথকভাবে আভোগ রচিত হয়। এটি তারাবলী জাতীয় প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ তিন প্রকার—কীর্তি, বিজয় এবং বিক্রম।

কল্যাণবাচক মঙ্গল প্রবন্ধ গাওয়া হত বোট্টরাগে বা কৈশিকী রাগে এবং বিলম্বিত লয়ে।

দেশভাষায় রচিত, অনুপ্রাসযুক্ত তিনটি খণ্ড সমন্বিত ওবীপদ প্রবন্ধ খুব সম্ভব শার্ঙ্গদেবের সময় দৌলতাবাদ অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত ছিল। এই গানের শেষে 'ওবী' পদটি গাওয়া হয়।

লোলীপদ প্রবন্ধ প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রবন্ধ। এটি অনেকটা ওবীপদ প্রবন্ধের মত, শুধুমাত্র 'ওবী'-র স্থানে 'লোলী' পদ গাওয়া হয়।

লাটভাষায় রচিত ঢোল্লরীপদ প্রবন্ধের শেষে 'ঢোল্লরী' পদ যুক্ত হয়। এ সম্পর্কে এর বেশি কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

অধিক অনুপ্রাসযুক্ত, তিনটি খণ্ড সমন্বিত দণ্ডী প্রবন্ধের শেষে 'দণ্ডী' পদের যোগ হয়। এই দণ্ডী শব্দের কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

ওবীপদ, লোলীপদ, ঢোল্লরীপদ এবং দণ্ডী এই চারটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে কল্লিনাথের অভিমত হল এই যে, পদ এবং তালবদ্ধ হওয়ায় এরা তারাবলী জাতীয়।

প্রবন্ধ ভেদে উদগ্রাহ অংশ তিন খণ্ডে, দুই খণ্ডে বা এক খণ্ডে গাওয়া হতে পারে; ধ্রুব এবং আভোগ অংশও সেইরূপ। [illegible] শেষে ধ্রুবা অংশটি আর একবার গেয়ে গান শেষ করার রীতি। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, 'ধ্রুব' প্রবন্ধ সঙ্গীতের নিত্য অংশ হওয়া সত্ত্বেও কোনও কোনও প্রবন্ধে ধ্রুব বা আভোগ বর্জন করা হয়েছে।[1] কিন্তু কল্লিনাথ বলেছেন, ধ্রুব এবং আভোগ যখন থাকে না তখন অনেকগুলি উদ্‌গ্রাহের আচরণ হয়। সেক্ষেত্রে উদ্‌গ্রাহই

১। যেমন '[illegible]' প্রবন্ধ ([illegible])

ধ্রুবের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং যে কোনও অবস্থাতেই হোক ধ্রুব অংশ প্রকৃতপক্ষে বর্জিত হয় না। আবার কোনও কোনও প্রবন্ধ কেবলমাত্র উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব সহযোগে গঠিত।[1] বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধের মধ্যে আবার এমন প্রবন্ধ রয়েছে যার পূর্বভাগের তিনটি পাদ উদ্‌গ্রাহ এবং শেষের তিনটি চরণ ধ্রুব।

সালগ সূড় প্রবন্ধ

সূড় (যাকে বলা হয়েছে শুদ্ধ সূড়), আলি, বিপ্রকীর্ণ—প্রবন্ধ সঙ্গীত এই তিন ভাগে মোটামুটিভাবে বিভক্ত থাকলেও বহুক্ষেত্রে এদের মিশ্রণ ঘটেছে এবং পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন এবং মিশ্রণের মধ্য দিয়ে নতুন শ্রেণীবিভাগ পরবর্তীকালে সূচিত হয়েছে। শার্ঙ্গদেব 'সালগ-সূড়' শ্রেণীর যে প্রবন্ধের কথা বলেছেন তার মধ্যে রয়েছে সাত প্রকার প্রবন্ধ—ধ্রুব, মণ্ঠ, প্রতিমণ্ঠ, নিঃসারুক, অড্ডতাল, রাসক ও একতালী। এই একতালী-র সঙ্গে শুদ্ধসূড়স্থ একতালীর সম্পর্ক নেই।

'সালগ' শব্দটি 'ছায়ালগ' শব্দ থেকে এসেছে। 'ছায়ালগ' সম্পর্কে কল্লিনাথের ব্যাখ্যা এ-রকম—

"ছায়ালগঃ ছায়াং শুদ্ধসাদৃশ্যং লগতি গচ্ছতি ইতি তথোক্তঃ।"—অর্থাৎ যে সব গানে শুদ্ধ সঙ্গীতের ছায়াপাত ঘটেছে সেইগুলিকে 'ছায়ালগ' বলা যায়। শুদ্ধ গীতের মধ্যে পড়ে জাতি, কপাল, কম্বল, গ্রামরাগ, উপরাগ, ভাষা, বিভাষা, অন্তর ভাষা। শার্ঙ্গদেবের মতে, যেহেতু এলা প্রভৃতি প্রবন্ধে শুদ্ধগীতের অনুসরণ পরিলক্ষিত হয় সেইহেতু এলা থেকে একতালী পর্যন্ত গীতগুলি শুদ্ধসূড়। এইসব গানের ক্ষেত্রে অতিলঙ্ঘন হয়নি বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু ধ্রুবা প্রভৃতি গানের ক্ষেত্রে অতিলঙ্ঘন ঘটেছে বলে সেগুলি ছায়ালগ বা সালগ-এর পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। শার্ঙ্গদেবের মতে, এলা প্রভৃতি গীতের ছায়ালগত্ব আচার্যসম্মত; কিন্তু তবুও শ্রোতার কাছে এগুলি শুদ্ধগীতের মত বলে প্রচলিত থাকায় এগুলিকে শুদ্ধগীতরূপেই গ্রহণ করা হয়। তাঁর উক্তি—

"ছায়ালগত্ব মেলাদের্যদ্যপ্যাচার্য সম্মতং।
লোকে তথাপি শুদ্ধোহসৌ শুদ্ধসাদৃশ্যতো মতঃ॥"

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে শার্ঙ্গদেব এলা প্রভৃতি গীতগুলিকে শুদ্ধসূড় বলে মেনে নিয়েছিলেন।

সালগ প্রবন্ধের অন্তর্গত সাতটি প্রবন্ধের তিনটি সংগীত অংশ (ধাতু) থাকত; যেমন—উদ্‌গ্রাহ, অন্তর এবং আভোগ। মেলাপক এখানে বর্জিত। তবে মণ্ঠ, প্রতিমণ্ঠ প্রভৃতির ছটি করে অঙ্গ থাকত।

ধ্রুব-প্রবন্ধ গান সম্পর্কে শার্ঙ্গদেব বলেছেন—

"এক ধাতুর্দ্বিখণ্ড স্যাদ্ যত্রোদ্‌গ্রাহস্ততঃপরম্॥
কিঞ্চিদুচ্চং ভবেৎ খণ্ডম দ্বিরভ্যাস্মিদম্ ত্রয়ম।

১। যেমন 'রাগ কদম্বক' প্রবন্ধ (আলি প্রবন্ধ)।

ততো দ্বিখণ্ড আভোগস্তস্য স্যাৎ খণ্ডমাদিনম্ ॥
এক-ধাতুর্দ্বিখণ্ডম্ চ খণ্ড মুচ্চতরম্ পরম্ ।
তত্যানামাংকিতশ্চাসৌ ক্বচিদুচ্চৈকখণ্ডকঃ ॥
উদ্গ্রাহস্যাদ্যখণ্ডে চ ন্যাসঃ স ধ্রুবকোভবেৎ ।
একাদশাক্ষরাৎ খণ্ডদেকৈকাক্ষর বর্ধিতৈঃ ॥
খণ্ডেধ্রুবাঃ ষোড়শ স্যুঃ ষড়্বিংশত্যক্ষরাবধি ।"

সিংহভূপাল এই শ্লোক ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

"ধ্রুবাদিভিঃ সপ্তভিগীতৈঃ সালগ সূড় প্রবন্ধাঃ
তেষু ধ্রুবম্ লক্ষয়তি একধাত্বিতি
পূর্বম্ সাদৃশগেয় খণ্ডাদ্বয়যুক্ত উদ্গ্রাহঃ কর্তব্যং
ততোনন্তরম্ কিঞ্চিদুচ্চম্ খণ্ডমন্তরাখ্যম্ কর্তব্যম ;
এতৎ ত্রয়োমপি দ্বিরাভক্তম্ দ্বির্গেয়ম্ ।
ততোনন্তরম্ খণ্ডদ্বয়মযুক্ত আভোগ, তস্য প্রথমং
খণ্ডদ্বয়-মেকধাতু সাদৃশগেয় খণ্ডদ্বয়যুক্তম্,
দ্বিতীয়-খণ্ডম্ ততোপ্যুচ্চম্ গাতোব্যম্
অসাবাভোগস্তত্যস্য নায়কস্য নাম্না যুক্তঃ কার্য্যঃ
ক্বচিৎকেবাচিন্মতে ষ মুচ্চৈকখণ্ডো গাতব্যঃ
উদ্গ্রাহস্য আদ্যখণ্ডে চ সমাপ্তি,
সা ধ্রুব ইতি জ্ঞেয়ঃ ।"

সালগ সূড়ের অন্তর্গত ধ্রুবাগীতির যে বিবরণ সংগীত-রত্নাকরে পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, এই প্রবন্ধ-এর উদ্গ্রাহ অংশটির দুই ভাগ। উদ্গ্রাহের পরেই যে অংশ তার নাম 'অন্তর'। শার্ঙ্গদেবের ভাষায়—

"ধ্রুবা ভোগান্তরে জাতো ধাতুরণ্যোঽন্তরাভিধঃ ।
স তু সালগ সূড়স্থস্বরূপেষু এব দৃশ্যতে ।"

অর্থাৎ শুধুমাত্র সালগসূড়স্থ গীতিগুলিতেই ধ্রুব এবং আভোগ—এই দুই ধাতুর মধ্যবর্তীস্থলে আর একটি ধাতু দেখা যায়, তার নাম 'অন্তর'। এই 'অন্তর' অংশ কিছুটা উচ্চৈঃস্বরে গাইবার নিয়ম—"কিঞ্চিদুচ্চং খণ্ড অন্তরাখ্যাং কর্তব্যম্"—সিংহভূপাল।

উদ্গ্রাহের দুই খণ্ড এবং অন্তর—এই তিন ভাগই দুবার করে গাইবার রীতি ছিল। ধ্রুব প্রবন্ধের আভোগ অংশও দুই খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রথম খণ্ডের চেয়ে দ্বিতীয় খণ্ড কিছুটা উচ্চৈঃস্বরে গাইবার রীতি ছিল। সিংহভূপালের মত অনুসারে আভোগের শেষ খণ্ডটি অন্তরার চেয়েও উচ্চস্বরে গাইতে হবে এবং এই অংশে নায়কের নাম যুক্ত থাকবে। সমগ্র গানটির পর উদ্গ্রাহের প্রথম খণ্ডটি গেয়ে গান শেষ করবার রীতি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শুদ্ধ সূড় প্রবন্ধে যেখানে রয়েছে উদ্গ্রাহ, ধ্রুব মেলাপক এবং আভোগ—এই চারটি ধাতু, সেখানে আমরা ধ্রুব প্রবন্ধে পাচ্ছি

উদ্‌গ্রাহ (দুই খণ্ড), অন্তর এবং আভোগ (দুই খণ্ড)। কল্লিনাথ অবশ্য বলেছেন যে, সালগ সূড় প্রবন্ধের 'অন্তর' নামক অংশ প্রকৃতপক্ষে কোনও বিশিষ্ট ধাতু নয়, লৌকিক রূপান্তর মাত্র—'অন্তরমন্তরো লৌকিক রূপান্তর ইত্যুচ্যতে।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি ভাবে প্রবন্ধ সঙ্গীত কালক্রমে রূপান্তরিত হয়ে হয়েছে; এ সম্পর্কে একটি অভিমত এ-রকম—

"যে কোনও কারণেই হোক, উদ্‌গ্রাহ ও মেলাপক এই দুই অংশ বাহুল্য মনে হওয়ায় এই দুই অংশ একেবারে বাদ দিয়ে ধ্রুব বা ধ্রুবকীল থেকে গান আরম্ভ করে আভোগ শেষ করবার রীতি পরিকল্পিত হয়। ধ্রুবকে প্রাধান্য দিয়ে রচিত সঙ্গীত পদ্ধতিকে স্বভাবতই ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ নামকরণ করা হয়। পরবর্তীকালে 'অন্তরা' ধ্রুপদে স্থান পায়। তা ছাড়া অন্তরা ধ্রুব ও আভোগের মধ্যবর্তী স্থানে ব্যবহার করার রীতি ছিলই। আভোগও দুই ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে এবং এই আভোগের প্রথম অংশের নাম হয় 'সঞ্চারী'। এখনও সঞ্চারীর পর ধ্রুবকীলতে ফিরে যেতে হয় না। এতেই মনে হয় যে সঞ্চারী ও আভোগ আভোগেরই দুটি অংশ।" ('বাংলার সঙ্গীতের ইতিহাস'—মণিলাল সেন)।

আর একটি অভিমত হচ্ছে—"প্রাক্তন ধ্রুবস্থ উদ্‌গ্রাহটি আমাদের বর্তমান স্থায়ী, 'অন্তর' অংশটি বর্তমানে 'অন্তরা' নাম ধারণ করেছে। আভোগের প্রথম খণ্ডটি বর্তমান সঞ্চারী এবং দ্বিতীয় আভোগ নামেই পরিচিত আছে।" ('সঙ্গীত সমীক্ষা', পৃঃ ২১৩—রাজ্যেশ্বর মিত্র।)

প্রবন্ধ সঙ্গীত ভালভাবে পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় যে, ধ্রুব হচ্ছে নিত্য অংশ এবং আভোগ অংশও সেইরূপ। কল্লিনাথের যে উক্তি পূর্বে উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, যে প্রবন্ধে ধ্রুব ও আভোগ থাকে না সেখানে একাধিক উদ্‌গ্রাহের আচরণ হয় এবং উদ্‌গ্রাহই সেক্ষেত্রে ধ্রুবের প্রতিনিধিত্ব করে। কারণ, গানে প্রকৃত বিষয়ের প্রস্তাবনাও যেমন থাকতে হবে তেমনি থাকতে হবে তার পরিসমাপ্তি। "প্রস্তাবনার পরে স্বভাবতই আকাঙ্ক্ষার একটি রেশ থাকে এবং এই রেশটুকু আভোগে ক্ষয় করা হয়" ('প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত-চিন্তা'—অমিয়নাথ সান্যাল)।

আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, সালগ-সূড় প্রবন্ধের অন্তর্গত ধ্রুব শ্রেণীর প্রবন্ধে ধ্রুব অংশের উল্লেখ না থাকতে পারে, সে ক্ষেত্রে উদ্‌গ্রাহের দুই অংশের এক অংশই ধ্রুব-এর প্রতিনিধিত্ব করত এবং পরবর্তীকালে উদ্‌গ্রাহের এই দ্বিতীয় অংশই 'স্থায়ী'[1] নামে অভিহিত হয়েছে এবং প্রথম অংশ পরিত্যক্ত হয়েছে। এর পরের অংশ 'অন্তর' পরবর্তীকালে 'অন্তরা' নামে অভিহিত এবং আভোগের (ধ্রুব প্রবন্ধে আভোগের দুই খণ্ড) প্রথম খণ্ড সঞ্চারী আর দ্বিতীয় খণ্ড আভোগ নামে পরিচিত হয়েছে। সাহিত্য রসের ক্ষেত্রে যেমন সঞ্চারী (বা ব্যভিচারী) ভাব স্থায়ী ভাবের পরিণতি রসকে পরিপুষ্টি দান করে, তেমনি

১। ধ্রুব=ধ্রু (স্থির হওয়া)+অ। সুতরাং এই স্থির থাকা অংশই স্থায়ী।

প্রবন্ধ সঙ্গীতের সঞ্চারী অংশ 'স্থায়ী'-তে প্রস্তাবিত আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তি সাধনে সাহায্য করে।

সুতরাং বর্তমানের ধ্রুপদ সালগসূড়ের অন্তর্গত ধ্রুবাগীতির[১] পরিবর্তিত রূপ। 'পদ' বলতে সমগ্র গানটিকেই বোঝাতো, তাই ধ্রুবপদ কথাটি প্রথমে আসে এবং পরবর্তীকালে সংক্ষেপিত হয়ে 'ধ্রুপদ' নামকরণ হয়।

ধ্রুবগান এবং ধ্রুবাগান

এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ধ্রুব এবং ধ্রুবা এক জিনিস নয়। এদের রকম, গঠন এবং প্রয়োগ সবই বিভিন্ন। ধ্রুব নিবন্ধ প্রবন্ধ শ্রেণীর গান এবং এটি সালগসূড় প্রবন্ধ শ্রেণীর অন্তর্গত। অন্যদিকে ধ্রুবা নিবন্ধ গান এবং এটি নাটকে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে রচিত। মতঙ্গ, পার্শ্বদেব এবং শার্ঙ্গদেব—এঁরা ধ্রুব গানের বর্ণনা দিয়েছেন। আর ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে বিস্তারিতভাবে ধ্রুবা গানের আলোচনা করেছেন।

ধ্রুবাগান প্রাচীন নিবন্ধ শ্রেণীর গান। নাট্যানুষ্ঠানের বিভিন্ন পরিবেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতের অনুষ্ঠান হত। এই গীতগুলিকে বলা হত ধ্রুবা। এই গানের প্রয়োগ ছিল অবশ্যিক। ধ্রুবাগীতির অনুষ্ঠান হত পূর্বরঙ্গে বা যবনিকার বহির্ভাগে। এই "ধ্রুবাগীতি বৈদিক সামগানেরই পরবর্তী রূপ।"[২] নাট্যানুষ্ঠানে এগুলি ব্যবহৃত হলেও নাট্যকার এগুলি রচনা করতেন না। প্রচলিত কয়েক প্রকারের বাঁধা গানই ধ্রুবাগীতি রূপে প্রয়োগ করা হত।

একক বা সম্মিলিত উভয় ভাবেই ধ্রুবা গাওয়া হত; প্রধানত চচ্চৎপুট বা চাচপুট তালে এই গান গাওয়া হত। গীতের সব লক্ষণ এতে থাকত। যদিও ধ্রুবাকে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর গীত হিসাবে গণ্য করা হয়, তথাপি মূলত এটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গীত নয়—প্রচলিত পূর্বাংগগীতের অংশমাত্র। নাট্যানুষ্ঠান ছাড়া ধ্রুবাগীতি অনুষ্ঠানের রীতি ছিল না। সঙ্গীতের আসরে ধ্রুবা যে মূল গানের অংশবিশেষ সেটা সম্পূর্ণ গাইবার রীতি ছিল।

ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রের ৩২শ অধ্যায়ে ধ্রুবার সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন এই-ভাবে—

ধ্রুবা স্থানি তানি স্যুর্নারদ প্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ।
গীতাঙ্গহীন সর্বানি বিনিযুক্তানানেকশঃ॥
যা ঋচঃ পাণিকা গাথা সপ্তরূপাঙ্গমেব চ।
সপ্তরূপপ্রমাণং চ সা তধধ্রুবেত্যভিসংজ্ঞিতম॥

—নাট্যশাস্ত্র, ৩২।১-২

১। 'সঙ্গীতরত্নাকর'-এ বোলো প্রকার ধ্রুবাগীতির উল্লেখ আছে: জয়ন্ত, শেখর, উৎসাহ, মধুর, নির্মল, কুন্তল, কামল, চার, নন্দন, চন্দ্রশেখর, কামোদ, বিজয়, কন্দর্প, জয়মঙ্গল, তিলক, ললিত। শার্ঙ্গদেব ছাড়া তানজোরের রাজা রঘুনাথ নায়ক (১৭শ শতাব্দী) ধ্রুবা শ্রেণীর বোলো প্রকার সালগসূড় প্রবন্ধের সঙ্গে ধ্রুব প্রবন্ধ ব্যাখ্যা করেছেন ('সঙ্গীতসুধা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

২। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, উত্তরভাগ, কলিকাতা (১৩৬৩), পৃঃ ২৩২।

এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, ভরত তাঁর পূর্ববর্তী নারদ প্রমুখ শাস্ত্রকারদের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসরণ করে বলেছেন যে, ঋক্, পাণিকা, গাথা—এই তিন প্রকার গীতি এবং মদ্রক, উল্লোপ্যক, অপরান্তক, প্রকরী, ওবেণক, রোবিন্দক, উত্তর—এই সপ্তগীতকে ধ্রুবা বলে। এই সপ্তগীতির বহু অঙ্গ ছিল। সব কটি অঙ্গের প্রয়োগ ধ্রুবায় হত না। শুধু যে বিশেষ অঙ্গগুলি উদ্ধৃত করে নানা ছন্দে গাওয়া হত সেইগুলিকেই বলা হত ধ্রুবা।

এভ্যস্তঙ্গেভ্য উদ্ধৃতা নানা ছন্দঃকৃতানি চ।
ধ্রুবাত্বং যানি গচ্ছন্তি তানি বক্ষ্যাম্যহং দ্বিজাঃ॥

[নাট্যশাস্ত্র, ৩২ অধ্যায়]

এই অঙ্গগুলির উল্লেখ নাট্যশাস্ত্রে আছে। সেগুলি হল মুখ, প্রতিমুখ, [illegible] স্থির বা স্থিত, প্রবৃত্তি বা প্রবৃত্ত, বজ্র, সন্ধি, সংহরণ, প্রস্তার, উপবর্ত, [illegible]পাত, চতুরস্র, অবপাতন বা উপপাত, প্রবেশ্য বা প্রবেণী, শীর্ষক, সংপিষ্টক বা সংবিষ্টতা, অন্তাহরণ, মহাজনিক। এই অঙ্গগুলি ধ্রুবার কাব্যরূপকে গড়ে তোলে। ভরতের মতে, পরিগীতিকা, মদ্রক, চতুষ্পদা প্রভৃতি ধ্রুবার কলেবরকে পরিপুষ্ট করে।

বিচিত্র বৃত্ত থেকে সৃষ্ট ধ্রুবা পাঁচটি শ্রেণীতে বিকশিত—প্রাবেশিকী, নৈষ্ক্রামিকী, আক্ষেপিকী, প্রাসাদিকী এবং অন্তরা।[১] [ধ্রুবাশ্চ পঞ্চ বিজ্ঞেয়া নানা বৃত্তসমুদ্ভবাঃ"]

(১) নাটকের প্রস্তাবনায় বিচিত্র রস এবং ভাবের ব্যঞ্জনা দান করে যে ধ্রুবা গান করা হত তার নাম প্রাবেশিকী।

(২) নাটকের কোনও অঙ্কের শেষে পাত্রগণের নিষ্ক্রমণ উপলক্ষে যে ধ্রুবা গান করা হত তার নাম নৈষ্ক্রামিকী।

(৩) নির্দিষ্ট রসের বদলে অন্য রসের অবতারণা করে সেই বিজাতীয় রসের মধ্যে সাম্যসৃষ্টির প্রয়োজনে যে ধ্রুবা গান গাওয়া হত তার নাম প্রাসাদিকী।

১। (ক) নানারসার্থযোগঃ নৃণাং যো গীয়তে প্রবেশন্।
প্রাবেশিকী তু নাম্না বিজ্ঞেয়া সা ধ্রুবা তজ্জ্ঞৈঃ॥
(খ) অঙ্কান্তে নিষ্ক্রান্তে যা তু ভবেৎ প্রস্তুত অভিযোগে।
নিষ্ক্রামোপগতগুণা বিজ্ঞৈর্নৈষ্ক্রামিকীং তাং তু॥
(গ) ক্রমমুল্লঙ্ঘ্য বিধিজ্ঞৈঃ ক্রিয়তে যা দ্রুতলয়েন নাট্যবিধৌ।
আক্ষেপিকী ধ্রুবাসৌ দ্রুতা স্থিতা বাপি বিজ্ঞেয়া॥
(ঘ) যা চ রসান্তরমুপগতমাক্ষেপবশাৎ প্রসাদয়তি।
রসরাগপ্রসাদ জননীং জ্ঞেয়া প্রসাদিকী সা তু॥
(ঙ) বিষণ্ণে বিস্মৃতে ক্রুদ্ধে সুপ্তে মত্তেহথ সঙ্গতে।
গুরুভারাবসন্নে মূর্ছিতে পতিতে তথা॥
দোষ প্রচ্ছাদনে যা চ গীয়তে সান্তরা ধ্রুবা॥

[নাট্যশাস্ত্র, ৩২ অধ্যায়]

(৪) নৃত্যের সময় যথারীতি ক্রমভঙ্গ করে দ্রুতলয়ে যে ধ্রুবা গান গাওয়ার রীতি ছিল তার নাম আক্ষেপিকী।

(৫) বিষণ্ণতা, বিস্মৃতি, ক্রোধ, দর্প, মত্ততা, সঙ্গতা, গুরুভারে অবসন্নতা, মূর্চ্ছা, পতন, দোষ ঢাকা প্রভৃতি ব্যাপারে যে গান করা হত তাকে বলা হত অন্তরা।

এই পাঁচ প্রকার মূল ধ্রুবা। এছাড়া ছন্দ, বৃত্ত ও জাতিভেদ ধ্রুবার বিচিত্ররূপ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—তটি, ধৃতি, রজনী, ভ্রমরী, জয়া, বিদ্যুৎভ্রান্তা, ভূতলতন্বী, কমলমুখী, শিখা, ঘনপঙ্‌ক্তি, মালিনী, বিমলা, ভালা, রম্যা, ভীমা, নলিনী, নীলতোয়া, কামিনী, ভ্রমরমালা, ভোগবতী, মধুকরিকা, সমুদ্রা প্রভৃতি।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধ্রুবার পদ শঙ্করস্তুতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকত। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় ধ্রুবার পদ রচিত হত।

নাটকের বিভিন্ন পরিবেশে গাইবার জন্য আরও কয়েক প্রকার ধ্রুবা নির্দিষ্ট ছিল।

অপকৃষ্ট—বদ্ধ, নিরুদ্ধ, পতিত, ব্যথিত, মূর্চ্ছিত, মৃত প্রভৃতি করুণ পরিবেশে এই শ্রেণীর ধ্রুবা প্রয়োগ করা হত।

স্থিতা—উৎসুক্য, অবহিত, চিন্তিত, পরিবেদিত, শ্রম, দৈন্য, বিষাদ প্রভৃতি পরিবেশে এই ধ্রুবা গাওয়া হত।

দ্রুতা—আবেগযুক্ত এই ধ্রুবা অপকৃষ্ট ধ্রুবার মত করুণ পরিবেশে গাওয়ার রীতি ছিল। মৃত্যু ও আহত হবার প্রত্যক্ষ ঘটনা ঘটলে স্থিতা ধ্রুবা গাওয়া হত। বিষাদ, প্রমাদ, ক্রোধ, রৌদ্র, ভয়, বীরত্বপ্রকাশের ঘটনা ঘটলে দ্রুতা ধ্রুবার অনুষ্ঠান হত। শরসন্ধান, রোষপ্রকাশ প্রভৃতি ব্যাপারে গাওয়া হত অন্তরা ধ্রুবা।

শীর্ষক—এই ধ্রুবা দেবতা ও রাজাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

উদ্ধতা—এটিও দেবতা ও রাজাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে এটি প্রয়োগ করা হত রৌদ্র বা বীর রসাত্মক পরিবেশে।

অনুবন্ধ—যতি, লয়, বাদ্যের গতি, পদ, বর্ণ, স্বর, অক্ষর—এইগুলি যে ধ্রুবায় সম্বন্ধযুক্ত তার নাম অনুবন্ধ ধ্রুবা। নাট্যানুষ্ঠানের সময় নানা কারণে সাধারণভাবে এটি প্রয়োগ করা হত।

দ্রুতবিলম্বিতা—নাটকের গতি অব্যাহত রাখার জন্যে যা দ্রুত অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত, কিন্তু নাট্যধর্মের প্রয়োজনে যেটি বিলম্বিত হত। এই জাতীয় ধ্রুবাকে দ্রুতবিলম্বিত বলা হত।

অভিতা—শৃঙ্গার রসাত্মক পরিবেশে এই শ্রেণীর ধ্রুবার প্রয়োগ করা হত। এটি দিব্যা, রাজকীয় এবং গণিকা সকল প্রকার নারীর ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হত।

খঞ্জক এবং নর্কুট—এই দু-প্রকার শৃঙ্গার রসাত্মক ধ্রুবা গাওয়া হত। তবে এগুলি বিশেষত হাস্যরসাত্মক পরিবেশে এবং নীচ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হত।

যে সব ক্ষেত্রে ধ্রুবার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল, সেগুলির উল্লেখ ভরত করেছেন। গান গাইতে গাইতে, ক্রন্দনরত অবস্থায়, সম্ভ্রমাত্মক পরিস্থিতিতে, ঘোষণা অথবা গোলযোগের সময় এবং বিস্ময়কর পরিস্থিতিতে ধ্রুবার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। ধ্রুবা গীতির প্রয়োগ কোথায় কিভাবে হবে তার বিচার করতেন সংগীতাচার্য। ধ্রুবা প্রয়োগ করা হত অর্থবিধি, দেশ, কাল, ঋতু, প্রকৃতি, ভাবলিঙ্গ—এই সবের বিচার করে।

এই ধ্রুবাগীতির ভাষা ছিল শূরসেনী ("ভাষা তু শূরসেনী স্যাৎ ধ্রুবাণাং সম্প্রয়োজয়েৎ।"—নাট্যশাস্ত্র, ৩২ অধ্যায়)। সংস্কৃত গান দিব্যব্যাপারে নির্ধারিত ছিল। আর মানুষের ব্যাপারে নির্ধারিত ছিল অর্ধসংস্কৃত (অর্থাৎ দেশীয় ভাষা—মিশ্রিত সংস্কৃত)। অধম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আচরিত হত মাগধী ভাষা। ধ্রুবাগীতি যেমন পরিস্থিতি এবং চরিত্রের মানসিক অবস্থার পরিচয় দিত, তেমনি এই গীতগুলির মধ্য দিয়ে বিশেষ নাট্য সময়েরও সংকেত দেওয়া হত। গতি অর্থে প্রাবেশিকী এবং নৈষ্ক্রামিকী এই দু-প্রকার ধ্রুবাই প্রযোজ্য ছিল। প্রাবেশিকী পূর্বাহ্ন এবং নৈষ্ক্রামিকী দিন ও রাত্রি উভয় প্রকার কালই নির্দেশ করত। অবশ্য পূর্বাহ্ন নির্দেশের ব্যাপারে শান্ত বিষয় এবং মধ্যাহ্ন নির্দেশের ব্যাপারে উদ্দীপনাযুক্ত বিষয় প্রয়োগ করার নিয়ম ছিল। অপরাহ্ন নির্দেশের জন্য গাওয়া হত করুণরসাশ্রিত ধ্রুবা। চলনার্থে অর্থাৎ অশ্বক্রীড়া বা জলক্রীড়া প্রভৃতির ক্ষেত্রে আপেক্ষিকী গাইবার রীতি ছিল।

ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে ৬৪ রকমের ধ্রুবাগানের পরিচয় দিয়েছেন। এগুলি জাতি, স্থান, প্রমাণ, প্রকার ও নামভেদে ভিন্ন ভিন্ন ছিল।

সঙ্গীত-রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ নাটকে পঞ্চসন্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ ও উপসংহার। ভরতও অসারিত গীতি প্রসঙ্গে এগুলির উল্লেখ করেছেন এবং এই পাঁচটি সন্ধিতে প্রযুক্ত নাট্যগীতির পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তীকালে মতঙ্গ রচিত বৃহদ্দেশী গ্রন্থে এই পাঁচটির মধ্যে কোন সন্ধিতে কি রাগে গান করা হত তার পরিচয় পাওয়া যায় এবং পূর্বরঙ্গে যে রাগে গান করা হত তারও নাম পাওয়া যায়। এই রীতিও আদি নাট্যগ্রন্থ 'ব্রহ্মভরতম্'-এর অনুসরণেই লিখিত।

'মুখ' অর্থ, নাটকের প্রস্তাবনা। এতে মধ্যম-গ্রামরাগ গান করা হত। গর্ভে সাধারিত গ্রামরাগ, বিমর্শে পঞ্চমগ্রামরাগ এবং উপসংহার (নির্বহণ)-এ কৈশিক গ্রামরাগ গান করার রীতি ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় সঙ্গীতের কাঠামো

ভারতীয় সঙ্গীতের কাঠামো একদিনে গড়ে ওঠেনি। এই সঙ্গীত-কাঠামো সম্পর্কে প্রাচীন যুগের সঙ্গীতশাস্ত্রীরা লিখে রেখে গেছেন। নারদের শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে ভরতের নাট্যশাস্ত্র, মতঙ্গের বৃহদ্দেশী, শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত রত্নাকর-এ এ-সম্পর্কে অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটি বিশেষ বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করা হল।

নাদ

'নাদ'-এর অর্থ শব্দ। শ্বাস ব্যাহত হলে 'নাদ' তথা শব্দের সৃষ্টি হয়ঃ "শ্বাস নাদমাপদ্যতে।" এই জগৎ নাদাত্মক। নাদ ছাড়া স্বর, গীত বা নৃত্যের সৃষ্টি সম্ভব নয়। নাদ থেকেই বাকসর্বস্ব জগৎ পরিচালিত।

নাদ দু-প্রকারঃ আহত ও অনাহত। আহত নাদই সঙ্গীতের উৎপত্তিকারক। তাই সেটা মনোরঞ্জক।

নাদের আরও পাঁচটি প্রকারভেদ আছেঃ অতি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, পুষ্ট, অপুষ্ট, কৃত্রিম (সঙ্গীত রত্নাকর)।

স্বর

সহজ শব্দ বাইরে প্রকাশ পেলেই তা স্বর। স্বরের পরিচয় দিতে গিয়ে মতঙ্গ বলেছেন, রাগোৎপাদক ধ্বনি বা শব্দের নাম 'স্বর': "রাগজনকা ধ্বনিঃ স্বর ইতি।"

বৈদিক যুগে ছিল সামগানের সাত স্বর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, অতিস্বার্য ও ক্রুষ্ট, এবং লৌকিক সাত স্বর—ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। স্বরসংখ্যার তারতম্য অনুসারে গানগুলির বিচিত্র নাম হত। যেমন—

আর্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ গান। আর্চিকে একটি স্বর, গাথিকে দুটি, সামিকে তিনটি, স্বরান্তরে চারটি, ঔড়বে পাঁচটি, ষাড়বে ছয়টি এবং সম্পূর্ণতে সাতটি স্বর থাকত। বর্তমানে প্রথম চারটি লুপ্ত হয়েছে।

প্রয়োগ অনুসারে সঙ্গীতে চার প্রকার স্বরের উল্লেখ করা হয়েছে—বাদী, সমবাদী, বিবাদী এবং অনুবাদী।

বাদী—রাগে ব্যবহৃত যাবতীয় স্বরের মধ্যে যে স্বরের প্রয়োগ সর্বাপেক্ষা বেশি, সেই স্বরকেই বাদী স্বর বলা হয়। এক কথায় বলতে গেলে বাদী স্বরই রাগের বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলে। তাই রাগের মুখ্য স্বর বাদী স্বরকে রাজা বা প্রাণ স্বর বলা হয়।

সমবাদী—রাগে বাদী স্বর অপেক্ষা কম কিন্তু অন্যান্য স্বরের চেয়ে বেশি যে স্বরের প্রয়োগ, তাকেই বলা হয় সমবাদী।

বিবাদী—রাগে যে স্বর বর্জিত এবং যে স্বর রাগকে ভ্রষ্ট করে সেই স্বরকেই বলা হয় বিবাদী স্বর। যে স্বরের প্রয়োগে রাগের প্রকৃত রূপ বিকৃত হয়ে ওঠে, সেই স্বরই বিবাদী স্বর। কিন্তু ওস্তাদেরা কোনও কোনও সময় রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য বিবাদী স্বর প্রয়োগ করে থাকেন।

অনুবাদী—রাগে বাদী ও সমবাদী ব্যতীত অন্য ব্যবহৃত স্বরগুলিকে অনুবাদী স্বর বলা হয়।

শ্রুতি

নাদকে বাইশটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। এক একটি অংশ শ্রুতি নামে পরিচিত। শ্রবণ থেকেই এসেছে শ্রুতি শব্দটি। শ্রবণেন্দ্রিয় যে ধ্বনি গ্রহণে সমর্থ তাই শ্রুতি। শ্রুতির সংখ্যা ২২। এই ২২টি শ্রুতি সা রে গ ম প ধ নি—এই সাত স্বরে পরিব্যাপ্ত।

স্বরগুলির বাদী, সমবাদী প্রভৃতি নির্ণয় করার জন্য শ্রুতি বা শ্রুতিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়: "চতুর্বিধত্বমেতেষাং বিজ্ঞেয়ং শ্রুতিকেশতং।" শ্রুতি বলতে কি বোঝায় ভরত তা বলেননি। বিশ্বাবসু বলেছেন, শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ দিয়ে যে

সূক্ষ্ম (ধ্বনি) শব্দ শোনা যায় তাকে শ্রুতি বলে : "শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বাদ্ ধ্বনিরেব শ্রুতির্ভবেৎ।" শ্রুতি এক হতে পারে আবার অনন্তও হতে পারে। কোহল ২২টি থেকে ৬৬টি শ্রুতি হতে পারে বলেছেন। ভরত ২২টি শ্রুতির পক্ষপাতী। এই শ্রুতির নিদর্শন দিয়েছেন তিনি ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম দুটিকে আশ্রয় করে। কারণ তাঁর সময়ে গান্ধার গ্রামের ব্যবহার অপ্রচলিত ছিল (২য় শতাব্দী)। তিনি বলেছেন—"অথ দ্বৌ গ্রামৌ ষড়্জো মধ্যমশ্চেতি।
তদাশ্রিতা দ্বাবিংশতিঃ শ্রুতয়ঃ ॥"

ভরত, ষড়্জ ও মধ্যম—এই দুটি গ্রামের শ্রুতি নিরূপণ করেছেন দুটি সমান আকারের বীণা তথা বীণার তারের মাধ্যমে। বীণা দুটির মধ্যে একটি ছিল অচল বা ধ্রুববীণা, অপরটি চলবীণা।

শিক্ষাকার নারদ ৫টি রসানুবিদ্ধ শ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন : দীপ্তা, আয়তা, করুণা, মৃদু, মধ্যা। এই ৫ শ্রুতিকে ভিত্তি করে ভরত ২২ শ্রুতির উদ্ভাবন করেন :

দীপ্তা	আয়তা	করুণা	মৃদু	মধ্যা
[১] তীব্রা	[২] কুমুদ্বতী	[৫] দয়াবতী	[৩] মন্দা	[৪] ছন্দোবতী
	[৯] ক্রোধা	[১৭] আলাপিণী	[৭] রতিকা	[৬] রঞ্জনী
[৮] রৌদ্রী	[১১] প্রসারিণী	[১৮] মদন্তী	[১২] প্রীতি	[১৩] মার্জনী
[১০] বজ্রিকা	[১৬] সন্দীপনী		[১৪] ক্ষিতি	[১৫] রক্তা
[২১] উগ্রা	[১৯] রোহিণী			[২০] রম্যা
				[২২] ক্ষোভিণী

ভরত শ্রুতি বিভাগ বীণার সাহায্যে দেখিয়েছেন। ষড়্জ মধ্যম গ্রামের শ্রুতি সংখ্যা এক, কিন্তু স্বরস্থান ভিন্ন। তবে 'মধ্যম অবিনাশী'।

স্বর হল জনচিত্তে আনন্দবিধায়ক শ্রুতি থেকে উৎপন্ন ধ্বনি। স্বর শ্রুতি থেকে উৎপন্ন হয়। তাই শ্রুতি সম্বন্ধে আলোচনায় 'রাগবিবোধে' সোমনাথ বলেছেন—বক্ষের ঊর্দ্ধে ২২টি নাড়ি আড়াআড়িভাবে আছে। ২২টি নাড়ি, ২২টি শ্রুতি উৎপন্ন করে প্রত্যেকটি অপরটি হতে উচ্চতর সূক্ষ্ম স্বরে থাকে। শ্রুতি স্বরের নিষ্পাদক। শ্রুতি সকলের প্রয়োগও পরস্পর ব্যবধান নিয়েই স্বর-মণ্ডলী গঠিত। কণ্ঠোচ্চারিত ধ্বনির উৎপত্তির প্রথম মুহূর্তে যে অবস্থা তাই শ্রুতি। শ্রুতির ধ্বনি দীর্ঘস্থায়ী নয়। গ্রীক সঙ্গীতে ১৪টি শ্রুতি বিভাগ আছে। খ্রিঃ ২য় ও ৩য় শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের তামিল গানে ২৪টি শ্রুতির প্রচলন ছিল। ৭টি শুদ্ধ স্বর, ২২টি শ্রুতি থেকে নিম্নলিখিতভাবে উৎপন্ন হয়।

ষড়্জ গ্রাম		মধ্যম গ্রাম		গান্ধার গ্রাম	
১		১		১	
২		২		২	
৩		৩		৩	
৪	সা	৪	সা	৪	সা
৫		৫		৫	
৬		৬		৬	রে
৭	রে	৭	রে	৭	
৮		৮		৮	
৯	গ	৯	গ	৯	
১০		১০		১০	গ
১১		১১		১১	
১২		১২		১২	
১৩	ম	১৩	ম	১৩	ম
১৪		১৪		১৪	
১৫		১৫		১৫	
১৬		১৬	প	১৬	প
১৭	প	১৭		১৭	
১৮		১৮		১৮	
১৯		১৯		১৯	ধ
২০	ধ	২০	ধ	২০	
২১		২১		২১	
২২	নি	২২	নি	২২	

বীণার সাহায্যে শ্রুতি নির্ণয়

বাইশটি শ্রুতি গলায় পর পর দেখানো সম্ভব নয়। তাই বীণার সাহায্যে শ্রুতিগুলি পরিস্ফুট করা হয়েছে। এজন্য দুটি বীণার পরিকল্পনা করা হয়েছে। একটি ধ্রুববীণা আর একটি চলবীনা। দুটির নাদসাম্য হওয়া দরকার। দুটিতেই ২২টি করে তন্ত্রী। একটু চড়িয়ে ২২টি তার বাঁধতে হবে, অর্থাৎ প্রথম তার থেকে ২২তম তার পর্যন্ত উত্তরোত্তর চড়ে যাবে। এই এক একটি তারের শব্দই হচ্ছে এক একটি শ্রুতি।
দুটি বীণা শ্রুতি হিসেবে বাঁধার পর সপ্তক নির্ণয় করতে হবে। প্রথম থেকে চতুর্থ তার ষড়্জ অর্থাৎ সা। ষড়্জ স্বর চার শ্রুতিক। ষড়্জের থেকে তৃতীয় তার হচ্ছে ঋষভ বা রে। বীণার সপ্তম তারটি হচ্ছে রে। ঋষভ তিন শ্রুতিক। রে-এর পর থেকে দ্বিতীয় তার অর্থাৎ বীণার নবম তারটি গান্ধার বা গা। গান্ধার দুই শ্রুতিক। গান্ধারের পর থেকে চতুর্থ তার, অর্থাৎ ত্রয়োদশ তার মধ্যম বা মা। মধ্যম চার শ্রুতিক। মধ্যমের পর থেকে চতুর্থ তার অর্থাৎ সপ্তদশ তার পঞ্চম বা পা। পঞ্চম চার শ্রুতিক। পঞ্চমের পর থেকে তৃতীয় বা বিংশ তারটি ধৈবত বা ধা। ধৈবত দুই শ্রুতিক। ধৈবতের পর থেকে দ্বিতীয় অর্থাৎ দ্বাবিংশ তারটি হল নিষাদ বা নি। নিষাদ দুই শ্রুতিক।

দুটি বীণা এইভাবে বাঁধা হল। এর মধ্যে যেটি সুর বাঁধা অবস্থায় থাকল সেটি ধ্রুববীণা, অর্থাৎ এটা স্থির থাকবে। অপরটি চলবীণা। এই বীণার তন্ত্রীগুলি সারণা (চালনা) করা যায় বলেই এর নাম চলবীণা। ধ্রুববীণায় যে স্বরগুলি রয়েছে চলবীণার তন্ত্রীগুলিকে কিছুটা শিথিল করে সেই স্বরগুলিকে ওই বীণায় প্রদর্শন করতে হবে। এই শিথিল করার একটা নিয়ম আছে।

চলবীণার যে সাতটি স্বর স্থাপনা রয়েছে তাদের একটি শ্রুতি হিসেবে শিথিল করতে হবে। প্রথমে চলবীণার ২২তম তারটি নামিয়ে ধ্রুববীণার ২১তম তারের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে। এইভাবে চলবীণার অবশিষ্ট সব তারই এক এক শ্রুতি করে নেমে যাবে। এটি হল প্রথম সারণা।

এরপর চলবীণায় আর একটি শ্রুতি শিথিল করতে হবে। এটি দ্বিতীয় সারণা অর্থাৎ চলবীণার ২২তম তারকে ধ্রুববীণার ২০তম তারের সঙ্গে মেলাতে হবে। অপর তারগুলি এই নিয়মে নেমে আসবে। ধ্রুববীণার ২০তম তারে 'রম্যা' নামক শ্রুতিতে ধৈবত স্বরটি রয়েছে। চলবীণার ২২তম শ্রুতিতে প্রথমে ছিল নিষাদ। দুই শ্রুতি নামিয়ে দেবার ফলে এটি ধ্রুববীণার ধৈবতে প্রবেশ করল। অনুরূপভাবে চলবীণার মূল গান্ধারও দুই শ্রুতি নামিয়ে দেওয়ার দরুন ধ্রুববীণার ঋষভে প্রবিষ্ট হচ্ছে।

এরপর আর একটি শ্রুতি নামিয়ে দেওয়া হল। এটি হল তৃতীয় সারণা অর্থাৎ চলবীণার ২২তম তার যেটি ধ্রুববীণার ধৈবতের সঙ্গে মিলে গেছে। তাকে আরও নামিয়ে ধ্রুববীণার ১৯তম শ্রুতি রোহিণীর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হল। ফলে চলবীণার অন্যান্য তারগুলিও এই নিয়মে আরও এক এক শ্রুতি নেমে যাবে। এইবার দেখা যাবে চলবীণার মূল ২০তম তার ধ্রুববীণার ১৭তম তারের সঙ্গে মিলে গেছে, অর্থাৎ চলবীণার ধৈবত ধ্রুববীণার পঞ্চমে প্রবিষ্ট হয়েছে। এইভাবে চলবীণার মূল ঋষভ ধ্রুববীণার ষড়্জে প্রবেশ করবে।

এরপর চতুর্থ সারণা। তৃতীয় সারণার ফলে চলবীণার বাইশ নম্বর তার ধ্রুববীণার রোহিণী পর্যন্ত নেমে গেছে। এ থেকে আরও এক শ্রুতি নামিয়ে দিলে ওই তার ধ্রুববীণার ১৮তম শ্রুতি মদন্তীর সঙ্গে মিলে যাবে এবং অপর তারগুলি এক শ্রুতি করে নেমে যাবে। এখন দেখা যাবে চলবীণার মূল ১৭তম তার ধ্রুববীণার ১৩তম তারের সঙ্গে মিলে গেছে, অথাৎ চলবীণার পঞ্চম ধ্রুববীণার মধ্যমে প্রবিষ্ট হয়েছে। একইভাবে চলবীণার মূল মধ্যম ও গান্ধারে প্রবেশ করবে এবং চলবীণার মূল ষড়্জও ধ্রুববীণার মন্দ্রনিষাদে প্রবিষ্ট হবে।

এইভাবে চারটি সারণায় ধ্রুববীণার সাতটি স্বর বা ২২টি শ্রুতিই পাওয়া যাচ্ছে। চারটি শ্রুতি মন্দ্র তারে নামিয়ে দেওয়া সম্ভব। তার বেশি নীচে নামলে রঞ্জকত্ব থাকে না।

সারণা চতুষ্টয়ীর নক্সা।

শ্রুতি সংখ্যা	অচলবীণার স্বর স্থাপন	চলবীণার স্বর স্থাপন	চল বীণার সারণা চতুষ্টয়			
			১ম সারণা	২য় সারণা	৩য় সারণা	৪র্থ সারণা
২২	নি	নি	—	—	—	সা
১	—	—	—	—	সা	—
২	—	—	—	সা	—	—
৩	—	—	সা	—	—	রে
	সা	সা	—	—	রে	—
৫	—	—	—	রে	—	গ
৬	—	—	রে	—	গ	—
৭	রে	রে	—	গ	—	—
৮	—	—	গ	—	—	—
৯	গ	গ	—	—	—	ম
১০	—	—	—	—	ম	—
১১	—	—	—	ম	—	—
১২	—	—	ম	—	—	—
১৩	ম	ম	—	—	—	প
১৪	—	—	—	—	প	—
১৫	—	—	—	প	—	—
১৬	—	—	প	—	—	ধ
১৭	প	প	—	—	ধ	—
১৮	—	—	—	ধ	—	নি
১৯	—	—	ধ	—	নি	—
২০	ধ	ধ	—	নি	—	—
২১	—	—	নি	—	—	—

গ্রাম

গ্রাম প্রাচীন ঠাট বিশেষ। শ্রুতি ও স্বরের একত্র সমাবেশকে 'গ্রাম' বলে। চতুর্থ সপ্তম (৪+৩), নবম (৪+৩+২), ত্রয়োদশ (৪+৩+২+৪), সপ্তদশ (৪+৩+২+৪+৪), বিংশতিতম (৪+৩+২+৪+৪+৩), দ্বাবিংশতিতম (৪+৩+২+৪+৪+৩+২)—এই অবস্থায় ৭টি স্বর একটি হতে অপরটি উচ্চতর সূক্ষ্ম স্বরে অবস্থান করে স্বাতন্ত্র্যলাভ করছে (৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই ২২টি শ্রুতির সমবেত রূপ হচ্ছে গ্রাম। স্বরসংস্থাপনে ৪, ৭, ৯, ১৩, ১৭, ২০, ২২-এ বিভক্ত যে গ্রাম তাকে বলে ষড়্‌জ গ্রাম। যদি সপ্তদশ শ্রুতিকে ১৬শ শ্রুতিতে নামিয়ে আনা যায় তাহলে আমরা মধ্যম গ্রাম পাচ্ছি। অর্থাৎ ষড়্‌জ গ্রামে পঞ্চম চতুর্থ শ্রুতিতে থাকে এবং ধৈবত ত্রিশ্রুতিতে থাকে। মধ্যম গ্রামে পঞ্চম ত্রিশ্রুতিতে ও ধৈবত চতুর্থ শ্রুতিতে থাকে। ষড়্‌জ ও মধ্যম—এই ২টি গ্রাম প্রচলিত। ৩য় টিকে বলা হয় গান্ধার গ্রাম। এর বিভাগ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

স্বরের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য শ্রুতি বিভাগ করা হয়। এর ক্রমবিকাশ বলতে গেলে নাট্যশাস্ত্রেরই পূর্বে বা খ্রিঃ পূঃ শতাব্দীতে রাগ ও স্বরের ব্যবহার ছিল, কিন্তু স্বরের মাঝে মাঝে প্রথম শ্রুতির নির্দিষ্ট নাম বিভাগ পাই। নাট্যশাস্ত্রের শ্রবণযোগ্য সূক্ষ্ম স্বরের আবিষ্কারযোগ্য কল্পনা আমরা পাই না। রামায়ণেও জাতির পরিচয় আছে কিন্তু শ্রুতির কোনও উল্লেখ নেই। তবে রাগ যখন ছিল এবং থাকলেই যেহেতু স্বরের প্রয়োজন এবং স্বর থাকলেই শ্রুতির প্রয়োজন, তখন শ্রুতির আলোচনা না থাকলেও শ্রুতি অবশ্যই ছিল। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে শ্রুতি (শ্রুতি—জনক, স্বর—জন্য) অনুসারে ষড়্জাদির স্থান নির্দেশ করেছেন দুটি সমান দৈর্ঘ্যের বীণা নিয়ে। সঙ্গীতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বর নিরূপণ বা কম্পন যন্ত্রেই সঠিকভাবে করা যায়। তাই তিনি কণ্ঠসঙ্গীতের শ্রুতিকেও যন্ত্র দিয়েই নিরূপণ করেছেন।

গীতি

নাট্যশাস্ত্রের ৫ম অধ্যায়ে ভরত উল্লেখ করেছেন যে, যবনিকা উত্তোলন বা অপসারণের পর বাদ্যযন্ত্রে রাগালাপের (জাতিরাগ) সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য ও গীতের অনুষ্ঠান হত। পরে মদ্রক, বর্ধমানক গীতি ও তান্ডব নৃত্য হত। মদ্রক প্রকরাণাখ্য সাতটি গীতের অন্যতম। এককল, দ্বিকল ও চতুষ্কল ভেদে মদ্রক তিন শ্রেণীর। মদ্রকাদি গীতির সাধারণ লক্ষণ হল যে রাগ (গ্রামরাগ বা উপরাগ তথা ভাষারাগ) গান করা হয়। তার কারণ রূপে জাতিরাগে, অংশস্বরে বা বস্তুতে ন্যাস বা সমাপ্তি হয়। বর্ধমানক গীতি আসারিত থেকে সৃষ্ট। আসারিতের মত বর্ধমানক গীতিও অক্ষর, দ্বিকল ও চতুষ্কল ভেদে তিন প্রকার। কলার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষর বৃদ্ধিই হল বর্ধমানক গীতির একটি লক্ষণ। কুতপবিন্যাসের পর আসারিতের অনুষ্ঠান। গান, বাদ্য ও নৃত্যের সঙ্গে তালরক্ষা করার নাম আসারিত।

এ ছাড়া ভরত নির্গীত, সঙ্গীত, বহির্গীত এবং আর চার প্রকার গীতির উল্লেখ করেছেন।

এই চার প্রকার গীতি হল : (১) মাগধী, (২) অর্ধমাগধী, (৩) সম্ভাবিতা, (৪) পৃথুলা।

ভরত বলেছেন, গ্রহ বা অংশাদিযুক্ত জাতিরাগগুলি চিত্রা, আবৃত্তি ও দক্ষিণা —এই তিনটি বৃত্তির সহযোগে উপরোক্ত চারটি গীতি প্রয়োগ করা হত।

> "চতস্রোগীতয় কার্য্যা মাগধীহ্যর্ধমাগধী।
> সম্ভাবিতং তথৈবচ পৃথুলাচ প্রকীর্তিতা॥"

পূর্বরঙ্গের বা রঙ্গপীঠের বহির্ভাগে যবনিকা উত্তোলনের পর আসারিত, বর্দ্ধমানক প্রভৃতি গানের মত মগধ দেশ জাত মাগধী বা অর্দ্ধমাগধী গীতি গাওয়া হত: "মাগধী অথকর্ত্তব্যা অথবা চার্ধমাগধী।" সঙ্গীতরত্নাকরে শার্ঙ্গদেব বলেছেন,

মাগধিঃ ক্রমোচ্ছিত্র বৃত্তি দক্ষিণা গীতির পুনঃ
মাগধী সম্ভাবিতা চ পৃথুলেত্যাদিতাঃ ক্রমাৎ।"

যে বৃত্তিতে মাগধী গান করা হত তা অর্দ্ধকাল বিশিষ্ট হলে তাকে বলা হয় অর্দ্ধমাগধী। গুরু অক্ষর যুক্ত হলে তাকে বলা হয় সম্ভাবিতা, লঘু অক্ষর যুক্ত হলে তাকে বলে পৃথুলা। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে—

ভিন্নবৃত্তি প্রণীতা যা সা গীতিমাগধী মতা।
অর্দ্ধকালনিবৃত্তা চ বিজ্ঞেয়ার্দ্ধমাগধী॥
সম্ভাবিতা চ বিজ্ঞেয়া গুর্বক্ষর সমন্বিতা।
লঘু স্বকৃতা নিত্যা পৃথুলা সংপ্রকীর্তিতা॥ (নাট্যশাস্ত্র)

মাগধী গীতিতে বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এই তিনটি লয়ে, তিনটি যতিতে ও তিন রকম অক্ষরে গাওয়া হত। মাগধীতে ২১টি তালের সমাবেশ থাকত। "একোবিংশতি তালা চ মাগধী সংপ্রকীর্তিতা।" অর্দ্ধমাগধীতে তিনটি লয়, তিনটি যতি থাকত, কিন্তু তাল থাকত ১০টি। এই চার রকম গীতিতে পদ বা অক্ষর ও তালের প্রাধান্য থাকত। রাজা নান্যদেব "সরস্বতী হৃদয়ালঙ্কার"-এ বর্ণ কথার অর্থ করেছেন মাগধী প্রভৃতি গীতিঃ বর্ণএব গীতি সোঽপি মাগধ্যাদিঃ।

মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে বলেছেন (১৭৫।১৭৬ শ্লোকে) মাগধীর পদকে তিনবার আবৃত্তি করা হয় "ত্রি আবৃত্ত পদাম।" তাঁর মতে মাগধীর ২টি পদ গুরু, দুই মাত্রা বিশিষ্ট ও ২বার গান করা হয়। অর্দ্ধমাগধীর পদ লঘু ও দ্রুত এবং একমাত্রা বিশিষ্ট অর্থাৎ মাগধীর অর্দ্ধেক। সম্ভাবিতা ৪ মাত্রা বিশিষ্ট ও গুরু অক্ষর. পৃথুলা ৮ মাত্রা বিশিষ্ট ও লঘু অক্ষর। এই মাগধী প্রভৃতি ৪টি রীতি ব্রহ্মাভরত ও সদাশিব ভরতের সময়ও প্রচলিত ছিল বলে শাস্ত্রবিদগণ মনে করেন। মাগধী গীতি ইত্যাদি প্রসঙ্গে ভরত বলেন যে তিনি ব্রহ্মা ও সদাশিবের অনুকরণ করেছেন। গীতির পদ প্রায় শিবস্তুতিমূলক ছিল। মাগধীর তিনটি পদ তিনবার আবৃত্তি করে তিন লয়ে কেমন করে গাওয়া হত, শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত রত্নাকরে মাগধীর ব্যাখ্যায় সেটি বিশদভাবে বলা হয়েছে।

১। ম গ ম ধ
দে ০ বং ০

২। ধনি ধনি সা নি
দেও বং রু দ্রং

৩। রিগ রিগ মগ রিসা
দেবং রুদ্রং বও ন্দেও

প্রথম দেবং পদ বিলম্বিত লয়ে গেয়ে দ্বিতীয় বারে 'দেব' পদের সঙ্গে 'রুদ্রং' পদ যোগে মধ্যলয়ে তৃতীয় বারে দেবং রুদ্রং এর সঙ্গে বন্দে যোগে দ্রুত লয়ে গাওয়া হত। এ থেকে বোঝা যায় একটা গান তিনবার তিন রকম লয়ে গাওয়া হত। আচার্য অভিনবগুপ্ত এর একটু অন্যরকম স্বরলিপি করেন। মাগধী

গীতি ৩বার গাইতে হবে একথা অবশ্য বলেন। ত্রিরাবৃত্ত পদাং বদতি তাং মাগধী মাগধরাজ হৃদ্যাম।

গা মা ধা ধনি ধনি সানিসা রিগ রিগমা গরিসা
ব ন্দে দেবং রুদ্রং রূদ্রং দেবং রুদ্রং বন্দে

সম্ভাবিতা গীতির পদসংখ্যা ক কিন্তু গুরু বা যুক্ত অক্ষরের প্রাধান্য ছিল।

ধ মা মা রিগ রী গ না সা নী ধ সা নী ধা নী ম ম
ভ ০ ন্ত্যা ০ ০ দে ০ বং ০ রু ০ দ্র ং ০ ব ০ ন্দে ০

সম্ভাবিতা

প্রথম কলায় ভন্ত্যা, দেবং রুদ্রং বন্দে এ কয়টি শব্দ গাওয়া হত, দ্বিতীয় কলায় মধ্য পদ দুটি ২ বার গাওয়ার রীতি ছিল, যেমন দেবং দেবং রুদ্রং রুদ্রং। তৃতীয় কলায় প্রথম কলারই অনুবর্তন হত। পৃথুলায় অনেকগুলি লঘু অক্ষর ব্যবহৃত হত।

পৃথুলা

মা গা রী গা সা ধনি ধাধা ধা সা ধানী প নিধপ মা মা
স্মু র ন ত হ র০ পদ যু গ লং০ প্র ন ০ ০মত

এটিও ওই সম্ভাবিতার মত রীতিতে গাওয়া হত। সম্ভারিতা ও পৃথুলা গাইবার নিয়ম এক।

ষাড়জী এবং আর্ষভী নাটকের প্রথম অঙ্কে, নৈষ্ক্রামিকী ধ্রুবগানে ব্যবহৃত হয়।

জাতি রাগ

সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীকে তার প্রাণ বলে স্বীকার করা হয়। এই রাগগুলির ক্রমবিকাশ কেমন করে হল, পূর্ব সমাজে রাগ কি আকারে ছিল তা আলোচনা করলে আমরা ভরতের নাট্যশাস্ত্রের আগে নারদী শিক্ষার যুগে রাগের একটা স্পষ্ট ধারণা পাই। নারদী শিক্ষাতে ৭টি গ্রামরাগের নাম করা হয়েছে। এই গ্রামরাগগুলি জাতিরাগ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে বলেছেন, "জাতি সংভূতত্বাদ গ্রাম রাগাণামিতি।" সুতরাং জাতিরাগ গ্রামরাগেরও পূর্ববর্তী। নারদ কিন্তু শিক্ষায় জাতিরাগের কথা বলেননি। তিনি যে সাতটি গ্রামরাগের কথা বলেছেন, সেই সাতটি হল :

(১) সাধারিত, (২) পঞ্চম, (৩) কৈশিক, (৪) মধ্যম, (৫) কৈশিক মধ্যম, (৬) ষড়জগ্রাম, (৭) মধ্যমগ্রাম। রামায়ণে ৭টি শুদ্ধ জাতির কথা আছে। লবকুশ যখন রামচন্দ্রের সভায় রামায়ণ গান করেছিলেন তখন তাঁরা ৭টি জাতিরাগে গান গেয়েছিলেন।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ১৮টি জাতিরাগের কথা আছে। বর্তমানে যত রাগ সৃষ্টি হয়েছে বা অদূর ভবিষ্যতে হবে জাতিরাগই সবগুলির মূলে। রামায়ণে যে

৭টি জাতিরাগের কথা বলা হয়েছে ক্রমবিকাশের ধারা অবলম্বন করে সেই ৭টি শুদ্ধ ও বিকৃত হয়ে ১৮টি জাতিরাগে পরিণত হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের কিছু আগে থেকেই শিল্পী-সমাজ রাগগুলির সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়ে চলেছেন। এই ১৮টি জাতিরাগের যে যে লক্ষণ ভরত দিয়েছেন, রাগেরও সেইগুলি লক্ষণ। এই জাতিগুলি বিভিন্ন রসে ব্যবহার করা হত। ভরত জাতিরাগ দু-প্রকার বলেছেন : শুদ্ধ ও বিকৃত।

ষড়্জ গ্রাম

শুদ্ধ	বিকৃত
(১) ষড়্জী	(১) ষড়্জাদীচ্যবতী
(২) আর্ষভী	(২) ষড়্জী কৈশিক
(৩) ধৈবতী	(৩) ষড়্জ মধ্যা
(৪) নৈষাদী	

মধ্যম গ্রাম

শুদ্ধ	বিকৃত (গান্ধারদীচব্যা)
(১) গান্ধারী	(১) গান্ধারদীচব্যা
(২) মধ্যমা	(২) গান্ধার পঞ্চমী
(৩) পঞ্চমী	(৩) রক্ত গান্ধারী
	(৪) মধ্যমাদীচব্যা
	(৫) নন্দয়ন্তী
	(৬) কর্মারবী
	(৭) আন্ধ্রী
	(৮) কৈশিকী

এই ১৮টি জাতিরাগকে অন্যভাবে ভাগ করা যায়।
ষড়্জ গ্রামের সম্পূর্ণ রাগ ১টি, ষাড়ব ১টি, ঔড়ব রাগ ৫টি।

ষড়্জ গ্রাম

সম্পূর্ণ	ষাড়ব	ঔড়ব
(১) ষড়্জকৈশিকী	(১) ষাড়্জী	(১) আর্ষভী
		(২) ধৈবতী
		(৩) নৈষাদী
		(৪) ষড়্জ মধ্যা
		(৫) ষড়্জাদীচ্যবতী

মধ্যম গ্রাম

সম্পূর্ণ	ষাড়ব	ঔড়ব
(১) কর্মারবী	(১) গান্ধারোদীচ্যবা	(১) গান্ধারী
(২) গান্ধার পঞ্চমী	(২) আন্ধ্রী	(২) রক্তগান্ধারী
(৩) মধ্যমোদীচ্যবা	(৩) নন্দয়ন্তী	(৩) মধ্যমা
		(৪) পঞ্চমী
		(৫) কৈশিকী

১৮টি ষড়জ গ্রাম জাতিরাগের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

১। ষাড়জজাতি—ঔড়ব এবং ষাড়ব দুভাগে গাওয়া হত। যখন ঔড়ব বলে গাওয়া হত তখন নিষাদ এবং ঋষভকে বাদ দেওয়া হত। আর ষাড়ব বলে গাওয়া হলে শুধু নিষাদ বাদ দিয়ে গাওয়া হত। গান্ধার ও পঞ্চম অপন্যাস স্বর। ন্যাসস্বর অপন্যাস স্বরের মধ্যের স্বর। ধৈবত ও নিষাদের অল্পত্ব, গান্ধারের বহুত্ব। ষড়্জ গান্ধার ধৈবত এবং ষড়্জ ধৈবত একসঙ্গে চলে। অংশ স্বর ষড়্জ, গান্ধার পঞ্চম, মধ্যম, ধৈবত। নিষাদ এবং ঋষভকে যখন বাদ দেওয়া হয় তখনই পাঁচটি স্বরের গ্রহ বা অংশ হয়।

ভরত নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন—"ষাড়্জ্যাং অংশ স্বরাং পঞ্চ" অর্থাৎ ষাড়্জীতে অংশ স্বর ৫টি হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে নিষাদ যদি কাকলী নিষাদ হয় তাহলে অভিজাত দেশী রাগ বরাটির ছায়া আসে। ষড়্জ, গান্ধার, ধৈবত, নিষাদ যখন একসঙ্গে চলে তখন তাকে স্বরসংগতি বলে। এই ষাড়্জী রাগে বিকল, দ্বিকল বা চতুষ্কল হয়। যখন এককল হয় তখন চিত্রামার্গে সম্ভাবিতা গীতির প্রয়োগ হয়। নাটকের প্রথম অঙ্কে নৈষ্ক্রামিকি, ধ্রুবাগানে ষাড়্জী জাতিরাগের ব্যবহার হয়। গীতি প্রভৃতির পরিমাণ নির্দ্ধারক কাল বা সময়ের নাম তাল। তাল দু-রকমের—মার্গ ও দেশী তাল। মার্গ তালের ক্রিয়া দু-রকম : নিশব্দ ক্রিয়া ও সশব্দ ক্রিয়া। গীতি চার প্রকার : মাগধী, অর্দ্ধ মাগধী, সম্ভাবিতা, পৃথুলা। পূর্বকালে রঙ্গপিঠের বহির্ভাগে যে গান করা হত তাকে মাগধী বলা হয়। এই সময়ে আসারিত, বর্দ্ধমানক প্রভৃতি নামেও অন্য গান করা হত। অর্দ্ধমাগধী গীতির এই সময় গাইবার বিধান আছে। মাগধী ও অর্দ্ধমাগধী ধ্রুবা গানের পর্যায়ে পড়ে। মাগধী গীতি বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এই তিন প্রকার হয়। মাগধীতে কখনও ২০ তালের সমাবেশ হয়। মাগধীতে পদ বা অক্ষর ও তাল, উভয়েরই প্রাধান্য আছে। অর্থাৎ মাগধী গীতি পদাশ্রিত ও তালাশ্রিত।

২। আর্ষভী—ঋষভ, ধৈবত, নিষাদ, অপন্যাস এবং ন্যাস স্বর ঋষভ। আরোহণে পঞ্চমের অল্পত্ব, এই রাগ যখন ষাড়ব করে গাওয়া হয় তখন নিষাদ বর্জিত থাকে। আর ঔড়ব ব্যবহারে নিষাদ ও পঞ্চম বর্জিত এবং গান্ধারের বহুত্ব। ভরত নাট্যশাস্ত্রে জাতিরাগের লক্ষণ বলতে গিয়ে দশ লক্ষণকে রাগের প্রকৃতি নির্ণয় করার জন্য মাপকাঠি ধরে নিয়েছেন।

গ্রহ—ভরত নাট্যশাস্ত্রে জাতির দশ লক্ষণের মধ্যে অংশ এবং গ্রহ এ দুটি বিভিন্ন নাম হলেও দুটিকে বিকল্প বলেছেন। কল্লিনাথ বলেছেন, অংশ এবং গ্রহ দুই-ই যদি এক হয়, তাহলে গ্রহের সমস্ত ধর্ম অংশের ধর্মের মত। এদের ভরত দশ লক্ষণ বলেছেন কেন, তা তিনি নিজেই এরপর ব্যাখ্যা করেছেন। মতঙ্গ নজির সৃষ্টি করে বলেছেন যে অংশ মানে বন্দী, গ্রহ মানে বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী ও বিবাদী, আর অংশের আর একটি মানে হল ভাগ। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে মনে হয় যে স্বর এক জাতিরাগ থেকে আর এক [illegible]কে আলাদা করে দিচ্ছে। এই অংশের দশটি লক্ষণ ভরতের নাট্যশাস্ত্রে [illegible]।

([illegible]) [illegible]চিত্ত অনুরণিত করার ক্ষমতা আছে।
(২) যেখান থেকে জাতিরাগ আরম্ভ হয়েছে।
(৩) যি[illegible]রস ও ভাব সৃষ্টি করবার ক্ষমতা আছে।
(৪) অন্য স্বর অপেক্ষা বিশেষভাবে শ্রুত হয়।
(৫) মন্দ্র সপ্তকে ৫টি স্বর পর্যন্ত যেতে পারে।
(৬) অনেক স্বর দ্বারা পরিবেষ্টিত।
(৭) ন্যাস স্বর প্রকট।
(৮) অপন্যাস (৯) বিন্যাস (১০) সন্ন্যাস।

ন্যাস বলে সেখানে জাতিরাগ বা রাগের আলাপ বা বিকাশ হয়। অংশের সমাপ্তিতে ন্যাস ব্যবহৃত হয়। অপন্যাস একটির অংশের মধ্যে থাকে। অল্পত্ব বলতে যে স্বরটা কম লাগে তাকে বোঝায়। এই অল্পত্ব দু-রকম : অনভ্যাস ও লংঘন। সম্পূর্ণ বর্জন করার নাম অনভ্যাস। আর যেটা সামান্য ভাবে স্পর্শ করে তাকে বলে লংঘন।

৩। ধৈবতী—ধৈবতী জাতিতে ঋষভ। ধৈবত অংশ ও গ্রহ স্বর। ন্যাস স্বর ধৈবত। অপন্যাস ঋষভ। মধ্যম ও ধৈবত। ঔড়বে ষড়্জ ও পঞ্চম বর্জিত। ষাড়বে পঞ্চম বর্জিত। গান্ধারের বহুত্ব, আরোহণে নিষাদ এবং ঋষভের অল্পত্ব। বারটি কলা ব্যবহৃত হয়। প্রবেশিকা ধ্রুবাগানে ব্যবহার হয়।

৪। নৈষাদী—এই জাতিতে ঋষভ, গান্ধার, নিষাদ, অংশ এবং অপন্যাস। ন্যাস স্বর নিষাদ। ঔড়ব করে গাওয়া হলে ষড়্জ, পঞ্চম বর্জিত হয়। ষাড়বে পঞ্চম বর্জিত হয়। নৈষ্ক্রামিক ধ্রুবাগানে ব্যবহার হয়। দেশী শুদ্ধ সাধারিত রাগের ছায়া আসে।

৫। শুদ্ধ কৈশিকী—এই জাতিতে ষড়্জ, গান্ধার, পঞ্চম অংশ স্বর। ষড়্জ, পঞ্চম ও নিষাদ অপন্যাস, গান্ধার ন্যাস স্বর। ঋষভ ও ধৈবতের অল্পত্ব, সম্পূর্ণ জাতির রাগ।

৬। ষাড়্জাদীচ্যবা—এই জাতিতে ষড়্জ, ধৈবত, মধ্যম ও নিষাদ অংশ স্বর। ন্যাস স্বর মধ্যম, অপন্যাস ষড়্জ ও ধৈবত। ঔড়ব করে গাওয়া হয় হলে ঋষভ ও পঞ্চম বর্জিত। ষাড়বে ঋষভ বর্জিত হয়। গান্ধারের বহুত্ব।

৭। ষড়জমধ্যমা—এই জাতির সকল স্বরই অংশ ও গ্রহ। আবার অপন্যাস স্বরও হতে পারে। ষড়জ ও মধ্যম ন্যাস স্বর। ঔড়বে গান্ধার ও নিষাদ বর্জিত। ষাড়বে নিষাদ বর্জিত।

৮। গান্ধারী—গান্ধারী জাতিতে ষড়জ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত—এই পঞ্চস্বরই অংশ এবং গ্রহ হতে পারে। ঔড়ব ষাড়ব দুভাবেই গাওয়া হয়। যখন ঔড়ব করে গাওয়া হয় তখন ধৈবত ও ঋষভ বর্জিত হয়। ষাড়ব করে গাওয়া হলে ঋষভ বর্জিত হয়। ঋষভ ও ধৈবতের অল্পত্ব, ন্যাস স্বর গান্ধার। অপন্যাস ষড়জ ও পঞ্চম। গান্ধারী জাতিরাগে ১৬টি কলা ও চচ্চৎপুট তালের ব্যবহার হয়। প্রবেশিকা ধ্রুবায় এর ব্যবহার হয়।

৯। রক্ত গান্ধারী—এর অংশ এবং ন্যাস স্বর ষাড়ব ও ঔড়বে। এর বিচার একেবারে গান্ধারীর মত। ধৈবত ও নিষাদের বহুত্ব এবং অপন্যাস হল মধ্যম।

১০। গান্ধারোদীচ্যবা—এই জাতি রাগের অংশ গ্রহ, ষড়জ ও মধ্যম। এই জাতি রাগ কেবল ষাড়ব করে গাওয়া হয়। ঔড়বের ব্যবহার নেই। যখন ষাড়ব করে গাওয়া হয় তখন ঋষভ বর্জিত হয়। গান্ধারের বহুত্ব, ন্যাসস্বর মধ্যম, অপন্যাস ষড়জ, ধৈবত।

১১। মধ্যমা—মধ্যমার গ্রহ এবং অংশ ষড়জ, ঋষভ, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত। ন্যাসস্বর মধ্যম, এই পাঁচটি স্বর, অপন্যাস ও দেশী গান্ধারী রাগের ছায়া আসে। গান্ধার ও নিষাদের অল্পত্ব। যখন ঔড়ব করে গাওয়া হয় তখন গান্ধার ও নিষাদ বর্জিত হয়। ষাড়ব করে গাওয়া হলে গান্ধার বর্জিত। ষড়জ ও মধ্যমের বহুত্ব।

১২। মধ্যমাদীচ্যবা—এই জাতিতে গ্রহ ও অংশ স্বর পঞ্চম। আর সমস্ত লক্ষণ গান্ধারোদীচ্যবার মত।

১৩। পঞ্চমী—পঞ্চমীতে ঋষভ ও পঞ্চম অংশ ও গ্রহ। অপন্যাস, ঋষভ পঞ্চম ও নিষাদ। ন্যাসস্বর পঞ্চম। ঔড়ব করে গাওয়া হয় বলে নিষাদ বর্জিত। ষাড়বে গান্ধার বর্জিত। নিষাদের অল্পত্ব।

১৪। গান্ধারপঞ্চমী—এই জাতির অংশ স্বর পঞ্চম। অপন্যাস, পঞ্চম ঋষভ। ন্যাসস্বর গান্ধার। ঔড়ব করে গাওয়া হয় বলে নিষাদ বর্জিত। ষাড়বে গান্ধার বর্জিত। নিষাদের অল্পত্ব। আটটি কলা ও চচ্চৎপুট তাল।

১৫। আন্ধ্রী—এই জাতিতে ঋষভ পঞ্চম গান্ধার ও নিষাদ অংশ এবং অপন্যাস। ন্যাসস্বর গান্ধার। ষাড়বে ষড়জ বর্জিত করে গাওয়া হয়। ঔড়বের ব্যবহার নেই। আরোহণে ধৈবত ও নিষাদের বহুত্ব। ষড়জের অল্পত্ব।

১৬। নন্দয়ন্তী—এই জাতিতে অংশ স্বর পঞ্চম। অপন্যাস মধ্যম ও পঞ্চম। ষাড়ব করে গাওয়া হলে ষড়জ বর্জিত হয়।

১৭। কর্মারবী—ঋষভ, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ গ্রহ অংশ এবং অপন্যাস। ন্যাস স্বর পঞ্চম। সম্পূর্ণ জাতি রাগ।

১৮। কৈশিক—গান্ধার এবং নিষাদ ন্যাসস্বর। ঋষভ ব্যতীত সকল স্বর অংশ

ও অপন্যাস। যখন ধৈবত ও নিষাদ অংশ স্বর হয় তখন পঞ্চম ন্যাসস্বর হয়। ঋষভ ও ঔড়ব দুই ভাবে গাওয়া হয়। ষাড়বে ঋষভ বর্জিত হয়। ঔড়বে ঋষভ ও ধৈবত বর্জিত। ষড়জ ও পঞ্চমের বহুত্ব। ঋষভের অল্পত্ব।

মূর্চ্ছনা

স্বরের আরোহণ অবরোহণ থেকেই মূর্চ্ছনার সৃষ্টি। ভরত বলেছেন, "ক্রমযুক্তা স্বরাঃ সপ্ত মূর্চ্ছনাস্ত্বভিসংজ্ঞিতাঃ।" অর্থাৎ ক্রমযুক্ত সাতটি স্বরই মূর্চ্ছনা। মতঙ্গ তান ও মূর্চ্ছনার উল্লেখ করে বলেছেন, "মূর্চ্ছনারোহ ক্রমেন তানোঽবরোহ ক্রমেন ভবগীতি ভেদঃ"—অর্থাৎ মূর্চ্ছনার বিকাশ ও গতি সর্বদা আরোহণ হতে প্রকাশিত হয়। যে কোনও স্বর থেকে সাত স্বরের আরোহণ-অবরোহণকে মূর্চ্ছনা বলা হয়। প্রথম মূর্চ্ছনা ষড়জ গ্রামের সা থেকে আরম্ভ হলে ষড়জ গ্রামের প্রধান সাতটি স্বরের মূর্চ্ছনা হয় সা৪, রে৩, গ২, ম৪, ধ৩, নি২ এবং এটি বর্তমান কাফী ঠাটের অনুরূপ। দ্বিতীয় মূর্চ্ছনা বলতে মন্দ্র নিষাদ থেকে আরম্ভ করলে সা২, রে৪, গ৩, ম২, প৪, ধ৪, নি৩ হবে এবং এটি বর্তমান বিলাবল ঠাটের মত হবে। তৃতীয় মূর্চ্ছনাতে ধৈবতকে সা ধরলে সা৩, রে২, গ৪, ম৩, প২, ধ৪, নি৪ হয় এবং এটি বর্তমান ভৈরবী ঠাটের অনুরূপ। চতুর্থ মূর্চ্ছনায় প কে সা ধরলে সা৪, রে৩, গ২, ম৪, প৩, ধ২, নি৪ হবে এবং এটি বর্তমান আশাবরী ঠাটের অনুরূপ। এইভাবে প্রাচীন কালে তিনটি গ্রামে ২১টি মূর্চ্ছনা ছিল।

নারদ ২১টি মূর্চ্ছনার পরিচয় দিয়েছেন। ভরত বলেছেন, "অথ মূর্চ্ছনা দ্বৈগ্রামিক্যশ্চতুর্দশ"—এ উক্তি প্রমাণ করে যে ভরতের সময় ষড়জ গ্রাম এবং মধ্যম গ্রাম—এই দুটি গ্রামে (প্রত্যেকটিতে ৭টি করে) মোট ১৪টি মূর্চ্ছনা ছিল। ভরত এই মূর্চ্ছনাগুলির নাম উল্লেখ করেছেন এবং তাদের পরিচয় দিয়েছেন। ভরত বলেছেন, "ষাড়বৌড়ুবিতসংজ্ঞিতাঃ পূর্ণা সাধারণকৃতাশ্চেতি চতুর্বিধশ্চতুর্দশ মূর্চ্ছনা।" ষড়জ গ্রামের মূর্চ্ছনার নাম—উত্তর মন্দ্রা, রজনী, উত্তরায়তা, শুদ্ধ ষড়্জা, মৎসরীকৃতা, অশ্বক্রান্তা ও অভিরুদ্গতা। মধ্যমগ্রামের মূর্চ্ছনার নাম—সৌবীরি, হরিনাশ্বা, কলোপনতা, শুদ্ধমধ্যা, মার্গবী, পৌরবী, হৃষ্যকা। মতঙ্গের মতে, "স চ মূর্চ্ছনা দ্বিবিধা সপ্তস্বর মূর্চ্ছনা, দ্বাদশ স্বর মূর্চ্ছনা চেতি।" অর্থাৎ তিনি সাত স্বর এবং দ্বাদশ স্বর—এই ২ প্রকার মূর্চ্ছনা স্বীকার করেছেন। এছাড়া পূর্ণা (সাত স্বরের), ষাড়বা (ছ স্বরের), ঔড়ুবা (পাঁচ স্বরের) ও সাধারণা (অন্তর গান্ধার এবং কাকলি নিষাদ যুক্ত)—এই চার শ্রেণীর মূর্চ্ছনা তো আছেই।

পাঁচটি বিকৃত স্বরের বিকাশ ঠিক কখন হয়েছিল বলা যায় না। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের যুগে কাকলী নিষাদ ও অন্তরগান্ধার—এই দুটি মাত্র বিকৃত স্বর পাওয়া যায়। তাহলে ভরতের যুগে ৯টি স্বর পাওয়া যাচ্ছে। যখন গান্ধার মধ্যমের প্রথম শ্রুতি নেয় ১০, তখন তাকে বলা হয় সাধারণ গান্ধার, আর যখন

গান্ধার মধ্যমের ২টি শ্রুতি (যা একটি আস্ত স্বর সমস্বরে) নেয় তখন তাকে বলা হয় অন্তর গান্ধার। যখন নিষাদ ষড়জের প্রথম শ্রুতি নেয় ১, তাকে বলা হয় কৈশিকী নি, আর যখন নিষাদ ষড়জের প্রথম দুটি (১+২) শ্রুতি নেয় তখন তাকে বলা হয় কাকলী নিষাদ।

সপ্তস্বরের মূর্চ্ছনা চার প্রকারঃ (১) পূর্ণা, (২) ষড়ব, (৩) ঔড়বিতা, (৪) সাধারণা (দক্ষিণ ভারতীয়)। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' এবং মতঙ্গের 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থেও আমরা তাই পাই। প্রসঙ্গত বলা যায় যে প্রাচীন সঙ্গীতে 'সা' 'পা' স্বর-এর বিকৃত স্বর হত। তাকে মৃদু 'সা' এবং মৃদু 'প' বলা হত। দ্বাদশ স্বর মূর্চ্ছনা বলতে তাঁরা কি মনে করেছেন তা স্পষ্ট বোঝা যায় না।

চার প্রকার সপ্তস্বর মূর্চ্ছনা

(১) পূর্ণা—৭টি স্বরের দ্বারা যখন আরোহণ-অবরোহণ করা হয় তাকে পূর্ণা বলে।

(২) ষাড়ব—৬টি স্বরের দ্বারা আরোহণ-অবরোহণ করাকে ষাড়ব বলে।

(৩) ঔড়বিতা—৫টি স্বরের দ্বারা আরোহণ-অবরোহণ করাকে ঔড়বিতা বলে।

(৪) সাধারণ—কাকলী ও অন্তর দ্বারা আরোহণ-অবরোহণ করাকে সাধারণ বলে।

ষড়জ গ্রাম এবং মধ্যম গ্রাম মিলিয়ে ৭টি করে মোট ১৪টি মূর্চ্ছনা আছে। ষড়জ গ্রাম এবং মধ্যম গ্রামের ১৪টি মূর্চ্ছনাকে "শুদ্ধ মূর্চ্ছনা" বলে। প্রত্যেক প্রকার মূর্চ্ছনা আবার ৪ প্রকার হয়ঃ (১) শুদ্ধ, (২) সকাকলী, (৩) সান্তর, (৪) সকাকল্যন্তর।

(১) শুদ্ধ—আরোহন সা রে গা পা মা ধা নি |
নি ধা পা মা গা রে সা (অবরোহণ)

(২) সকাকলী—সা রে গা মা পা ধা নি (কাকলী) | নি (কাকলী) ধা পা মা গা রে সা

(৩) সান্তর—সা রে গা (অন্তর গা) মা পা ধা নি | নি ধা পা মা গা (অন্তর "গা") রে সা।

(৪) সকাকল্যন্তর—সা রে গা (অন্তর "গা") মা পা ধা নি (কাকলী "নি") : নি (কাকলী "নি") ধা পা মা গা (অন্তর গা) রে সা।

সুতরাং—১৪টি শুদ্ধ মূর্চ্ছনা এবং এই ৪টি মূর্চ্ছনা মিলে মোট—
১৪ × ৪ = ৫৬টি মূর্চ্ছনা হতে পারে। সকল প্রকার মূর্চ্ছনাদি ভেঙে ৯ রকম মূর্চ্ছনা দেখা যায়।

	আরোহণ			অবরোহণ		
(১) সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ	৭	স্বর	যুক্ত	৭	স্বর	যুক্ত
(২) „ —ষাড়ব	৭	„	„	৬	„	„
(৩) „ —ঔড়ব	৭	„	„	৫	„	„
(৪) ষাড়ব—সম্পূর্ণ	৬	„	„	৭	„	„
(৫) „ —ষাড়ব	৬	„	„	৬	„	„
(৬) „ —ঔড়ব	৬	„	„	৫	„	„
(৭) ঔড়ব—সম্পূর্ণ	৫	„	„	৭	„	„
(৮) „ —ষাড়ব	৫	„	„	৬	„	„
(৯) „ —ঔড়ব	৫	„	„	৫	„	„

এক একটি গ্রামের ২য় স্বর ও ৩য় স্বর প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে গ্রহণ করলে এক-একটি মূর্চ্ছনার ৭টি আরোহণ ক্রম পাওয়া যায়। যেমন—সা রে গা মা পা ধা নি, একটি ক্রম, রে গা মা পা ধা নি সা আর-একটি ক্রম ইত্যাদি। তাহলে আমরা মূর্চ্ছনার ক্রম পাচ্ছি—৫৬ × ৭ = ৩৯২টি।

ষড়জ গ্রামের মূর্চ্ছনা : (শুদ্ধ মূর্চ্ছনা)

সংগীতরত্নাকর নারদমত আরোহন অবরোহন প্রচলিত ঠাটের অনুরূপ

১। উত্তরমন্দ্রা—উত্তরবর্ণা সারেগমপধনি নিধপমগরেসা সারেগমপ-ধনি—কাফি।

২। রজনী—অভিরুদ্গতা নিসারেগমপধ ধপমগরেসানি সারেগম-পধনি—বিলাবল।

৩। উত্তরায়তা—অশ্বক্রান্তা ধনিসারেগমপ পমগরেসানিধ সারেগ-মমধনি।

৪। শুদ্ধষড়জা—সৌবিরী পধনিসারেগম মগরেসানিধপ সারেগম-পধনি—জৌনপুরী বা প্রচলিত আশাবরী।

৫। মৎসরীকৃৎ—হৃষ্যকা মপধনিসারেগ গরেসানিধপম সারেগমপ-ধনি—খাম্বাজ।

৬। অশ্বক্রান্তা—উত্তরায়তা গমপধনিসারে রেসানিধপমগ সারেগ-মপধনি—কল্যাণ।

৭। অভিরুদ্গতা—রজনী রেগমধনিসা সানিধপমগরে সারেগম-পধনি—ভৈরবী।

শাস্ত্রে মূর্চ্ছনার স্বরূপ প্রকাশ করা হয় এইভাবে – সা রে গ ম প ধ নি ধ প ম গ রে সা। আরোহণ অবরোহণ দেখাবার (উপরে) শুদ্ধ প্রতিটি মূর্চ্ছনার অন্ত্যস্বর দু'বার লেখা হল।

মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা: (শুদ্ধ মূর্চ্ছনা)

সঙ্গীতরত্নাকর নারদমত আরোহণ অবরোহণ প্রচলিত ঠাটের অনুরূপ।

১। সৌবিরী—আপ্যায়নী মপধনিসারেগ গমেরেসানিধপম সারেগম-পধনি—খাম্বাজ।

২। হারিনাশ্বা—বিশ্বহৃতা গমপধনিসারে রেসানিধপমগ সারেগর্ম-পনি—কল্যাণ।

৩। কলোপণতা—চন্দ্রা রেগমপধনিসা সানিধপমগরে সারেগ্‌মপ-ধ্‌নি—ভৈরবী।

৪। শুদ্ধমধ্যা—হেমা সারেগমপধনি নিধপমগরেসা সারেগ্‌মপধনি—কাফি।

৫। মার্গী—কপৰ্দ্দিনী নিসারেগমপধ ধপমগরেসানি সারেগমপধনি—বিলাবল।

৬। পৌরবী—মৈত্রী ধনিসারেগমপ পমগরেসানিধ, সারেগ্‌মপধনি।

৭। হৃষ্যকা—চন্দ্রাবতী পধনিসারেগম মগরেসানিধপ সারেগমপধনি—জৌনপুরী অথবা প্রচলিত আশাবরী।

গান্ধার গ্রামের মূর্চ্ছনা

(১) নন্দা—
(২) বিশালা—
(৩) সুমুখী—
(৪) বিচিত্রা—
(৫) রোহিণী—
(৬) সুখা
(৭) আলাপা—

এই গ্রামটি ভরতের সময় অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য তিনি তার কোন বর্ণনা করেননি। তবে গান্ধার গ্রামে মূর্চ্ছনার প্রয়োগ করা হত।

যখন গান্ধার মধ্যমের প্রথম দুটি শ্রুতিকে নেয়, তখন তাকে অন্তর "গা" বলে। যখন নিষাদ ষড়জের প্রথম দুটি শ্রুতিকে নেয় তখন তাকে কাকলী "নি" বলে।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত থেকে আরম্ভ করে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মূর্চ্ছনা দিয়ে রাগ নির্ণয় করা হত। মূর্চ্ছনার প্রকৃত অর্থ ঠাট। প্রাচীনকালে সঙ্গীত-শাস্ত্রীরা রাগ বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রহ, অংশ, ন্যাসস্বরের কথা বলেছেন। সুতরাং সে সময় মূর্চ্ছনার কথা বললেই রাগ নির্ণয় করা হত।

তান ও মূর্চ্ছনার তফাৎ

বর্তমান সঙ্গীতে গোটা মূর্চ্ছনাকেই আমরা তানের অন্তর্ভুক্ত করেছি। পূর্বে তান বলতে এই জিনিসটি বোঝাত না। শুদ্ধ মূর্চ্ছনার আরোহণক্রম থেকে একটি বা দুটি স্বরের লোপ বা অপকর্ষ করে শুদ্ধ তান করা হত। শুদ্ধ মূর্চ্ছনায় একটি স্বরের লোপ করলে সেটি হল ষাড়ব, আর দুটি লোপ করলে সেটি হল ঔড়ব। এই ষাড়ব এবং ঔড়বীকৃত শুদ্ধ মূর্চ্ছনাই হচ্ছে তান। সমস্ত মূর্চ্ছনাই তান হতে পারে। কিন্তু সব তান মূর্চ্ছনা হতে পারে না, কারণ মূর্চ্ছনায় সবসময় ৭টি স্বর থাকা চাই।

শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শার্ঙ্গদেব চারটি স্বর সাধারণের কথা কথা উল্লেখ করেছেন। ভরতের সময় বিকৃত স্বর হিসেবে আমরা পাই অন্তর গান্ধার ও কাকলী নিষাদ (গান্ধার ও নিষাদের বিকৃত রূপ)। শার্ঙ্গদেবের সময় 'ষড়জ' ও 'মধ্যমের' বিকৃত রূপ দেখা যায়, শুধু তাই নয় শার্ঙ্গদেব ষড়জ ও পঞ্চমেরও বিকৃত ভাব স্বীকার করেছেন। তিনি "সঙ্গীত রত্নাকর"-এ বলেছেন—"ত এব বিকৃতাবস্থা দ্বাদশ প্রতিপাদিতা" অর্থাৎ শুদ্ধ ৭ স্বর বিকৃত হয়ে ২২টি স্বরে পরিণত হয়। কেননা স্থানচ্যুতি বা শ্রুতিভেদের জন্যই এই বিকৃতি দেখা যায়। যেমন—ষড়জ চ্যুত এবং অচ্যুত—এইভাবে বিকৃত হয়। সাধারণভাবে ষড়জ হচ্ছে চতুঃশ্রুতিক। এর প্রথম শ্রুতি তীব্রা, দ্বিতীয় কুমুদ্বতী, তৃতীয় মন্দা, চতুর্থ ছন্দবতী। ষড়জ এই চতুর্থ শ্রুতি অর্থাৎ ছন্দবতীতে স্থাপিত। এখান থেকে অচ্যুত হয়ে তৃতীয় শ্রুতি মন্দায় অবস্থিত হলেই ষড়জকে চ্যুত বলে গণ্য করতে হবে।

অথবা—ষড়জ ৩ শ্রুতি যুক্ত। কিন্তু যখন সে ষড়জের ৪র্থ শ্রুতি গ্রহণ করে ৪ শ্রুতি সম্পূর্ণ হয় তখনই তা বিকৃত হয়। এইভাবে আমরা ১২টি বিকৃত স্বর পাই। নিম্নে শার্ঙ্গদেবের অনুসরণে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের তালিকা দেওয়া হল।

১—কৈশিক নিষাদ	—	শ্রুতি	=	৩	(বিকৃত)
২—কাকলী নিষাদ	—	শ্রুতি	=	৪	(বিকৃত)
৩—চ্যুত ষড়জ	—	শ্রুতি	=	৩	(বিকৃত)
৪—শুদ্ধ ষড়জ	—	শ্রুতি	=	৪	(শুদ্ধ)
৫—অচ্যুত ষড়জ	—	শ্রুতি	=	২	(বিকৃত)
৬—শুদ্ধ ঋষভ	—	শ্রুতি	=	৩	(শুদ্ধ)
৭—বিকৃত ঋষভ	—	শ্রুতি	=	৪	(বিকৃত)
৮—শুদ্ধ গান্ধার	—	শ্রুতি	=	২	(শুদ্ধ)
৯—বিকৃত গান্ধার	—	শ্রুতি	=	৩	(বিকৃত)
১০—অন্তর গান্ধার	—	শ্রুতি	=	৪	(বিকৃত)
১১—চ্যুত মধ্যম	—	শ্রুতি	=	৪	(বিকৃত)
১২—শুদ্ধ মধ্যম	—	শ্রুতি	=	৪	(শুদ্ধ)
১৩—অচ্যুত মধ্যম	—	শ্রুতি	=	২	(বিকৃত)
১৪—শুদ্ধ পঞ্চম	—	শ্রুতি	=	৪	(শুদ্ধ)
১৫—বিকৃত পঞ্চম	—	শ্রুতি	=	৩	(বিকৃত)
১৬—শুদ্ধ পঞ্চম	—	শ্রুতি	=	৪	(শুদ্ধ)
১৭—কৈষিক পঞ্চম	—	শ্রুতি	=	৩	(বিকৃত)
১৮—শুদ্ধ ধৈবত	—	শ্রুতি	=	৪	(শুদ্ধ)
১৯—বিকৃত ধৈবত	—	শ্রুতি	=	২	(বিকৃত)
২০—শুদ্ধ নিষাদ	—	শ্রুতি	=	২	(শুদ্ধ)

গায়কের দোষগুণ

শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্যই শিল্পীর গান। কিন্তু এই গান করতে হলে কতকগুলি গুণ আয়ত্ত করতে হয় এবং কতকগুলি দোষ বর্জন করতে হয়। তা নাহলে সঙ্গীত পরিবেশন সুন্দর হয় না।

শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকর-এ এ-সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মূল শ্লোকগুলি ও ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হল।

হৃদ্যশব্দঃ সুশারিরো গ্রহমোক্ষবিচক্ষণঃ
রাগ রাগাঙ্গভাষাঙ্গক্রিয়াঙ্গোপাঙ্গ কোবিদঃ ॥
প্রবন্ধগান নিষ্ণাতো বিবিধালপ্তিতত্ত্ববিৎ।
সর্ব্বস্থানোচ্চগমকেষ্বনায়াসলসদ্গতিঃ ॥

আয়ত্তকণ্ঠ স্তালজ্ঞঃ সাবধানো জিতশ্রমঃ।
শুদ্ধছায়ালগাভিজ্ঞঃ সর্ব্বকাকুবিশেষবিৎ॥
অপার স্থায়সঞ্চারঃ সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ।
ক্রিয়াপরোহজস্রলয়ঃ সুঘটো ধারণান্বিতঃ।
স্ফূর্জন্নির্বনো হারিরহঃ কৃদ্‌ভজনোদ্ধুরঃ।
সুসম্প্রদায়ো গীতজ্ঞৈ গীয়তে গায়নাগ্রণোঃ॥

১। হৃদ্যশব্দ—সমধুর কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট।

২। সুশারীর—যে গায়কের কণ্ঠস্বর অভ্যাস ছাড়াই রাগবিশেষের স্বরূপ প্রকাশ করতে সমর্থ।

৩। গ্রহ মোক্ষ বিচক্ষণ—'গ্রহ' ও 'ন্যাস' স্বরের প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে যাঁর জ্ঞান আছে।

৪। রাগরাগাঙ্গভাষাঙ্গক্রিয়াঙ্গোপাঙ্গকোবিদঃ—রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ সম্বন্ধে যিনি জ্ঞান রাখেন। এখানে রাগাঙ্গ অর্থাৎ রাগের বিভিন্ন অঙ্গ অথবা অংশ, ভাষাঙ্গ অর্থাৎ রাগে গেয় গানের ভাষা, ক্রিয়াঙ্গ অর্থাৎ রাগ গাইবার স্বতন্ত্র নিয়ম এবং উপাঙ্গ অর্থাৎ ছোট ছোট স্বর রচনার সাহায্যে রাগের আলাপ।

৫। প্রবন্ধ গান নিষ্ণাত—প্রাচীন প্রবন্ধ গান সম্বন্ধে যিনি অভিজ্ঞ।

৬। বিবিধালপ্তিতত্ত্ববিৎ—বিবিধ প্রকার আলপ্তি সম্বন্ধে যাঁর জ্ঞান আছে। আলপ্তি একপ্রকার প্রাচীন গীত।

৭। সর্ব্বস্থানোত্থগমকেম্বনায়াসলসদ্‌গতিঃ—মন্দ্র, মধ্য এবং তার এই তিন স্থানের গমকে যিনি দক্ষ।

৮। আয়ত্তকণ্ঠ—কণ্ঠস্বরকে যিনি ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারেন।

৯। তালজ্ঞ—বিভিন্ন তাল সম্বন্ধে যাঁর জ্ঞান আছে।

১০। সাবধান—একাগ্র চিত্তে যিনি গান করেন।

১১। জিতশ্রম—গান গাইবার সময় যাঁকে পরিশ্রান্ত দেখায় না।

১২। শুদ্ধছায়ালগাভিজ্ঞ—শুদ্ধ, ছায়ালগ এবং সংকীর্ণ রাগ সম্বন্ধে যাঁর জ্ঞান আছে।

১৩। সর্ব্বকাকুবিশেষবিৎ—সঙ্গীতশাস্ত্রের ছয় প্রকার কাকু সম্বন্ধে যিনি জ্ঞান রাখেন। পণ্ডিত কল্লিনাথ কাকু-র ব্যাখ্যায় লিখেছেন—'কাকুর্ধ্বনের্বিকারঃ' অর্থাৎ কাকু ধ্বনির (সঙ্গীত উপযোগী স্বর) বিকার অথবা বিশেষ রূপ। কাকু ছয় প্রকার—স্বরকাকু, রাগকাকু, দেশকাকু, ক্ষেত্রকাকু, অন্যরাগকাকু, যন্ত্রকাকু।

১৪। অপার স্বরসঞ্চার—গান গাইবার সময় যিনি গানের অসংখ্য স্থায় অর্থাৎ রাগাবয়ব রচনা করতে সমর্থ।

১৫। সর্বদোষবিবর্জিত—যিনি শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী নির্দোষভাবে গান গাইতে পারেন।

১৬। ক্রিয়াপরঃ—নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা যিনি সঙ্গীতে পারদর্শিতা অর্জন করেছেন।

১৭। অজস্রলয়ঃ—নানা প্রকার লয় যাঁর জানা আছে।

১৮। সুঘটঃ—যাঁর গান শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে।

১৯। ধারণান্বিতঃ—মেধাবী অর্থাৎ যিনি উত্তম স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

২০। স্ফূর্জীনির্জবনঃ—যে গায়ক 'নির্জবন' প্রয়োগে দক্ষ। 'নির্জবন' রাগের বিশেষ একটি অবয়ব। এর প্রকৃতি মেঘগর্জনের মত গম্ভীর।

২১। হারিরহঃকৃদ্ভজনোদ্ধুরঃ—যিনি সুমধুর সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাকে মুগ্ধ করতে সমর্থ।

২২। সুসম্প্রদায়ঃ—যিনি গুরুপরম্পরায় উত্তম সম্প্রদায়ভুক্ত।

গায়কের দোষ

সংদষ্টোদ্ধৃষ্ট সূৎকারিভীত শঙ্কিত কম্পিতাঃ।
করালী বিকলঃ কাকী চিতালকর ভোম্বড়াঃ॥
ঝোম্বক কম্ভুম্বকী বক্রী প্রসারী বিনিমীলকাঃ।
বিরসাপস্বরাব্যক্তস্থান ভ্রষ্টাব্য বস্থিতাঃ॥
মিশ্রকোহনবধানশ্চ তথাহন্যঃ সানুনাসিকঃ।
পঞ্চবিংশতিরিত্যেতে গাওকা নিন্দিতামতাঃ॥

১। সংদষ্টঃ—যিনি দাঁত চেপে গান করেন।

২। উদ্ধৃষ্ট—যিনি কর্কশ চিৎকার করে গান করেন।

৩। সূৎকারী—এঁ এঁ—এইরূপ শব্দ করে যিনি গান করেন।

৪। ভীতঃ—যিনি ভয়ে ভয়ে গান গেয়ে থাকেন।

৫। শঙ্কিত—গান গাইবার সময় যিনি অকারণে শঙ্কিত হয়ে পড়েন।

৬। কম্পিত—যিনি কম্পিত স্বরে গান করেন।

৭। বিকলঃ—গান গাইবার সময় যাঁর স্বরস্থান ঠিক থাকে না।

৮। কাকী—কাকের মত কর্কশ স্বরে যিনি গান করেন।

৯। করালী—যিনি বিকট হাঁ করে গান করেন।

১০। বিতালঃ—সঙ্গীত পরিবেশন কালে যিনি বারে বারে তালভ্রষ্ট হন।
১১। করভঃ—যিনি ঊর্ধ্বমুখ হয়ে গান করেন।
১২। উদ্বড়—ভেড়ার মত মুখব্যাদন করে যিনি গান করেন।
১৩। ঝোম্বকঃ—যিনি গলার শিরা ফুলিয়ে গান করেন।
১৪। তুম্বকী—তুম্বার মত মুখ ফুলিয়ে যিনি গান করেন।
১৫। বক্রী—গান করার সময় যাঁর মুখ বেঁকে যায়।
১৬। প্রসারী—গান গাইবার সময় যিনি হাত-পা ছোঁড়েন।
১৭। নিমীলকঃ—যিনি চোখ বন্ধ করে গান করেন।
১৮। নিরসঃ—যাঁর গানে কোনও মাধুর্য নেই।
১৯। অপস্বর—ভ্রমবশতঃ যিনি বর্জিতস্বর প্রয়োগ করেন।
২০। অব্যক্ত—যাঁর গানের শব্দ উচ্চারণ অস্পষ্ট।
২১। স্থানভ্রষ্ট—যাঁর কণ্ঠস্বর যথাস্থানে পৌঁছয় না।
২২। অব্যবস্থিতঃ—যিনি মনস্থির করে যথাযথভাবে গান গাইতে পারেন না।
২৩। মিশ্রকঃ—যিনি কোনও রাগ গাইবার সময় ওই রাগের শুদ্ধতা রক্ষা করতে পারেন না এবং ওই রাগকে অন্য রাগের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেন।
২৪। অনবধানঃ—নিয়ম উপেক্ষা করে আপন খেয়ালে যিনি গান করেন।
২৫। সানুনাসিকঃ—যিনি নাকিসুরে গান করেন।

সুলতানী আমল এবং ধ্রুপদের সৃষ্টি

সম্পূর্ণ নতুন একটা সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিবর্তন শুরু হয়। এই সভ্যতা—মুসলমান সভ্যতা। প্রাক্-ইসলাম যুগ থেকে আরব ও ভারতের মধ্যে নানা বিষয়ে সহযোগিতা স্থাপিত হয়েছিল। দেশ বিজয়ের বাসনা জাগবার অনেক আগেই ইসলামের যুগেও বহু মুসলমান ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়েও ফিরে যান। তার কারণ ইসলামের উদ্ভবের ফলে আরব-জগতে যে নতুন সভ্যতার সূচনা হয় তার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ পার্থক্য দেখা দেয়। প্রায় তিনশো বছর ধরে ভারতের সংস্কৃতি মুসলমানদের নিকট উপেক্ষিত ছিল। এর পর একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের পর ভারতের সঙ্গে মুসলিম জগতের আবার নতুন করে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তরাইন-এর যুদ্ধে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে মহম্মদ ঘুরী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। এইভাবে ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের পত্তন হয়। প্রথমে ঘুর, তার পর দাস রাজবংশ, খিলজী, তুঘলক, লোদী প্রভৃতি রাজবংশ এবং সর্বশেষে মুঘল রাজবংশ, ভারতবর্ষ শাসন করেন।

এই মুসলমান যুগে ভারতীয় সঙ্গীতের নানা পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তন সূচিত হয় আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকাল (১২৯৬—১৩১৬ খ্রিস্টাব্দ) থেকে। হিন্দু যুগেই প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত অত্যধিক বন্ধনের

ফলে তার প্রবহমানতা হারাতে শুরু করেছিল। সুলতানী আমলের প্রথম দিকে জনক রাগ গ্রামরাগ নামে পরিচিত ছিল। এ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন ভাষা, বিভাষা, রাগ। এগুলি আবার রাগ, উপরাগ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ প্রভৃতিতে বিভক্ত ছিল। শার্ঙ্গদেব তাঁর 'সঙ্গীত রত্নাকর'-এ ২৬৪ রকম রাগের কথা বলেছেন। এগুলি সবই মার্গ সঙ্গীতাশ্রয়ী ছিল। সারা ভারতবর্ষে যে গীতিগান (lyric song) প্রচলিত ছিল তা হচ্ছে প্রবন্ধ গান। এর পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে চিত্রবীণা এবং ত্রিপঞ্চী বীণা খুব জনপ্রিয় ছিল না। তবে স্বরমণ্ডল রীতিমত জনপ্রিয় ছিল। কিন্নরী এবং আলাপিনী—এই দুই শ্রেণীর বীণার মধ্যে কিন্নরী সুলতানী [illegible]লে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ছিল। বাঁশি এবং আনদ্ধ শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রগুলির [illegible]রিবর্তন ঘটেনি।

আলাউদ্দীন খিলজীর আমল (১২৯৬ – ১৩১৬ খৃষ্টাব্দ)

সাধারণভাবে দেখতে গেলে গোটা সুলতানী আমল সংস্কৃতি চর্চার পক্ষে খুব অনুকূল ছিল না। রাজ্যভাগ এবং সিংহাসন অধিকারের জন্য সংঘর্ষ লেগেই ছিল। মরক্কোবাসী পর্যটক ইবন বতুতা আলাউদ্দীন খিলজীকে শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম বলে অভিহিত করেছেন। অথচ তাঁর রাজত্বকাল বিশ্বাসঘাতকতা, নরনারী হত্যা, অত্যাচার, জুলুম ও জবরদস্তির বিভীষিকার দ্বারা কলঙ্কিত। তা সত্ত্বেও এই আমলের একটি উজ্জ্বল দিক হচ্ছে এই যে মুঘল-আমলে শিল্প ও সংস্কৃতির যে বিকাশ ঘটে তার ভিত্তি রচিত হয়েছিল এই আমলেই। এই আমলে সঙ্গীতের যে বিকাশ ঘটে তার বিবরণ আমরা পাই জীয়াউদ্দীন বার্ণি রচিত 'তারিখ-ই-ফীরুজ-শাহী' গ্রন্থে। জীয়াউদ্দীন ১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর গ্রন্থ সমাপন করেন। তিনি সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক-এর ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং তিনি ছিলেন আমীর খসরুর বন্ধু। তিনি কায়কোবাদ-এর রাজত্বকাল (১২৮৬-১২৮৮ খ্রিস্টাব্দ), জালালউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকাল (১২৮৮-১২৯৫ খ্রিস্টাব্দ) এবং আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালের সঙ্গীত সম্পর্কে বিবরণ তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর গ্রন্থ থেকে জানা যায় কিভাবে মধ্যপ্রাচ্য থেকে বাদ্যযন্ত্রগুলি ভারতবর্ষে পরিচিতি লাভ করে এবং এইসব যন্ত্রের ভারতীয়করণ করা হয়। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে কায়কোবাদের রাজত্বকালে গজল্ গানের সঙ্গে রবাব যন্ত্রের সঙ্গত চলত। এই কায়কোবাদের রাজত্বকালেই যে কাওয়াল গান প্রচলিত ছিল তাও বার্ণির লেখা থেকে জানতে পারা যায়।

আমীর খসরু

শাসননীতির দিক থেকে কলঙ্কিত হলেও সঙ্গীতের দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকাল। তাঁর দরবারের অন্যতম

সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন আমীর খসরু। এই আমীর খসরুর নাম ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। কেউ কেউ তাঁকে ভারতীয় সঙ্গীতের অন্যতম ধারা খেয়ালের স্রষ্টা পর্যন্ত বলেছেন। খসরু ভারতে আগমনকারী একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। চেঙ্গিজ খাঁর মধ্য এশিয়া আক্রমণের সময় অনেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। এঁদের মধ্যে লাচিন তুর্কী নামে একটি গোষ্ঠী মধ্য-এশিয়া থেকে সুলতান সামসুদ্দীন ইলতুৎমিস-এর সময়ে (১২১১-১২৩৬ খ্রিস্টাব্দ) ভারতবর্ষে আসে। খসরুর পিতা সৈফুদ্দীন লাচিন তুর্কীদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। সৈফুদ্দীন ইলতুৎমিস-এর দিল্লীর দরবারে আশ্রয়লাভ করেন। এই ইলতুৎমিস শিল্প, সঙ্গীত ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমীর খসরু ১২৫৪ খ্রিস্টাব্দে পাতিয়ালায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা ছিলেন গিয়াসুদ্দীন বলবনের যুদ্ধ-মন্ত্রী ইমদুল মুলক্-এর কন্যা। সাত বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। কিন্তু তাঁর লেখাপড়ার কোনও অসুবিধা হয়নি। তিনি বিজ্ঞান ও দর্শন পাঠ করেন। তবে, কাব্যের দিকে তাঁর বেশি ঝোঁক দেখা যায়। বিশ বছর বয়সেই তাঁর বৃত্তি স্থির হয়ে যায়। তিনি একই সঙ্গে অস্ত্র এবং লেখনী ধারণ করেন। এই সময় রাজধানী দিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পণ্ডিত, রাজনীতিক, জ্যোতিষী, গায়ক এবং ঘাতক—সবাই এসে জমা হত। খসরু আলাউদ্দিনের সভাসদ হলেন। কিন্তু রাজনীতিক না হলে সভাসদ হওয়া যেত না। সুতরাং সেদিকেও তাঁকে মন দিতে হল। তবে তাঁর কাব্য রচনা চলতে থাকল। তিনি দৈনিক সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় রচনার মতই কবিতা রচনা করতে পারতেন।

আলাউদ্দীনের রাজসভায় এলেও আমীর খসরুর প্রথম পৃষ্ঠপোষক আলাউদ্দীন মহম্মদ কুশীল খাঁ (ইনি 'মালিক ছজ্জু' নামে পরিচিত)। ১২৭৭ খ্রিস্টাব্দে খসরু মালিক ছজ্জুর নিকট কাজ গ্রহণ করেন। ছজ্জু ছিলেন গিয়াসুদ্দীন বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র। জীয়াউদ্দীন বর্ণির তারিখ-ই-ফীরুজশাহী থেকে জানা যায় যে, ছজ্জু উদারহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। শিকারে, বন্দুক ছোঁড়ায় এবং বল খেলায় (মধ্যযুগীয় পোলো) তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি কবি ও গায়কদের সম্মান করতেন। তিনি যখন কারা-র (এলাহাবাদ) গভর্নর তখন তিনি কবি খাজা শামস মইন-এর কণ্ঠে সুমধুর প্রশংসাসূচক গান (কাসিদা) শুনে তাঁকে আস্তাবলের সমস্ত ঘোড়া দান করেন। গায়কদের তিনি দান করেন দশ হাজার তংকা।

খসরু তাঁর পৃষ্ঠপোষক মালিক ছজ্জুর স্তুতিবাচক গান রচনা করেন। তবে ছজ্জুর কাছে মাত্র দু-বছর থেকে তিনি বলবনের দ্বিতীয় পুত্র নাসিরুদ্দীন বাঘরা খাঁ-র আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাঘরা খাঁ খসরুর গানে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এক পাত্র রৌপ্যমুদ্রা দান করেন। বাঘরা খাঁ সামানা-র গভর্নর ছিলেন। এখানেও খসরুর ভালো লাগল না। তিনি দিল্লী চলে গেলেন। দিল্লীতে তিনি সুলতান বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মহম্মদের সভায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সুলতান

মহম্মদ ছিলেন আদর্শ যুবরাজ। তিনি ছিলেন সাহসী, দিনরাী। তিনি কবিতা ও গান ভালবাসতেন এবং এগুলিতে উৎসাহ দিতেন। তাঁর ত্রিশ হাজার যুগলচরণ সমন্বিত একখানি পারস্য কবিতার সংকলন গ্রন্থ আছে। সুলতান মহম্মদের কাছে তিনি পাঁচ বছর ছিলেন। সভায় তাঁকে উচ্চপদ দান করা হয়েছিল। মঙ্গোল আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে সুলতান মহম্মদ প্রাণ হারান। আমীর খসরু শুধু সভাসদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন সামরিক অফিসার। তিনি মঙ্গোলদের হাতে বন্দী হন, কিন্তু কোনওক্রমে দিল্লীতে পালিয়ে আসেন। খাদ্যহীন, বস্ত্রহীন অবস্থায় তাঁর পলায়নের করুণ কাহিনী বর্ণি তাঁর কাব্যে লিপিবদ্ধ করেছেন।

পাতিয়ালার কিছুদিন অবস্থানের পর খসরু বলবনের পৌত্র মইজুদ্দীন কায়কোবাদ-এর দরবারে ছিলেন। কায়কোবাদ ছিলেন একজন অপদার্থ শাসক, রাজ্য শাসন করতেন তাঁর মন্ত্রী নিজামুদ্দীন। তিনি ছিলেন সাক্ষী-গোপাল। খসরু এখানে থাকতে পারলেন না। চলে এলেন আমীর আলী সরজন্দার বা হাতীম খাঁ-র কাছে। হাতীম অযোধ্যার গভর্নর ছিলেন। দু-বছর পর খসরু আবার দিল্লীতে কায়কোবাদের কাছে ফিরে এলেন। কায়কোবাদের পরে সুলতান জালালউদ্দীন খিলজী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খসরুর গুণগ্রাহী ছিলেন, বছরে তাঁকে বারো হাজার তংকা বেতন দান করতেন। জালালউদ্দীনই তাঁকে 'আমীর'[1] উপাধি দান করেন। জালাল-উদ্দীনের বয়স তখন সত্তর। তিনি সংস্কৃতিবানদের পছন্দ করতেন। নিজেও গান রচনা করতেন। তিনি তাঁর সভায় সে-যুগের নামকরা সঙ্গীতজ্ঞ, গায়ক এবং নর্তকীদের স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর প্রমোদ-সভা ছিল স্বপ্নের মত : সাকীরা পানপাত্র হাতে মদ্য পরিবেশন করত, যন্ত্রীরা তাঁদের বাদ্যযন্ত্রে ধ্বনিত করতেন অপূর্ব সঙ্গীত, নর্তকীরা নাচের সঙ্গে গাইতেন খসরুর গজল—সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

১২৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জুলাই জালালউদ্দীন-এর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা আলাউদ্দীন খিলজী এলাহাবাদের গঙ্গাতীরে তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন এবং সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্য বহু হত্যাকাণ্ড ঘটান। এই নির্দয় শাসকও কিন্তু তাঁর রাজসভায় খসরুকে স্থান দান করেন! যদিও ইতিপূর্বেই খসরু খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তথাপি আলাউদ্দীন-এর রাজত্বকালেই তাঁর প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। একদিকে সম্রাট আত্মনিয়োগ করলেন শাসন সংস্কারে, অন্যদিকে খসরু আত্মনিয়োগ করলেন কাব্য এবং সঙ্গীত রচনায়। যে গতিতে তিনি সৃজন করছিলেন তা অতি বিস্ময়কর। মাত্র তিন বছরে (১২৯৮-১৩০০ খ্রিস্টাব্দে) তিনি শেষ করলেন পাঁচটি রোমান্টিক

১। মধ্যযুগে খাঁ, মালিক, আমীর—এগুলি ছিল সরকারী উপাধি। পদমর্যাদা অনুসারে এইসব উপাধি দেওয়া হত। একশো জন সৈনিকের অধিনায়ককে 'আমীর', এক হাজার সৈনিকের অধিনায়ককে 'মালিক' এবং দশ হাজার সৈনিকের অধিনায়ককে 'খাঁ' বলা হত।

মসনবী[1] : মতাউল্ আনোয়ার, শিরীণ খস্রো, মজনুন লায়লা, আইন-ই সিকান্দার এবং বিহিস্ত্—এই সবগুলি মস্নবী শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়া-কে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

মরমী সাধক শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার প্রভাব খস্রুর ওপরে যথেষ্ট ছিল। বারো বছর বয়সে নিজামউদ্দীন অযোধ্যার শেখ ফরিদগঞ্জ শাকার-এর স্তুতিবাচক একটি গান শোনেন। গান শুনে তিনি মুগ্ধ হন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। খস্রু আট বছর বয়সে নিজামউদ্দীনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শেখের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব দৃঢ় হয় জালালউদ্দীনের সময়ে। মস্নবী ছাড়া খস্রু আরও কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর ঐতিহাসিক মস্নবীর মধ্যে রয়েছে কিরানুস্ সা'দাইন, মিফতাহুল ফুতু, দাওয়ালরাণী, খিজির খাঁ, নুহ্ সিপাহ্র এবং তুঘলক্নামা।

খস্রুর গজল্-এর সংকলন গ্রন্থ চারখানি : তুহফাতুল, সিগহার, ওয়াসতুল লায়লা এবং হসত বিহিশত। তাঁর সঙ্গীতজ্ঞের কান ছিল। তাঁর গীতিপ্রবণ হৃদয়ে যা তিনি অনুভব করতেন, সেই অনুভূতিকে তিনি সুন্দরভাবে রূপ দিতে পারতেন। আমীর খস্রু-র জনৈক জীবনীকার মহম্মদ হাবীব্ বলেছেন,[2]

"He is the favourite poet of the mystic singers (quawals) who have loved to set their lives to music and advanced mystics have often fainted and yielded up the ghost of their recitation. In him for the first (though not for the last) time, Persian poetry reaches its high water mark—the sustained ghazal."

খস্রুর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে রয়েছে খাজাইনুল ফুতু (আলাউদ্দীনের যুদ্ধবিগ্রহ সম্বলিত ইতিহাস) এবং ই জাজ-ই খুসরবী (পাঁচখণ্ডের অলংকার গ্রন্থ)। এছাড়াও খস্রু কবিতায় আরবী-পারসী অভিধান (বদি'উল আজাইব), হিন্দী-পারসী অভিধান (খালিক বারী), পারসী এবং হিন্দী প্রেম-কবিতা (মসনবী শহর অশুব), পারসী ও হিন্দী ধাঁধার সংকলন প্রভৃতির রচয়িতা। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পরে কুতুবুদ্দীন মুবারক শাহ সিংহাসনে আরোহন করেন। এঁর রাজসভায়ও খস্রু ছিলেন। এঁর পরবর্তী সম্রাট গিয়াসুদ্দীন তুঘলক-এর সময়েও (১৩২১-১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ) খস্রু রাজসভা অলংকৃত করেন।

আমীর খস্রু একাধারে কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, ঐতিহাসিক, গীতরচয়িতা, সঙ্গীতশিল্পী, দার্শনিক, মরমী সাধক (সুফী মতবাদী) এবং

১। মস্নবী সরল এবং সুষমাবণ্ডিত রচনা। এই গীতিধর্মী কাব্যের আবেদন অপূর্ব। রোমান্টিক মস্নবী শাহনামা কাব্যের স্বাভাবিক পরিণতি। খস্রুর রোমান্টিক মস্নবীগুলিকে একত্রে 'পঞ্চগঞ্জ' (five treasure house) বলা হয়। এগুলি নিজামীর খামশার অনুকরণে রচিত।

২। Mahammad Habib, 'Hazrat Amir Khusrau of Delhi,' Bombay (1927), P. 92.

যোদ্ধা। তিনি ব্রজ ভাষাকে সাহিত্যের শুদ্ধ ভাষায় রূপান্তরিত করেন। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে তিনি উর্দুভাষা প্রচলনে সাহায্য করেন। আমীর খসরুর বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে জিয়াউদ্দীন বর্নি তাঁর 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী'-তে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "The incomparable Amir Khusrau stands unequalled for the volume of his writings and originality of his ideals; for while other great masters of prose and verse have excelled in one or two branches, Amir Khusrau was conspicuous in every department of letters. A man with such mastery over all forms of poetry has never existed in the past and may perhaps not come into existence before the Day of Judgement. And in addition to his wit, talent and learning, he was an advanced mystic."

মৌলানা শিবলী নোমানী তাঁর 'শিরুল আজম' গ্রন্থে (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৫-১১৫) আমীর খসরু সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে মন্তব্য করেছেন, "No person of such comprehensive ability has been born in India during the last six hundred years, and even the fertile soil of Persia has produced only three or four persons of such varied accomplishments in a thousand years".

পারস্যের ফিরদৌসী, সাদী, আনোয়ারী, হাফিজ, উর্ফী, নাজিরী কাব্য ক্ষেত্রে নৃপতি স্বরূপ। কিন্তু তাঁদের প্রতিভা এক একটি ক্ষেত্রেই আবদ্ধ। ফিরদৌসী মসনবীর ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। সাদী 'কাসিদা' রচনা করতে পারেননি। আনোয়ারী-র 'গজল' অথবা 'মসনবী' রচনার ক্ষমতা ছিল না। অন্যদিকে হাফিজ, উর্ফী এবং নাজিরী শুধু 'গজল'ই রচনা করেছেন। কিন্তু খসরু-র বহুমুখী প্রতিভা 'গজল', 'মসনবী', 'কাসিদা', 'রুবাইৎ' এবং আরও নানা ধরনের কবিতা ও গদ্য রচনা করেছে। রচনার পরিমাণের দিক থেকেও খসরুর কাছাকাছি পৌঁছতে পারবেন না এঁরা।

খসরুর মাতৃভাষা পারসী, তুর্কী। তিনি আরবী জানতেন। হিন্দী এবং সংস্কৃতেও তাঁর দখল ছিল (তাঁর 'নুহ্‌সিপাহর' গ্রন্থে তিনি নিজেও তাঁর সংস্কৃত জ্ঞানের কথা স্বীকার করেছেন)।

আমীর খসরু সম্পর্কে যাঁরাই লিখেছেন তাঁরাই তাঁর সাঙ্গীতিক জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছেন। মুসলমান আমলের একটা বৈশিষ্ট্য হল ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতে মিশ্রণের দ্বারা সৌন্দর্য সৃষ্টি। আমীর খসরুকে এ ব্যাপারে পুরোধা বলা চলে। মূল ভারতীয় রাগকে পারস্য সঙ্গীতের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তিনি রাগের পারসী নামকরণের প্রথাও প্রচলিত করেন। ফকীরুল্লা-র 'রাগদর্পণ' থেকে জানা যায় পারসীর সুর-মিশ্রণে আমীর খসরু বারোটি রাগ সৃষ্টি করেন। এগুলি এইভাবে মিশ্রণ ও নামকরণ করা হয়েছে—বীরাগীতে মালশ্রী, দুগাহ এবং নুসায়নী একত্র করে করা হয়েছে 'মুয়াফ্‌ফেগ্' বা 'দেওয়ালী'। টোড়ীতে পঞ্চগাহ এবং মুহাইয়ীর গোশা একত্র করে 'মহীর', পূরবীকে ঘনম-

ফার্সী' শাহনাজকে খট্ রাগের সঙ্গে মিশ্রিত করে 'জীলফ'; গৌরী-কে 'ফরঘানা'। ফরঘানা-র সঙ্গে পারসীয় মোকাম মিশ্রিত করে সারঙ্গ-র সঙ্গে যুক্ত করে 'উশ্শাক'; গোন্দ-এ বিলাবহ, গৌড়সারঙ্গ এবং পারসীয় মোকাম থেকে রাগ সংযুক্ত করে সর্পরদা; কানাড়া-র সঙ্গে কয়েকটি রাগ মিলিয়ে 'ফিরোদস্ত'; ইমন-এর সঙ্গে নীরীজ যুক্ত করে 'ইমনী'; দেশকার-এর সঙ্গে পারসীয় মোকামের অন্তর্গত বাখরজ মিশিয়ে 'বাখরজ'; পূরবী, বিভাস, গৌরী গুণকেলী-র সঙ্গে পারসীয় মোকামের ইরাক মিশ্রিত করে 'সাজগিরী'—এইভাবে নতুন করে নামকরণ করা হয়েছে।

ইমন এবং বসন্ত—এই দুটি রাগকে একত্রিত করে আমীর খসরু ইমন-বসন্ত রাগ রচনা করেন। 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থের রচয়িতা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেও বলেছেন যে খসরুই ইমনপূরিয়া, নতুন ভূপালী, ইমন বিলাওল, ইমন বিহাগ, ইমন কল্যাণ, ঝিঁঝোটী, যমনী প্রভৃতি নতুন রাগের সৃষ্টি করেন ('হিন্দুস্থানী সঙ্গীত', ৩য় ভাগ, ৩৮৯ পৃঃ)। আমীর খসরু যে পথ প্রদর্শন করলেন সেই মিশ্রণের পথ গ্রহণ করে অনেকেই ভারতীয় সঙ্গীতকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। তুরস্ক-তোড়ী ও তুরস্ক-গৌড় এইভাবে হিন্দু-মুসলমান রাগের মিশ্রণে উৎপন্ন সংকর রাগ। এ ছাড়া বাহার, আড়াইয়া, সরপরদা, সাজগিরী, সাহানা, অড়ানা, সোহনী, সুহ, সুঘরাই, বুলীক, মারু প্রভৃতি সুরও এইভাবেই উৎপন্ন। পীলু, বারওয়া, লুম প্রভৃতির উৎপত্তিও হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনারই ফল।

যন্ত্রসঙ্গীতেও আমীর খসরুর অবদান উল্লেখযোগ্য। H. A. Popley বলেছেন—"The Sitar, a modification of Vina, was probably first introduced by him."[1] শুধু সেতার নয়, তবলার আকৃতি এবং বাদন-পদ্ধতিরও তিনি কিছু পরিবর্তন করেছিলেন বলে জানা যায়।

ভারতীয় মূর্চ্ছনার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন আমীর খসরু। সাতটি স্বরের মূর্চ্ছনার মধ্যে তিনি শুদ্ধ এবং বিকৃত রূপের একসঙ্গে প্রয়োগ করে স্বরের সংখ্যা বর্ধিত করেছেন। এর ফলে বারোটি স্বরযুক্ত সপ্তক সৃষ্টি হয় এবং ঠাটেরও উদ্ভব হয়।

খসরুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মিশ্রণ। তাঁর সমস্ত রাগেই মিশ্র-স্বর প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। আমীর খসরু এবং তাঁর শিষ্যরা যে গান গাইতেন তাকে বলা হয়েছে 'কাওয়ালী'। Papley বলেছেন, "The Quali mode of singing—a judicius mixture of Persian and Indian models was introduced by him."[2] আইন-ই আকবরীতেও আছে, "The songs of Delhi are called Kaul and Tarana. These were intrcduced by Amir Khasrau of Delhi in concert with Samit and Tatafr and

১। H. A. Popley, 'The Music of India', Calcutta (1950), p. 16.
২। H. A. Popely, 'The Music of Iadia', Calcutta (1950), p. 16.

by combining the several styles of Persia and India from a delightful variety."[১]

আমীর খসরুকে কেউ কেউ 'খেয়াল' গানের উদ্ভাবক বলেছেন। কিন্তু খেয়াল তো দূরের কথা, আমীর খসরু যে যুগে বর্তমান ছিলেন সে যুগে ধ্রুপদও তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে সৃষ্টি হয়নি।

গোপাল নায়ক

আমীর খসরুর সঙ্গেই যাঁর নাম মনে পড়ে তিনি হচ্ছেন গোপাল নায়ক। এই গোপাল নায়কের কথা লিখেছেন সঙ্গীতরত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ, চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকার লেখক বেঙ্কটমখী এবং রাগদর্পণের লেখক ফকিরুল্লা। কেমন করে আমীর খসরু আলাউদ্দীন খিলজীর সিংহাসনের তলায় লুকিয়ে থেকে গোপালের গান হুবহু নকল করে শুনিয়ে দিয়েছিলেন—সেই অদ্ভুত কাহিনী বিবৃত করেছেন ক্যাপ্টেন উইলার্ড এবং পপ্লে। অবশ্য ফকিরুল্লাই এই কাহিনীর স্রষ্টা। এদিকে বৈজু বাওরা এবং গোপাল নায়কের প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সূচক গানও কয়েকটি পাওয়া গিয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাসূচক কয়েকটি গান এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

(ক) বিদ্যা তেরী, রে নায়ক গোপাল।
গুণী অব মুনী তে হু জপত নাদ বেদ
ব্রহ্মা উচার করত, নায়ক বৈজু
পিঘলায়ে পাথর উমগায়ে তাল ॥

(খ) তেরে মন মে কেতো গুণ রে,
জেতো হোয় তেতো প্রকাশ কর রে।…
পাহন পিঘলায়ে, হিরণ বুলায়ে
জ্যো বরসেমেহা সরস্বতী বর য়ে।
কহৈ বৈজু বাওরে সুনো হে গোপাল লাল।

(গ) খরজ কহাঁসে রিখাভ কহাঁসে
কহাঁসে উপজ্যো সুর গন্ধার।
কহে গোপাললাল শুনিয়ে বৈজুবাওরে
নাদ অথাহ, জাকী গতি অগম অপার।

(ঘ) ধারু গাওত নায়ক গোপাল
ছত্রপতি সংগ্রাম ঝঝরোরে।

এই গানগুলি থেকে অন্তত এইটে বুঝতে পারা যায় যে, বৈজু, গোপাল এবং আমীর খসরু সমসাময়িক। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'চণ্ডীদাস' নামটি[২]

১। Ain-i-Akbari—N. Jarret, ed. J. N. Sarkar.

২। বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, বাশুলীসেবক চণ্ডীদাস এবং চণ্ডীদাস—পদাবলীতে এই সব নামই যুক্ত হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে কয়জন চণ্ডীদাস—এই সমস্যা দাঁড়িয়েছে।

যেমন সমস্যার সৃষ্টি করেছে, সঙ্গীতজগতে তেমনি সমস্যার সৃষ্টি করেছে 'গোপাল' ও 'বৈজু' এই দুটি নাম। আমরা 'বৈজু' নামের উল্লেখ পাচ্ছি চাররকম ভাবে : বৈজু, বৈজুনাথ, নায়ক বৈজু, বৈজু বাওরা। তেমনি গোপাল নামটিও পাচ্ছি চাররকমে : গোপাল, নায়ক গোপাল, গোপাল নায়ক, গোপাল লাল।

'নায়ক' বংশানুক্রমিক উপাধি এবং এই উপাধি এখনও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রাচীন যুগে কবি, সঙ্গীত-রচয়িতা, এঁদের নাম এঁদের কবিতায় বা গানের শেষে জুড়ে দিলেও উপাধি সহ নাম ব্যবহারের নজির নেই বললেই চলে। ব্যাস, বাল্মিকী, কালিদাস, প্রথম বাংলাভাষার লেখক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য কাহ্নপাদ, লুইপাদ প্রভৃতি, তারপর জয়দেব, এমন কি বিদ্যাপতি এবং ষোড়শ শতাব্দীর চণ্ডীদাস পর্যন্ত কেউ উপাধি ব্যবহার করেননি। তাই গোপাল-এর ক্ষেত্রে নায়ক শব্দটি বংশানুক্রমিক উপাধি বলে মনে করা যায় না। দ্বিতীয়ত, বাংলা সাহিত্যে চার-পাঁচটি চণ্ডীদাস নাম পাওয়া যায়। বড়ু চণ্ডীদাস এবং 'পদাবলী'র চণ্ডীদাস—এই দুই চণ্ডীদাস নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুজনের রচনার ভাষা ও ভঙ্গির রীতিমত পার্থক্য সূচিত হয়েছে। গোপাল-এর সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এরকম কোনও পার্থক্য নেই। তা ছাড়া গোপাল-এর সঙ্গে যদি 'লাল' কথাটি যুক্ত হয়ে থাকে তাহলে তা নিতান্তই কাব্যের ছন্দের প্রয়োজনে। হিন্দী ভাষায় 'নায়ক' শব্দের অর্থ প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি বা সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন এমন ব্যক্তিকে বোঝায় (an eminent person, a person well versed in music—Bhargaba's Dictionary)। তাই শুধু গোপাল নন, তাঁর পরবর্তী বহু বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞকেই 'নায়ক' বলা হয়েছে। সুতরাং নায়ক গোপাল বা গোপাল নায়ক বলতে একজনকেই বোঝা উচিত।

নায়ক গোপাল শুধু সঙ্গীতজ্ঞ নন, তিনি ছিলেন রীতিমত পণ্ডিত ব্যক্তি। সঙ্গীত রত্নাকর-এর টীকাকার কল্লিনাথ তাঁর পাণ্ডিত্যকে স্বীকার করেছেন এবং সমসাময়িক যে কোনও সঙ্গীতজ্ঞের তুলনায় তাঁকে শ্রেষ্ঠ আসন দান করেছেন। বেঙ্কটমখীও গোপালের শ্রুতি বিচক্ষণতার প্রশংসা করেছেন।

নায়ক গোপাল দাক্ষিণাত্যের লোক। ১৩০৭ (১৩১০ ?) খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর যখন দেবগিরি আক্রমণ করেন, তখন দেবগিরির রাজা ছিলেন রামচন্দ্র দেব। গোপাল এই রামচন্দ্রের সভাতেই ছিলেন। দেবগিরি বাহিনী কাফুরের কাছে পরাজিত হলে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে গোপালও দিল্লীতে আসেন।

বেঙ্কটমখী তাঁর 'চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা'র প্রবন্ধ প্রকরণে 'গীত' ও 'প্রবন্ধ' এই দুই-এর পার্থক্য নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন—গোপাল গীত এবং প্রবন্ধ-এর পার্থক্য সহজভাবে বোঝাতে পারতেন। ক্যাপ্টেন উইলার্ড লিখেছেন যে আলাউদ্দিনের দরবারে গোপাল নায়ক এসে তাঁর 'গীত' বলে এক ধরনের রচনা গেয়েছিলেন। এ রচনা তখন নাকি নতুন সৃষ্টি ছিল। এই গান প্রাচীন প্রবন্ধ গান নয়, সালগ-সূড়ের অন্তর্গত ধ্রুবগীতি।

ফকিরুল্লা তাঁর 'রাগদর্পণ'-এ বলেছেন যে, আলাউদ্দীনের দরবারে এসে গোপাল গেয়েছিলেন তিনটি গীত : স্বরবর্তণী, মন্ ও হৃরগীত। এই তিনটির মধ্যে 'স্বরবর্তনী' মার্গসঙ্গীত। আত্মপ্রশংসা সমন্বিত 'মন্' দেশী পর্যায়ের গীত। আর 'হৃরগীতি' পরিবর্তিত ধ্রুবগীতি। টীকাকার কল্লিনাথ বলেছেন—বত্রিশটি রাগতালযুক্ত 'ভ্রমণ' নামক এক প্রকারের 'রাগকদম্বক' (মার্গ সঙ্গীত) গোপাল নায়ক গাইতে ।

নায়ক বৈজু

'বৈজু' নামটিও গোপাল নায়কের মত নানাভাবে উল্লিখিত হয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। চার রকম বৈজু নামের মধ্যে যে কারণে গোপালকে নায়ক বলা হয়েছে সেই একই কারণে বৈজুকেও 'নায়ক' বলা স্বাভাবিক—কারণ সঙ্গীতজগতে তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। দ্বিতীয়ত, হিন্দী ভাষায় বাবরা (বাওরা) শব্দের অর্থ পাগল। বৈজু ছিলেন যোগী ভক্ত এবং সঙ্গীতসাধক। তাঁর একটি আশ্রম ছিল সত্যি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন ভবঘুরে। অধিকাংশ সময়েই তিনি ঘুরে বেড়াতেন। সত্যিই তাঁকে সঙ্গীতপাগল বলা যায়। তাই যদি লোকে তাঁকে বৈজু বাওরা বলে অভিহিত করে থাকে তবে তার মধ্যে অস্বাভাবিক ব্যাপার কিছু নেই। তৃতীয়ত, যে কারণে গোপালের সঙ্গে 'লাল' যুক্ত হয়েছে, সেই কারণেই অর্থাৎ ছন্দের প্রয়োজনে 'নাথ' যুক্ত হয়ে থাকতে পারে। সুতরাং বৈজু একজনই ছিলেন। তিনি গোপাল নায়কের শিষ্য ছিলেন না প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তা বলা কঠিন, তবে তাঁরা যে সমসাময়িক, উভয়ের রচিত সঙ্গীতই সে পরিচয় বহন করেছে। যেমন—

> গুপ্ত সপ্ত প্রগট ছত্তীর ভাঁড়ী আয়ো গোপাল
> বৈজুকে গায়েতে' সপ্ত সুর ভুল গয়ে ।। (বৈজুর গান)
> অথবা—
> কহে গোপাললাল সুনিয়ে বৈজু বাওরে
> নাদ অথাহ, জাকী গতি অগম অপার ।। (গোপালের গান)

বৈজুকে আলাউদ্দিন তাঁর দরবারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং স্থায়ীভাবে বাস করতেও অনুরোধ করেছিলেন। বৈজু সম্রাটের দরবারে মাঝেমাঝে আসতেন বটে, কিন্তু স্থায়ীভাবে বাস করেননি।

এই বৈজু কোন্ সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন ? বৈজুকে বলা হয়েছে ধ্রুপদের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই যে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ—এই চার তুক্ বিভাগ করেছিলেন, একথাও বলা হয়ে থাকে। এই মতামত সম্পূর্ণভাবে অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বৈজুও গোপাল নায়কের মত ওই সময়ে প্রচলিত সালগসূড়ের অন্তর্গত ধ্রুবাগীতিই গাইতেন। তবে তাঁর গানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। রাজা মানসিংহের সময়ে প্রচলিত ধ্রুপদ গানের বিষয়বস্তু থেকে বৈজুর গানের

বিষয়বস্তুর কিছু পার্থক্য আছে। তাঁর ওপরে বিষ্ণুর প্রভাব কম। শিব, রাম, শক্তি—এঁদের সম্বন্ধেই তিনি বেশি গান রচনা করেছেন। একটি গানের নমুনা দেওয়া হল—

জাকে বৈজয়ন্তীমালা তাকে সোহে মৃগছালী
জাকে মুরলী অধর ডমরু তাকে কররে।
জাকে জটাজুট গঙ্গ ত্রিশূল তাকে সংখ-চক্র-গদা-পদম্
জাকে রুণ্ড মুণ্ড মালা তাকে পীতাম্বর পটরে।

এ'র ভাষা শুদ্ধ ব্রজভাষা। বৈজুর গানের ছন্দ একটু শিথিল হলেও বাঁধুনি দেবার প্রয়াস আছে। তাঁর গানের কাব্যিক ছন্দ তালকে অনুসরণ করে চলে। বৈজুর আগের যুগের হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সংস্কৃত শুদ্ধ প্রবন্ধের অনুসরণে রচিত হত। এইসব গান বেশ দীর্ঘ ছিল। বৈজুর গান অত দীর্ঘ নয়, সেগুলি পাঁচ বা চার তুকে গড়া। এই তুক্ বর্তমানের ধ্রুপদের তুক্ বিভাগের মত নয়। এই তুক্‌বিভাগ হচ্ছে ধ্রুবা প্রবন্ধের তুক্ বিভাগ, অর্থাৎ উদ্‌গ্রাহ (দুই খণ্ডে বিভক্ত), অন্তর এবং আভোগ (দুই খণ্ড)। শার্ঙ্গদেব অবশ্য ধ্রুবাগীতির উদ্‌গ্রাহের দুই খণ্ডকে এক ধাতু বলেছেন। সেই অর্থে বলা যায় বৈজুর গানে চার ধাতু। বৈজুর ধ্রুবাপ্রবন্ধ চৌতাল, তেওড়া, ব্রহ্মতাল, বিষ্ণুতাল প্রভৃতি তালে নিবদ্ধ। তাঁর গাওয়া রাগগুলি হচ্ছে মালকোষ, ভীমপলশ্রী, ভৈরব, টোড়ী প্রভৃতি।

ধ্রুপদের সৃষ্টিকাল

কোন্ সময়ে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ—ধ্রুপদের এই বিভাগ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ আমরা যাকে ধ্রুপদ সঙ্গীত বলি, তার সৃষ্টি হয় কখন?

Captain Willard, Sir William Jones, Dr. Griffith, Sir Ousley প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং তাঁদের অনুসরণকারী কোনও কোনও ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রী বলেছেন যে, গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তোমর (১৪৮৬—১৫১৬ খ্রিঃ) ধ্রুপদের প্রবর্তন করেন।[১] কেউ বলেছেন রাজা মানের সভাপতিত্বে ধ্রুপদ জাতীয় গানের ধাতু বিভাগ পরিকল্পনা করা হয়েছিল।[২] আবার কারও অভিমত হল—"ধ্রুপদ রাজা মানসিংহ তোমর-এর সঙ্গীতচিন্তার প্রধান ফল। * * * ধ্রুপদের প্রতিষ্ঠায় নায়ক বক্সু যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। বক্সু পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি ছিলেন সাবেক আমলের প্রধান নায়ক। আসলে ধ্রুপদ একটা নূতন সৃষ্টি নয়। বহু পূর্ব থেকে সালগ পর্যায়ের প্রবন্ধ সঙ্গীত ধ্রুব ভারতে প্রচলিত ছিল। ক্রমে এর বহু রূপভেদ হতে দেখা যায়। রাজা মান এই বিভিন্ন ধ্রুব গানকেই একটি সহজ এবং সুসম্বন্ধ রূপ দিয়েছিলেন।"[৩]

১। 'সঙ্গীত পারিজাত' (পৃঃ ১২৪), ভাষ্য কার শচীন্দ্রনাথ মিত্র।
২। অমিয়নাথ সান্যাল, 'প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত চিন্তা', পৃঃ ৩০।
৩। রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'মুঘলযুগের সঙ্গীত চিন্তা', কলিকাতা (১৯৬৪), পৃঃ ৫।

এ সম্পর্কে আর একটি মন্তব্য এইরকম—"আবুল ফজলের মতে রাজা মানসিংহ সঙ্গীতশাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন এবং বকসু, ভন্নু প্রভৃতির সহায়তায় তিনি গোয়ালিয়রে প্রচলিত দেশী গীত ধ্রুবপদাকে অভিজাত পর্যায়ে উন্নীত করে এক নতুন সৃষ্টির পথ দেখান। ফকীরুল্লাও বলেছেন যে, মানসিংহ পণ্ডিত ছিলেন বলেই ধ্রুপদের মত এমন একটি গীতরীতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।"[১] উপরোক্ত আধুনিক যুগের লেখকদের মন্তব্যগুলি যে-সমস্ত লেখকদের মতামতকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে তাঁদের একজন হচ্ছেন Captain N. Augustus Willard/ তিনি ধ্রুপদ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন[২] : "Mosl renowned of the Nayuks have been Gopal, a native of the Dekhun, i. e. Deccan, who flourished during the reign of Sooltan Ulaood-deen and his contemporary Ummer Khosrow of Delhi ; Sooltan Hoosan Shruque of Jaunpoor, Raja Man *** of Gwalior founder of the Dhoorpud." H. A. Popley লিখেছেন—"Raja Man Singh of Gwalior, one of the greatest of Akbar's ministers, was also a great patron of music and is said to have introduced the Dhrupad style of singing".[৩] এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, Popley ভুল করে অম্বরাধিপতি মানসিংহ আর গোয়ালিয়রের অধিপতি মানসিংহকে এক করে ফেলেছেন। অম্বরাধিপতি মানসিংহ আকবরের সেনাপতি ছিলেন। গোয়ালিয়রের অধিপতি রাজা মানসিংহ তোমর (১৪৮৬-১৫১৬)-এর সময় আকবরের জন্মই হয়নি।

দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই গোয়ালিয়র অধিপতি মানসিংহের রাজত্বকালকেই ধ্রুপদ সৃষ্টির সময় বলতে চাইছেন। কিন্তু এর বিপরীত মতেরও অভাব নেই : "১৩শ শতাব্দীতেই সংসারবিবাগী বৈজু বাওরা ও গোপাল নায়ক এই উভয়ের মধ্যে কাহারও কৃতিত্বে ধ্রুপদ রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। বৈজু বাওরা ও গোপাল নায়ক রচিত বহু ধ্রুপদ গীত, যাহা অদ্যাপিও সুপ্রচলিত, তাহা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।"[৪] আর একটি আধুনিক অভিমত—"বৈজু আলাউদ্দীন খিলজীর সময়ের (১২৯৬—১৩১৬ খ্রিঃ) ব্যক্তি এবং গোপাল নায়ক এঁর শিষ্য ছিলেন। বৈজু বাওরা ধ্রুপদ সৃষ্টি করেছিলেন আর স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ নামে তুক্ বিভাগও

১। ডঃ বিমল রায়, 'ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ', কলিকাতা (১৯৭১), পৃঃ ৪১।

২। Willard, 'A Treatise on the music of Hindoosthan', p. 107.

৩। H. A. Popley, 'The Music of India', Calcutta (1950), p. 17.

৪। সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উদীবরে ভারতীয় সঙ্গীত', কলিকাতা (১৯৬৩), পৃঃ ৫৮।

ইনিই করেছিলেন।[১] এই মন্তব্য যাঁর, তিনিই আবার বলেছেন—"ধ্রুপদকে ধ্রুব ইত্যাদি সালগসূড় থেকে গড়ে উঠতে পঞ্চদশ শতাব্দী পার হয়ে গিয়েছিল।"[২] ধ্রুপদ দেশী সঙ্গীতের পরিমার্জিত রূপ বা প্রবন্ধ গীতিই লোকসঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ধ্রুপদে রূপান্তরিত হয়েছে—এই অভিমত যাঁরা পোষণ করেন তাঁদের মধ্যে ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—"লোকসঙ্গীতের প্রভাবের সঙ্গে ধ্রুপদ প্রচলনের যোগ আছে। সে যোগ আন্তরিক। লোকসঙ্গীতে তানের অভাব, ধ্রুপদেও তান নেই; লোকসঙ্গীত অর্থমূলক, অর্থও আবার সাধারণতঃ আধ্যাত্মিক; রূপ তার কবিতায়, রস তার অনুভূতির।" (কথা ও সুর, পৃঃ ৩৯)

ধ্রুপদকে যাঁরা দেশী সঙ্গীত বলতে চান তাঁরা আইন-ই-আকবরী রচয়িতা আবুল ফজলের মতের অনুসরণেই তা বলতে চেয়েছেন। আইন-ই-আকবরীতে ধ্রুপদকে এক প্রকার দেশী (আঞ্চলিক) গান বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এই গান আগ্রা, গোয়ালিয়র, বারি এবং এইসব স্থানের সন্নিহিত অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। আবুল ফজল এই গ্রন্থে আরও বলেছেন—When Man Singh (Tanwar) ruled as Raja of Gwalior, with the assistance of Nayak Bokshu, Macchu and Bhanu who were the most distinguished musicians of their day he introduced a popular style of melody which was approved even by the most refined taste. On his death, Bakshu and Macchu passed into the service of Sultan Mahumud of Gujrat, where his new style came into universal favour".

আবুল ফজল আরও বলেছেন—"দাক্ষিণাত্যে এই গানগুলিকে ঐ অঞ্চলের ভাষায় ছিন্দ (ছন্দ = ছন্দ প্রবন্ধ) বলতো। তিন বা চার লাইনের এই গানগুলি প্রশংসা সূচক গান। তেলেগু এবং কর্ণাটক ভাষায় এগুলিকে ধ্রুব বলা হতো এবং এগুলির বিষয়বস্তু ছিল প্রেমমূলক। বাংলা দেশে যেগুলি প্রচলিত ছিল সেগুলিকে 'বাঙ্গালা', জৌনপুরে যেগুলি প্রচলিত ছিল সেগুলিকে বলা হতো 'চুটকলা' এবং দিল্লীতে যেগুলি প্রচলিত ছিল সেগুলিকে বলা হতো 'কৌল' এবং 'তারাণা'। এই শেষোক্ত গান দিল্লীর আমীর খসরু শমিত এবং তাতার-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পারসিক ভারতীয় পদ্ধতির মিশ্রণে রচনা করতেন। এই গানগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। মথুরায় যে গান প্রচলিত ছিল তার নাম 'বিষ্ণুপদ'। এই গান ছয় বা আট লাইনের এবং এই গান বিষ্ণুর স্তবগান। সিন্ধু প্রদেশে প্রচলিত গানকে বলা হতো 'লাচারী'। এইগুলি বিদ্যাপতি-এর রচনা এবং গানগুলি প্রেমমূলক। লাহোর এবং তার সন্নিহিত

১। ডঃ বিমল রায়, 'ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ', কলিকাতা (১০৭১), পৃঃ ৫৫।

২। ডঃ বিমল রায়, 'ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ', কলিকাতা (১০৭১), পৃঃ ১৭।

অঞ্চলে প্রচলিত গানকে বলা হতো ছান্দ এবং গুজরাটে প্রচলিত গানকে বলা হতো জাক্রি।"

আবুল ফজলের উক্তিকে প্রামাণ্য মনে করার কারণ নেই। তিনি শোনা কথার ওপরে গুরুত্ব দিয়ে থাকবেন। তা ছাড়া স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ঠিকই বলেছেন—"It is also true that he was neither a musician nor an accomplished musicologist. Moreover, it is a fact that during the time of Raja Man of Gwalior (15th century A. D.), the dhruvapada type of prabandha took a new shape and novel course, but it is equally certain that it was not invented but only revived and rejuvenated by Raja Man, who assisted by Hindu and Muslim musicians of outstanding merit, established a Gwalior school of music."[1]

স্বামীজীর মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় ডাঃ যদুনাথ সরকারের বিবরণীতে। তিনি বলেছেন—"After Raja Man the renowned dhrupadiya Bakshu continued his service at the court of Vikramjit, the son of Man Singh and after his death, entered the service of Raja Kirat of Kalinjar, whence he was invited to the court of Gujurat."

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি মান সিংহের সময় ধ্রুপদের নাম শুনতে পাওয়া যেত শুধু তাই নয়, মানসিংহের সময়েই প্রথম ধ্রুপদের নাম শুনতে পাওয়া যায়। নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত All India Radio Symposium-এ বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীঠাকুর জয়দেব সিংহ 'প্রবন্ধ এবং ধ্রুবপদ' সম্পর্কে যে আলোচনা করেন[2] তাতে বলা হয়—"The first historical referenee that we get about dhruvapada is its association with Raja Man Singh Tomar of Gwalior. He ascended the throne in 1486 A. D. He did not invent dhruvapada. He only gave it an impetus. It must have taken about hundred years for the development of this style of musical composition before such a connoisseur of music, as Raja Man Singh could extent to it his patronage and take such a great interest in its development. We may therefore safely say that the dhruvapada style of composition started some time about the middle of 14th century."

এই ধ্রুপদ হঠাৎ একদিন কেউ আবিষ্কার করে বসেননি। ধ্রুপদ প্রবন্ধ সঙ্গীতের ক্রমবিকাশেরই একটি পরিণতি।

১। Swmi Prajanananda, 'A historical study of Indian Music', Calcutta (1965), p. 164-65.

২। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখিত A historical study of Indian Music গ্রন্থে এই আলোচনা উদ্ধৃত হয়েছে। পৃঃ ১৯৭,২০।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গোয়ালিয়র ও বৃন্দাবনের অবদান

ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে গোয়ালিয়র এবং বৃন্দাবনধাম বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। গোয়ালিয়রের সঙ্গীতচর্চার পৃষ্ঠপোষক তোমর রাজবংশ এবং বৃন্দাবনের সঙ্গীত-সাধক গোস্বামীগণ। এঁদের একই সঙ্গীতপ্রবাহ দুটি পৃথক ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল।

গোয়ালিয়রের তোমর বংশীয় নৃপতিরা প্রায় এক শতাব্দীকাল শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই রাজবংশের অনেক নৃপতি শুধু বাহুবলেই শক্তিশালী ছিলেন না, কলারসিকও ছিলেন। সেইজন্য তাঁরা সাহিত্য ও সঙ্গীতকলার পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন।

তোমর বংশের রাজা মান সিংহ।[১] ইনি অবশ্য আকবরের সেনাপতি অম্বরাধিপতি মান সিংহ নন। রাজা মান সিংহ তোমরের শাসনকাল ১৪৮৬ থেকে ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই সময়ের মধ্যে ধ্রুপদ সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচলন হয়।

একই সঙ্গে গোয়ালিয়রে ধ্রুপদ, অন্যদিকে মথুরা-বৃন্দাবনে 'বিষ্ণুপদ' প্রচলিত ছিল। এই বিষ্ণুপদের সঙ্গে রাজা মানের ধ্রুপদের পার্থক্য ছিল। এই দুটি

১। Herbert A. Popley তাঁর 'The Music of India' বইতে ভুল করে লিখেছেন, "Raja man Sing of Gwalior, one of Akbar's ministers, was also a great patron of music." (p. 17.), যা মোটেই ঠিক নয়।

সঙ্গীতধারার সঙ্গে মুসলমানদের 'কৌল' (বিচিত্র বিষয়বস্তু এবং সুরের চাঞ্চল্য এর বৈশিষ্ট্য) এবং প্রবন্ধগানের কিছু লৌকিক রূপ (যেমন চুটকলা) প্রচলিত ছিল।

পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে গোয়ালিয়র যে সঙ্গীত সাধনার অন্যতম কেন্দ্র ছিল তা আবুল ফজল প্রদত্ত বিবরণ থেকেও জানতে পারা যায়। তিনি আইন-ই-আকবরীতে আকবরের সভাগায়কদের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে ৩৬ জনের নাম পাওয়া যায়, দেখা যায় যে তাঁদের মধ্যে ১২ জনই এসেছিলেন গোয়ালিয়র থেকে।

আকবরের সিংহাসন লাভের অনেক আগে থেকেই গোয়ালিয়র সঙ্গীত সাধনার অন্যতম কেন্দ্র রূপে পরিচিত হয়। আবুল ফজলই বলেছেন, "হিন্দু-মুসলমান সাধনার যুগে সঙ্গীতের চারটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। তার মধ্যে ভারতের বাইরে ছিল মাশাদ আর তব্রীজ, ভারতের মধ্যে ছিল কাশ্মীর ও গোয়ালিয়র।" কাশ্মীরের রাজা জয়নুল আবেদিন এবং গোয়ালিয়রের রাজা তোমর বংশীয় মানসিংহ ছিলেন গুণীদের পৃষ্ঠপোষক।

পাঠান রাজত্বের শেষদিকে ভারতবর্ষে শুরু হয় নানারকম অশান্তি, অত্যাচার, উপদ্রব। এক রাজত্বের শেষে এবং আর-এক রাজত্বের আরম্ভের সময় এরকম হয়। অশান্তির ফলে এদেশের সাংস্কৃতিক উন্নতি বাধা পায়। তবে দিল্লী অথবা অন্যান্য রাজদরবারে আশ্রয় নিয়ে সঙ্গীতজ্ঞরা তাঁদের সঙ্গীত সাধনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উৎসাহে ঘাটতি পড়ল। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে আদিলশাহের রাজত্বকালে তাঁর দরবারে শতাধিক ওস্তাদ প্রতিপালিত হতেন। এই সময়ে সংস্কৃত শাস্ত্রের পার্শী তরজমাও হয়েছিল। এই সময়ে গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ (১৪৮৬-১৫১৬) বিশেষ পরাক্রমশালী হয়ে ওঠেন।

মান সিংহ তোমর

রাজা মানসিংহ তোমর ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এর পরের বছরই জৌনপুরের সুলতান হোসেন শর্কীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য বহলোল লোদীর সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং প্রচুর অর্থ করদান করে রেহাই পান। পরে আবার সিকান্দার লোদীর সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয় এবং সেই যুদ্ধেই তাঁর মৃত্যু ঘটে (১৫১৬ খ্রিঃ)।

প্রায় ত্রিশ বছর রাজত্বকালের মধ্যে মাত্র কয়েক বছর শান্তিতে কাটালেও রাজা মান সঙ্গীতের উন্নতির জন্য যথেষ্ট মনোযোগী হয়েছিলেন। তিনি নিজে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কর্ণেল কানিংহামের "Arcaeological Report of Gowalior" নামক পুস্তক থেকে জানা যায় যে মানসিংহ মালব-গুর্জরী, মঙ্গল-গুর্জরী এবং বহুল-গুর্জরী—এই তিনটি রাগ সৃষ্টি করেন। রাজা মানের রাজসভায় যে সঙ্গীতচর্চা হত তারই ফলস্বরূপ আমরা পাই বিখ্যাত

'মানকুতূহল' গ্রন্থ। সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধীয় এই গ্রন্থখানি সম্পাদনা করেন রাজা মান।

শার্ঙ্গদেব ব্যতীত তানজোরের রাজা রঘুনাথ নায়ক (সপ্তদশ শতাব্দী) ধ্রুব-প্রবন্ধের সংজ্ঞা দান করেছিলেন। সেইসঙ্গে অপর ষোলটি ধ্রুব শ্রেণীর সালগ-সূড় প্রবন্ধেরও লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তাঁর 'সঙ্গীতসুধা' গ্রন্থে।[১] পরবর্তী-কালে প্রাচীনকালের তুলনায় ধ্রুবপদের গায়কীভঙ্গীর পরিবর্তন হয় এবং এটা ঘটে সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা মানসিংহের সময়ে। বলা হয়ে থাকে যে রাজা মানসিংহ তৎকালীন সমাজের রুচি এবং মেজাজের দিকে লক্ষ্য রেখে ধ্রুবপদ প্রবন্ধের প্রাচীন শাস্ত্রীয় রীতির পরিবর্তন করেন। এর ফলে ধ্রুবপদ প্রবন্ধের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়।

রাজা মানসিংহের পূর্বে বৈজুবাওরা, গোপাল নায়ক এবং অন্যান্য সঙ্গীতজ্ঞেরা যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন, নতুন রীতির ধ্রুপদ স্বভাবতই তা থেকে পৃথক। ধ্রুপদ গায়ক না হওয়া সত্ত্বেও আমীর খসরু পর্যন্ত ঐ প্রাচীন রীতির সঙ্গীতের সমঝদার ছিলেন।

১। সালগসূড় লক্ষণম্

সূড় প্রবন্ধো দ্বিবিধোঽত্র শুদ্ধশ্ছায়ালগশ্চেত্যবধারণোঽস্য।
অষ্টাদিতৈলপ্রমুখাঃ প্রবন্ধাঃ প্রোক্তাঃ প্রবীণৈঃ কিল শুদ্ধসূড়াঃ॥

* * *

ছায়ালগাখ্যঃ কিল শব্দ এষ দ্ব্যংশপাদিত্যভবৌ বিশারদনীতৈঃ।
ধ্রুবঃ সমাদস্তু দ্বিতৈকতালী যদ্বত্তদেবং সালগসূড়সংজ্ঞঃ॥

ধ্রুবলক্ষণম্

যেষু হি তুল্যস্বরশুদ্ধযুক্তৌ খণ্ডাবিহোদ্গ্রাহপদাভিধেয়ৌ।
স্যাদস্থায়াখ্যঃ কিল খণ্ড এবঃ স্থায়ীত্বচ্ছন্দস্বরশুদ্ধযুক্তঃ॥
খণ্ডত্রয়ং হি খলু গেয়মেবং খণ্ডদ্বয়েনাভ্যসনস্থিতস্তু।
আভোগখণ্ড পুনরত্র কার্যস্ত্রয়খণ্ডঃ পুনরেব ধাতুঃ॥
দ্বিতীয়খণ্ডঃ পুনরত্র খণ্ডদ্বয়াদ্ধকস্তত্র দ্বিতালাদ্যখণ্ড।
স্থায়ীত্বচ্ছন্দঃ শুদ্ধযুক্তঃস্বস্থাদৃশাভোগপদাভিধেয়ঃ॥
স্থায়েত্বনাম্নাঙ্কিত এব কার্যো মধ্যস্থলেহেব বিশেষ উক্তঃ।
উক্তিখণ্ডাত্মক এব মোহনাভোগণানাবধং দ্বিজেতি।
উদ্গ্রাহখণ্ডান্তিমখণ্ড এব স্থানো ভবেৎস্থ সমস্তমেতৎ।
ধ্রুবস্তু সাধারণিমিদং হি লক্ষ্ম বক্ষ্যামহে ষোড়ষ তদ্বিশেষান্॥

'সঙ্গীতসুধা', পৃঃ ৩৪০-৩৪১

মানসিংহের 'মানকুতুহল' গ্রন্থের সব কটি খণ্ড পাওয়া যায় না। ফকীরুল্লাহ্[১] এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন এবং সেইসঙ্গে সঙ্গীতের কিছু বিবরণ দান করেন। ফকীরুল্লাহ ধ্রুপদের বিস্তৃত বিবরণ দান করেছেন এবং ভারতের কোন কোন স্থানে এই গীত প্রচলিত ছিল তাও উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থের দশটি অধ্যায়ের মধ্যে ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ের তথ্যাবলী প্রধানত শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর' থেকে নেওয়া হয়েছে। তিনি গোয়ালিয়রের শাসনকর্তা মানসিংহকে ধ্রুপদ সৃষ্টিকর্তা বলেছেন (প্রথম অধ্যায়ে)। 'মানকুতুহল' গ্রন্থের রচনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, নায়ক বকসু, ভানু, পাণ্ডুয়ী প্রভৃতি গায়কেরা যখন রাজা মানসিংহের সভায় সমবেত হন তখন তিনি সাধারণ লোকের উপকারের জন্য সে যুগে ব্যবহৃত রাগ-রাগিণী প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করে রাখা স্থির করেন। এই উদ্দেশ্যেই 'মানকুতুহল' গ্রন্থটি রচিত

'মানকুতুহল' গ্রন্থের ফকীরুল্লাহ কৃত অনুবাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সে যুগের রাগ-রাগিণী সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। ছটি শুদ্ধরাগ বা আসল রাগের কথা বলা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে—ভৈঁরো, মালকোষ, হিন্দোল, দীপক, শ্রী, মেঘ। রাগের শ্রেণীবিভাগ এইভাবে দেখানো হয়েছে—

শুদ্ধ, সংকীর (সংকীর্ণ), সালঙ্ক, সম্পুরণ, খাড়ো (খাড়ব) এবং ওড়ো (ঔড়ব)।

শুদ্ধ—উপরোক্ত রাগ ছটি।

সংকীর—যে সব রাগ, রাগিণী ও পুত্র থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

সালঙ্ক—এগুলি ছাড়া যেগুলি অতীতে ও বর্তমানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সুন্দর এবং অতুলনীয়ভাবে রচনা করেছেন। তাঁরা কয়েকটি রাগ একত্র করে একটি উত্তম রাগিণী সৃষ্টি করেন এবং এর নাম দিয়েছেন সালঙ্ক।

সম্পুরণ—সাতটি স্বরের সমাবেশে যে রাগ রচিত হয় তাকে সম্পুরণ রাগ বলে।

খাড়ো—ছটি স্বরের সমাবেশে যে রাগ উৎপন্ন হয় তাকে খাড়ো বলে।

ওড়ো—পাঁচটি স্বরে গঠিত রাগকে ওড়ো বলে।

প্রত্যেক রাগের পাঁচটি স্ত্রী (রাগিণী) এবং ছটি পুত্র আছে কিন্তু শ্রী রাগের ছটি রাগিণী এবং নটি পুত্র। এর সমস্ত বর্ণনা দেওয়ার পর মিশ্র রাগের তালিকা দেওয়া হয়েছে।

১। ফকীরুল্লাহ্ সম্রাট শাহজাহানের সময় থেকে শুরু করে সম্রাট ঔরংজেবের আমলেও বর্তমান ছিলেন। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল বিচিত্র। তিনি একাধারে যোদ্ধা এবং শিল্পী। তিনি কাশ্মীরের সুবেদার হন, মুলতান এবং এলাহাবাদেরও সুবেদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থটি সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে উৎসর্গ করেন। ফকীরুল্লাহ্ ১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে বইটি অনুবাদ করেন—এর সঙ্গে কিছু মন্তব্যও জুড়ে দেন। তাঁর বইটির নাম 'রাগদর্পণ'।

ফকীরুল্লাহ্‌-র গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বিবিধ নিবদ্ধ গীতরূপের বিবরণ আছে। এগুলির বিবরণ তিনি এইভাবে দান করেছেন—

গীত—তিন প্রকার। এর বিষয়বস্তু হল দেবতা ও বাদশাহদের প্রশংসা।

সূর্যপ্রকাশ এবং চন্দ্রপ্রকাশ—এই দু প্রকার গীতের রূপ একই, পার্থক্য হল—একটি সূর্যের স্তব, অপরটি চন্দ্রের। সূর্যপ্রকাশ বারোটি কলায় অর্থাৎ খণ্ডে বিভক্ত এবং চন্দ্রপ্রকাশের ষোলটি কলা বর্তমান। তাল এবং রাগ আবর্তিত হয় খণ্ড অনুসারে।

সর্বতোভদ্র-তে তাল আবর্তিত হয় চারটি ক্রম অনুযায়ী। কয়েকটি কলিতে নিবদ্ধ রাগকদম। এর কোন কোন স্থানে রাগ ও তাল ব্যবহৃত হয়। বিষয়বস্তু হিসাবে নায়িকার সজ্জা বা যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্তমান কালে এটিকে মার্গপদ্ধতির অন্যতম বলে গণ্য করা হয়। দেবতাগণ এর রচয়িতা। এখন এই রীতি লুপ্ত হয়ে গেছে।

দেবতাগণের স্তুতিবাচক গীত ঝোমরা চারটি কলিতে নিবদ্ধ।

স্বরবর্তনী—অর্থহীন শব্দদ্বারা নিবদ্ধ।

দেবতাদের প্রশংসাসূচক গীত প্রবন্ধ দুটি কলিতে নিবদ্ধ। এই গীতে ধ্রুপদের অস্তিত্ব ছিল কিন্তু এ থেকেই যে ধ্রুপদ এসেছে একথা ঠিক নয়।

দেশী পর্যায়ের গীত 'মন্'-এ আত্মপ্রশংসা ও অন্য বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। ধ্রুপদ—গোয়ালিয়রের রাজা মান এই গীতকে গঠন করেন। এই গীত চারটি কলিতে নিবদ্ধ। এই গীত গঠনে সহায়তা করেছিলেন সম্মেলনে আগত নায়ক বক্সু, নায়ক ভানু, মাহ্‌মুদ, কিরণ ও লোহঙ্গ। অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ সকলেই এই ধরনের রচনা করেছিলেন। এই অঞ্চলে এই গীতকে শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। এক শ্রেণীর ধ্রুপদের রাগ ও গীত মার্গপদ্ধতি অবলম্বনে রচিত। অপর শ্রেণীর ধ্রুপদে রাগের প্রাধান্য কম থাকলেও রচনা সংগঠনের কৌলিন্য ঠিক আছে। এই ধরনের সঙ্গীত দেশীয় ভাষায় গাওয়া হয়ে থাকে। দ্বিতীয় প্রকার ধ্রুপদের গায়নবৈশিষ্ট্য নির্ভর করে গায়কের ওপর। সুতরাং এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে উক্ত সম্মেলনে যে গীত সংগঠিত হয়েছিল তা মার্গ ও দেশী উভয়ের মিশ্রণেরই ফল। দেশী ভাষায় সৃষ্ট ধ্রুপদ সময়ানুসারে বা স্থানানুসারে খারোয়া[১] ভাষায় গাওয়া হয়। মার্গীয় রীতির ধ্রুপদের ভাষা সংস্কৃত। দেশী প্রথায় সৃষ্ট ধ্রুপদ গোয়ালিয়র থেকে আকবরাবাদ[২] এবং বারী অঞ্চলে প্রচলিত। এই বিস্তৃতি উত্তরে মথুরা পর্যন্ত, পূর্বে এটাওয়া, দক্ষিণে উনছু এবং পশ্চিমে ভুনাও ও বয়ানা পর্যন্ত। এইসব অঞ্চলে হিন্দুস্তানের ভাষাগুলি শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে বলা হয়।

ফকীরুল্লাহর প্রদত্ত বিবরণের মধ্যস্থিত একটি উক্তি সম্পর্কে একমত হওয়া

১। খারোয়া বলতে খড়ী-বোলী অর্থাৎ নব উর্দুকে বোঝানো হয়। এ থেকে জানা যায় যে নব উর্দু ভাষায় ধ্রুপদ রচিত হয়।

২। আগ্রা।

করেন। তিনি ধ্রুপদ প্রসঙ্গে বলেছেন যে [illegible]
রাজা মানসিংহের পূর্বেই অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীতে ধ্রুপদ গঠিত হয়েছিল। রাজা মানসিংহ লোকের রুচি ও মেজাজের দিকে লক্ষ্য রেখে ধ্রুপদের শাস্ত্রীয় রীতির পরিবর্তন করেন। এই পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় মানকুতুহল গ্রন্থের একটি মন্তব্য থেকে।

'মানকুতুহল' গ্রন্থে শুধু সঙ্গীতের বিবরণ নয়, শ্রেষ্ঠ বাগ্গেয়কারের কি বিশেষত্ব তাও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—"শ্রেষ্ঠ গায়কের ব্যাকরণ, অলংকার, রস, ভাব, দেশাচার, লোকাচার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার, শব্দ-জ্ঞানে তাঁকে হতে হবে প্রবীণ। তাঁর প্রবৃত্তি কলানুবর্তিনী হবে এবং সময়ের সঙ্গে তিনি সামঞ্জস্য স্থাপনে সক্ষম হবেন। তাঁর গান হবে বিচিত্র। প্রাচীন রচনা তাঁর কণ্ঠস্থ থাকবে; তিনি গীত, নৃত্য ও বাদ্যে পারদর্শী হবেন এবং প্রবন্ধ সম্পর্কে তাঁর উত্তম জ্ঞান থাকতে হবে।"

সেকালের রুচি ও মেজাজের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজা মান যে ধ্রুপদের প্রচলন করেন তাতে গোয়ালিয়রে প্রচলিত ভাষা ব্যবহৃত হয়। তিনি গানের বিষয়বস্তু হিসাবে কল্পনাত্মক, বর্ণনাময় এবং প্রণয়মূলক ভাবকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রচলিত একটি গান:

সা জানিয়ারে উও দিন সাল ছে।
বদন মিলায়ে মিলাবাছে বিদুনী
ইউ' বিরহা জিয়া চাল ছে॥…ইত্যাদি

এটি 'পরজ' রাগে এবং চিমা ত্রিতাল-এ গাইবার নির্দেশ আছে।

মানসিংহের সভা-গায়কগণ

রাজা মানসিংহ যে-যুগের রাজা সে-যুগের বাদশাহরা তাঁদের দরবারে সঙ্গীত-নায়কদের স্থান দিতেন বা তাঁদের পৃষ্ঠপোষণা করতেন। তিনি তাঁর দরবারে কয়েকজন সঙ্গীত-নায়ককে স্থান দিয়েছিলেন। আবুল ফজলের বিবরণ অনুসারে রাজা মান সিংহের সভার গায়ক ছিলেন তিনজন—বকসু, মচ্ছু এবং ভন্দু বা ভানু। ফকীরুল্লাহর 'রাগদর্পণ'-এ মানসিংহের সভাগায়ক হিসাবে নাম করা হয়েছে ছজনের: বকসু, ভানু, পাণ্ডোয়, নাম্মুদ, কিরণ, লোহঙ্গ। আবার মীর্জা খাঁ তাঁর রচিত 'তুহফাতুল হিন্দ' বইতে রাজা মানসিংহের সভাগায়ক হিসাবে চারজনের নাম করেছেন: ভানু, পাণ্ডোয় বা পান্দুয়ী, বকসু এবং লোহঙ্গ। এছাড়া রাজা মানসিংহের সভাগায়ক হিসাবে ধুন্দি, চম্পু এবং চণ্ডলশশীর নামও পাওয়া যায়। তবে এঁদের সম্পর্কে কোনও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। মোটামুটি একটি কথা জানা যায় এবং তা হচ্ছে এই যে, এঁদের মধ্যে প্রধান গায়ক ছিলেন নায়ক বকসু। তিনি শুধু গায়ক নন, গীতকার এবং নতুন রীতির উদ্ভাবক ছিলেন। যাঁরা তাঁর নাম করেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

নায়ক বকসু

মানসিংহের সভাগায়কদের মধ্যে প্রধান ছিলেন নায়ক বকসু। বকসুর জন্ম, শিক্ষা এবং মৃত্যু—কোনও বিষয়েই সঠিক কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি যে মানসিংহের সভাগায়ক ছিলেন, একথা আবুল ফজল, ফকীরুল্লাহ্ ও মীর্জা খাঁ তিনজনই বলেছেন। তাঁর সম্পর্কে দুটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। তার একটি হচ্ছে এই যে, মানসিংহের পুত্র বিক্রম সিংহ রাজ্য হারালে তিনি গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শার দরবারে আশ্রয় লাভ করেন। এই দরবারে সদাগুণী রামদাসও ছিলেন। আবুল ফজল প্রমুখ লেখকদের মতে, ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাহাদুর শার দরবারে স্থান পাওয়ার আগে বকসু কালীগঞ্জ রাজদরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এইখানে তিনি বাহাদুরী টোড়ী নামে একটি রাগের উদ্ভাবন করেন। রাজা মানসিংহ গুর্জরী টোড়ীর উদ্ভাবক বলে কেউ কেউ প্রচার করেছেন। এই বাহাদুরী টোড়ী সম্ভবত গুর্জরী টোড়ী এবং তার উদ্ভাবক বকসু। যে কথার উল্লেখ করে মানসিংহকে গুর্জরী টোড়ীর উদ্ভাবক বলা হয় তা হচ্ছে এই যে, মানসিংহ গুজরাটের রাজকন্যা মৃগনয়নীকে বিবাহ করেন এবং গুজরাটের নাম মনে রেখে গুর্জরী টোড়ী নামকরণ করেন। কিন্তু মানসিংহের সময় গুজরাটে কোনও হিন্দুরাজা ছিলেন না। তাই মৃগনয়নীর পক্ষে গুজরাটের রাজকন্যা হওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

আগেকার দিনে রাজদরবারে প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত সুরেরই স্থান ছিল। এদিকে প্রাচীন শাস্ত্রের কুলীন সুরগুলির মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক সুর এক কালে সঙ্কর রাগ বা মিশ্র সুরে উৎপন্ন দেশী সুর ছিল। ক্রমে ঐ সুরগুলি কৌলিন্য অর্জন করতে থাকল। বকসুর কৃতিত্ব এই যে, তিনি শৌরসেন অর্থাৎ আগ্রা, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাকৃত জনগণের সুরকে উন্নত করে দরবারে নিয়ে আসেন। এ ব্যাপারে বাধা এসেছিল প্রচুর। মানসিংহ তোমরের দরবারে বকসু এবং মধুসূদন যখন নবনীতির সঙ্গীত ধ্রুপদকে প্রতিষ্ঠা দান করলেন তখন প্রাচীনপন্থীদের ক্রোধের সীমা রইল না। ক্রোধের আরও কারণ এই যে, এটা ছিল ঢাড়ী মেয়েদের গান। পথে পথে এই গান গেয়ে নারীরা জীবিকা অর্জন করত। তারা ধ্রুপদের সুরে বীরগাথাও গাইত।

এই ঢাড়ী বংশেই বকসুর জন্ম। বকসুর পূর্বপুরুষেরা সঙ্গীত-ব্যবসায়ী ছিলেন। ঢাড়ীরা আদিম অধিবাসী এবং অন্যান্য আদিম অধিবাসীদের মতো ঢাড়ীরাও হিন্দুসমাজের অনাদর পেয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

'রাগদর্পণ'-এর বিবরণ অনুসারে বকসু টোড়ীতে দেশকার যুক্ত করে বাহাদুরী টোড়ী[1] রাগেরই শুধু উদ্ভাবন করেননি, তিনি একটি কানহারা (কানাড়া) এবং একটি কল্যাণ উদ্ভাবন করেন এবং এই দুটি রাগ নায়কী-কল্যাণ এবং নায়কী কানহারা নামে খ্যাত।

---

১. গুজরাট-শাসক বাহাদুর শা-র নাম অনুসারে।

রাজা মানের সভায় থাকার সময় বক্সু যে-সমস্ত ধ্রুপদ রচনা করেন সেগুলি দুই বা তিন এবং গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের দরবারে (১৫২৬-৩৬) তিনি চার তুকের ধ্রুপদ সৃষ্টি করেন। নায়ক বক্সু সম্পর্কে আর একটি তথ্য প্রচলিত আছে এবং তা হচ্ছে এই যে, বাদশা হুমায়ুন মাণ্ডুনগর জয় করে যে ব্যাপক প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন তার মধ্যে বক্সুও ছিলেন। কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞ বলে তিনি শুধু রক্ষাই পেলেন না, সম্রাটের সমাদরও লাভ করলেন।
লাহরি তাঁর 'বাদশা নামা' গ্রন্থে লিখেছেন যে ছন্দ, ঢাড়ী, তোত্র প্রভৃতি আগের যুগের সঙ্গীতজ্ঞদের জানা ছিল। তাঁর সময়ে এইসব গান দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত ছিল। উত্তর ভারতের লোকেরা দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীত রীতিকে ভালোভাবে তারিফ করত না। নায়ক বক্সু-র সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন লাহরি। তিনি তাঁকে উচ্চকোটির ধ্রুপদ গায়ক বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর কথা থেকেই আমরা জানতে পারি যে বক্সু পাখোয়াজের সঙ্গে গান গাইতেন। মূল গান-এর আগে সুন্দরভাবে আলাপ করতেন। গান গাওয়ার সময় বক্সু যে গ্রামে উঠতেন সে গ্রামে সহগায়কদের কণ্ঠ উঠত না। হিন্দুস্থানী ভাষায় এই ধরনের উচ্চ গানকে টিপ বলে।
রাজা মানসিংহের মৃত্যুর পর নায়ক বক্সু গোয়ালিয়র ছেড়ে কালীঞ্জর দুর্গে রাজা কিরাৎ-এর আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে তিনি গুজরাটে যান এবং সুলতান বাহাদুর-এর (১৫২৬-১৫৩৭) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। এই সুলতান বাহাদুর-এর নাম অনুসারেই তিনি বাহাদুরী-টোড়ী রাগ রচনা করেন।

নায়ক ভানু বা ভন্নু

আবুল ফজল, ফকীরুল্লাহ এবং মীর্জা খাঁ তিনজনই আর যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁদের অন্যতম নায়ক ভন্নু বা ভানু। এঁর পরিচয় বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে সঙ্গীতে যে তিনি ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে গুণসেন নামে একজন সঙ্গীতজ্ঞ খুব প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। এই গুণসেনকে ভানুর পৌত্র এবং শিষ্য বলা হয়েছে। তাঁর মৃত্যু কাশ্মীরে ঘটায় অনেকে মনে করেন যে মানসিংহের মৃত্যুর পর ভানু কাশ্মীরে চলে গিয়েছিলেন এবং গুণসেনের আফজল খেতাব থেকে ধারণা করা হয় যে ভানুর বংশ পরে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল।

নায়ক মচ্ছু বা মজরু

মচ্ছু-র নাম নিয়ে কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই নামটিকে কেউ মজরু বা মঝরু এইভাবে উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ বলেছেন এগুলোর কোনটাই ঠিক নয়—শুদ্ধ নাম মামুদ। আবার কেউ কেউ আরও অগ্রসর হয়ে মচ্ছু> মজরু> বৈজু বাওরায় গিয়ে পৌঁছেছেন। মচ্ছু যদি মামুদ হন তবে ফকীরুল্লাহ কথিত মামুদ-এর সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তাঁকে বৈজু

বলা নিতান্তই কষ্টকল্পনা। কারণ, বৈজু অনেক আগের লোক। তাঁকে এই সময় কল্পনা করা যায় না।

পাণ্ডেয় বা পান্দুয়ী

পাণ্ডেয় বিজয়নগরের লোক। ফকীরুল্লাহ এবং মীর্জা খাঁ দুজনেই তার নাম করেছেন, আবুল ফজল তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। কেউ কেউ বলেছেন ইনিই রাজা মানসিংহকে মানকুতূহল রচনায় সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু ফকীরুল্লাহের বিবরণই সঠিক বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন যে, রাজা মানের সভায় ভানু, বক্সু, পাণ্ডেয়, মাহমুদ, লোহঙ্গ, চরণ প্রভৃতি সঙ্গীত-নায়কেরা যখন মিলিত হলেন তখন রাজা মানসিংহ সাধারণের জ্ঞাতার্থে রাগসম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন। এইভাবেই সকলের সহযোগিতায় মানকুতূহল গ্রন্থ রচিত হল। অর্থাৎ রাজা মান তাঁর সভায় গুণীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর গ্রন্থের রূপরেখা তৈরি করেন।

মথুরা-বৃন্দাবনের অবদান

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে শুধু দিল্লী এবং গোয়ালিয়র নয়, আরও কয়েকটি স্থানে ধ্রুপদের ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। জৌনপুরের সুলতান হুসেন শা শর্কীর সময় (১৪৫০-১৫০০ খ্রিঃ) জৌনপুরে ধ্রুপদের ব্যাপক প্রচলন ছিল। রেওয়া এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলেও ধ্রুপদের প্রচলন ছিল। এই রেওয়ার অন্তর্গত বন্ধোগড়-এর রাজা রামচাঁদের সভাগায়ক ছিলেন বিখ্যাত ধ্রুপদী মিয়াঁ তানসেন এবং সেখান থেকেই তিনি আকবরের রাজসভায় যান।

এই প্রসঙ্গে সঙ্গীত অনুশীলনের অন্যতম কেন্দ্রটির কথা উল্লেখ করা দরকার এবং তা হচ্ছে মথুরা-বৃন্দাবন। বৃন্দাবন প্রবন্ধগীতি অনুশীলনের এক বিখ্যাত কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে সেকেন্দার লোদীর রাজত্বের শেষ বছরে চৈতন্যদেব ব্রজমণ্ডল দেখতে গিয়েছিলেন। এর পর যে-সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবন লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে[1] তাঁদের তালিকা এ-রকম—শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, শ্রীজীব। এঁদের সঙ্গে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ভূগর্ভ, যাদবাচার্য, নারায়ণ দাস, জগদানন্দ প্রভৃতি। এঁরা ছাড়াও উত্তর-পশ্চিম ভারতের যাঁরা বৃন্দাবনে দেবমূর্তি স্থাপন এবং গ্রন্থপ্রচার করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বল্লভ ভট্ট, তাঁর দুই পুত্র বিট্ঠলনাথ ও গোপীনাথ, হিত হরিবংশ, হরিদাস স্বামী, হরিরাম ব্যাসজী, খান্দেশ্বরী জগন্নাথ, অন্ধ সুরদাস, সুরদাস মদনমোহন। এঁরা সকলেই ভক্তসাধক, গায়ক ও কবি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় যে, স্বরূপ

---

১ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', আদিলীলা, ১০ পরিচ্ছেদে এই ছয় গোস্বামীর বন্দনা আছে।

দামোদর, রায় রামানন্দ, স্বামী কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ঠাকুর নরোত্তম দাস —এই সমস্ত বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি প্রবন্ধ ধরনের গীতি খুব ভালভাবে গাইতে পারতেন।

বৃন্দাবনে যে-সমস্ত বৈষ্ণব মহাজনেরা ছিলেন তাঁরা গোয়ালিয়র এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলের ধ্রুপদের চর্চা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকবেন, কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বৃন্দাবনে এবং পরবর্তীকালে মথুরায় ধ্রুপদ সঙ্গীতের এক বিশিষ্ট ধারা সৃষ্টি করেছিলেন কৃষ্ণদাস, হরিদাস এবং অন্যান্য কলাবিদেরা।[1]

সাংস্কৃতিক পটভূমিকা

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ভারতবর্ষ—ধর্মের ব্যাপারে তখন একটা ওলট-পালট অবস্থা বিরাজমান। শুষ্ক কর্ম ও জ্ঞানবাদ জনসাধারণের ওপর আর প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল না—ক্ষুদ্রতা সংকীর্ণতা তখন সমাজ ও ধর্ম-জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছিল। জাতীয় জীবনের এই বিভিন্ন সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা সে-যুগে হয়েছিল দুটি পথ ধরে। একটি পথ বিশুদ্ধ পরমব্রহ্মবাদ—যাতে জাতিধর্ম ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা নেই, যা মানুষের মনকে উন্নততর জ্ঞানমার্গে পৌঁছে দেয়; আর এক পথ, মানুষের যে বৃত্তিগুলি নিম্নগামী হয়ে সংকীর্ণতা ও বিরোধের সৃষ্টি করেছিল সেগুলিকে রূপান্তরিত করে বিশ্বেশ্বরের প্রেমের লীলানন্দে ডুবিয়ে দেওয়া। প্রথমটির ফল হয়েছিল বিশুদ্ধ জ্ঞান-ভক্তিবাদ। এই পথ অবলম্বন করেছিলেন কবীর, নানক প্রভৃতি ধর্মগুরুগণ। দ্বিতীয়টির ফল হয়েছিল ভক্তিবাদ, লীলাবাদ এবং এর পরিণতি ঘটেছিল বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপ্তিতে। ভক্তিবাদের পথ যে-সমস্ত সাধকরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম ছিল সঙ্গীত।

কবীর (পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম) নামগান, গুরুভক্তি, সংসার বৈরাগ্য, জীবে প্রেম এবং ভগবানে আত্মসমর্পণ ও ভেদজ্ঞান বিসর্জনের বাণী প্রচার করেছেন। তাঁর গানও রাগরাগিণীযুক্ত কিন্তু বিশুদ্ধ রাগরাগিণীতে তাঁর গান গাওয়া হত কিনা বলা কঠিন। তাঁর গানের দার্শনিক আবেদনই ছিল প্রধান।

১। "It might be the fact Vrindavana drew its inspiration and impetus of the culture of dhrubapada from Gwalior and its adjacent places, but yet it cannot be denied that Vrindavana and afterwards Mathura created the schools of their own, and these schools maintained by a host of Kalavids like Krishnadas, Haridas and others"—Swami Pragnanananda, 'A Historical Study of Indian Music', Calcutta (1965), pp. 177-78.

নানকও তাঁর ধর্মমত প্রচার করেছেন এবং রাগরাগিণীযুক্ত তাঁর গান এই প্রচারের সহায়ক হয়েছিল। নানকের কিছু কিছু গান (যেমন, 'কাহে রে বন খোজন জাঈ', 'জগতমে ঝুঠী দেখী প্রীত' প্রভৃতি) ধ্রুপদ গায়ক এবং খেয়াল গায়কদের কণ্ঠে শোনা যায়।

মীরাবাঈ-এর গানেও রাগরাগিণীর নির্দেশ পাওয়া যায়। তবে তার সঙ্গে রাজস্থানের লোকসঙ্গীতের মিশ্রণ লক্ষণীয়। মীরাবাঈ বৃন্দাবনেও এসেছিলেন এবং তাঁর একটি গানে স্বামী হরিদাসের প্রতিষ্ঠিত 'বাঁকেবিহারী'র নাম আছে—

হমারো প্রণাম বাঁকেবিহারীকো।
মোর মুকুট মাথে তিলক বিরাজৈ
কুণ্ডল অলকা কারীকো॥
... ...
ইহ ছবি দেখ মগন ভই মীরা
মোহন গিরিবরধারীকো॥

মীরাবাঈ পতিভাবে কৃষ্ণকে ভজনা করেছেন। বৃন্দাবনে হরিদাসী, বল্লভাচার্য সম্প্রদায় এই ভাব গ্রহণ করেননি। তাঁরা ভক্তিকেই প্রাধান্য দান করেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা প্রেমকেই বড় করে দেখেছেন। সঙ্গীত সবারই মুখ্য অবলম্বন ছিল।

অবশ্য মথুরা-বৃন্দাবনে ভক্তিবাদী যে গান প্রচলিত ছিল তার রূপ ছিল দুটি —বিষ্ণুপদ বা কীর্তন এবং ভজন। বিষ্ণুপদে চার থেকে আট চরণ পর্যন্ত থাকত। ভজন সঙ্গীত ভক্তিমূলক সঙ্গীত। এই সঙ্গীতের ভাষাই শুধু সরল নয়—সহজ। এতে অলংকারের প্রাবল্য নেই। সহজ-সরলভাবে ভক্ত তাঁর ভক্তি নিবেদন করেন এই সঙ্গীতের মাধ্যমে তাঁর ইষ্টদেবতার উদ্দেশে। বিষ্ণুপদ প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধ গান। অর্থাৎ ধ্রুব-প্রবন্ধের যে পরিবর্তন ঘটছিল, এ গান সেই গান। রাজা মানসিংহের ধ্রুপদের সঙ্গে এর পার্থক্য ছিল। পদের ছন্দই এ ক্ষেত্রে প্রধান ছিল।

স্বামী হরিদাস ✓

বৃন্দাবনধামে অবস্থান করে যে সঙ্গীতসাধক সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি স্বামী হরিদাস। এই মহাপুরুষের জন্মস্থান এবং জন্মসময় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। এ সম্পর্কে বহু মতামত পাওয়া যায়। 'ভক্ত-সিন্ধু'তে বলা হয়েছে হরিদাসের জন্ম ১৫৪১ সংবত (অর্থাৎ ১৪৯৮ খ্রিঃ), গোস্বামীবর্গের দ্বারা প্রমাণিত জন্মকাল ১৬৬৯ সংবত (অর্থাৎ ১৬২৬ খ্রিঃ), স্বামীজীর পরম্পরানুবর্তী মহানুভাবী দ্বারা কথিত জন্মকাল ১৫৩৭ সংবত (অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রিঃ)। স্বামীজী প্রায় ৯৫ বছর বেঁচে ছিলেন এবং ২৫ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন—এ সম্পর্কে বিশেষ মতভেদ নেই।

স্বামীজীর জন্মসময় নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের একটি কথা মনে রাখা দরকার এবং তা হচ্ছে এই যে, স্বামীজীর সঙ্গে সম্রাট আকবরের দেখা হয়েছিল। আকবর বৃন্দাবনে গোস্বামীদের দর্শন করতে গিয়েছিলেন, একথা আমরা নানাভাবে জানতে পারি। Growse তাঁর 'History of Mathura' বইতে (পৃঃ ২৪১) ১৫৭৩-এ বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দর্শনলাভের কথা উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া Gazettier of Muttra (p. 191)-তেও লেখা আছে, "Indeed in 1570 (1627 V, S,) the fame of the Vrindaban Gosains had spread so far abroad that the emperor himself was induced to pay them a visit. Here he was taken blind folded into the sacred enclosure of the Nidhiban, the actual vrinda grove to which the town owes its name and so marvellous a vision was revealed to him that he was fain to acknowledge the place as holy ground, the attendant Rajas expressed a wish to erect a series of buildings more worthy of local divinity and having attained the cordial support of the soverign built four celebrated temples of Govinda Deva, Gopinath, Jugal Kishor and Madan Mohan in honour of the event."

আকবর ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। এদিকে লক্ষ্য রাখলে স্বামীজীর জন্ম পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে বা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে হওয়াই স্বাভাবিক। তাই 'ভক্তসিন্ধু'-তে উল্লিখিত ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দেই হরিদাস স্বামীর জন্মসময় হওয়ার সম্ভাবনা।

হরিদাসের জন্মস্থান কেউ বলেছেন মুলতান, কেউ বলেছেন আলীগড়ের হরিদাসপুর বা হসিয়ারপুর গ্রামে, আবার কেউ বলেছেন ব্রজধামে। 'বৃন্দাবন কথা'[1] নামক গ্রন্থে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই—মুলতানের অন্তর্গত কোন গ্রামে (মতান্তরে উর্চা গ্রামে) ব্রহ্মধীর নামে এক ধনবান ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর পুত্র আনন্দীর গিরিধারী গোপালমূর্তি পূজা করতেন। তিনি মথুরায় এসে বিবাহ করেন। তাঁর পুত্র আশাধীর বৃন্দাবনের পার্শ্ববর্তী রাজপুর গ্রামের গঙ্গাধর নামে একজন ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করে শ্বশুরালয়ে বাস করতে থাকেন। আশাধীরের দুই পুত্র-হরিদাস ও জগন্নাথ। হরিদাস শৈশব থেকেই ধর্মপ্রবণ। তিনি ২৫ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং বৃন্দাবনের অপর পারে মান-সরোবর নামক কুণ্ডতীরে কুটির বেঁধে একাকী ভজন-পূজনে নিমগ্ন হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনে এলে তিনি বৃন্দাবনে আসেন। সেখানে নিধুবনের (নিধিবনের) বিশাখা কুণ্ড থেকে মৃত্তিকা খনন করে বাঁকেবিহারী ঠাকুর পান।

১। পুলিন বিহারী দত্ত, 'বৃন্দাবন কথা', কলিকাতা (১৩৩৬), পৃঃ ২১।

হরিদাস কার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন জানা যায় না। অনেকে আশাধীর (বা আশুধীর)-কেই তাঁর শিক্ষাগুরু বলেছেন। কেউ বলেছেন তিনি শিক্ষাগুরু গন্ধর্ব কৃষ্ণদত্ত স্বামী নামক এক সন্ন্যাসীর কাছে শিক্ষালাভ করেন। তবে স্বামী হরিদাসের গুরু হিসাবে স্বামী কৃষ্ণদাসের নামই বিশেষভাবে প্রচলিত। 'কৃষ্ণদাস' নামে অবশ্য দুজন ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। এঁরা দুজনেই ছিলেন সঙ্গীতশাস্ত্রকার এবং সঙ্গীতসাধক। বৃন্দাবনে ধ্রুপদের প্রচলন ছিল সমধিক। কথিত আছে যে, রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী দুজনেই সঙ্গীত-সাধক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ পরিকরদের মধ্যে রায় রামানন্দ একজন বিদগ্ধ সঙ্গীত-শাস্ত্রকার ছিলেন। পরবর্তীকালে স্বরূপ দামোদর, কৃষ্ণদাস গোস্বামী ও অন্যান্য আরও অনেকে বৃন্দাবন অঞ্চলে নিজস্ব ধ্রুপদ গায়কীর ধারক ছিলেন। ঠাকুর নরোত্তম পরবর্তীকালে এই বৃন্দাবন-মথুরায় ধ্রুপদ গান শিক্ষা করে পদাবলী কীর্তনে বিলম্বিত লয়ে গরাণহাটী শ্রেণীর কীর্তন প্রবর্তন করেন। কিংবদন্তীর পশ্চাতে ইতিহাস লুকোনো থাকে। তাছাড়া বৃন্দাবনের গোস্বামী বৈষ্ণব সাধকগণ অভিজাত ধ্রুপদ গানের অনুশীলক ও ধারক ছিলেন বলে ধরা যায়।

প্রকৃতপক্ষে হরিদাস স্বামীর জন্মসময়, জন্মস্থান এবং তাঁর নামটি নিয়েও নানা গোলযোগ আছে। অন্তত সাতজন হরিদাসকে পাওয়া যায়—হরিদাস (স্বামী), হরিদাস (দ্বিতীয়), হরিদাস (নায়ক), হরিদাস (ডাগুর), হরিদাস (যবন), হরিদাস (কবীরপন্থী), হরিদাস (রায় সনেহী সম্প্রদায়ভুক্ত) প্রভৃতি। এ অবস্থায় হরিদাস স্বামীর জন্মসময় এবং জন্মস্থান নিয়েও যেমন নানা মত, তেমনি তাঁর গুরু নিয়েও। অবশ্য মধ্যযুগের সঙ্গীতসাধকদের অনেকেরই গুরুর সঠিক সন্ধান পাওয়া কঠিন।

বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেই আমরা ভারতবর্ষে চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় দেখতে পাই: রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য, নিম্বার্ক—এঁদের নামানুসারে সম্প্রদায়গুলি গড়ে ওঠে।[১] হরিদাস স্বামী ছিলেন নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত। স্বামীজীকে কেন্দ্র করে যে সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল তার নাম হরিদাসী সম্প্রদায়।

হরিদাস স্বামী যখন বৃন্দাবনে তখন নানা বৈষ্ণবীয় মতবাদ সেখানে পরিব্যাপ্ত। রামানুজের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এবং চৈতন্যদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। গান, নৃত্য ও বাদ্যের

১। Dr. Sushil Kumar Dey, 'Vaisnava Faith and Movement', Calcutta (1961), p. 3.

সহায়তায় বিভিন্ন মতাবলম্বীরা ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন করেছেন, সেই-সঙ্গে বহু মানুষকে আকর্ষণ করেছেন। মতভেদ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সাধকদের মধ্যে মতান্তর ঘটেনি।

বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের তিনজন গায়ক সুরদাস, গোবিন্দস্বামী ও পরমানন্দ দাস। সুরদাস মথুরায় এসেছিলেন এবং বৃন্দাবন সমীপস্থ গোবর্ধনের নিকট পরসোলীতে বাস করেছেন। তাঁর রচিত কিছু বিষ্ণুপদ আছে। গোবিন্দস্বামী কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করে বহু পদ রচনা করেন। পরমানন্দ দাসও গোবর্ধনে বাস করেছেন। পরমানন্দের গান কবিত্বমন্ডিত। গোবিন্দস্বামীও বৃন্দাবনে এসে বাস করেন।

শ্রীরাধা বল্লভীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শ্রীহিত হরিবংশ এবং প্রসিদ্ধ বাণকার শ্রীহরিরাম ব্যাস স্বামীজীর সমকালীন ছিলেন এবং বৃন্দাবনে বাস করতেন। স্বামীজীর সঙ্গে এই দুজনেরই খুব সৌহার্দ্য ছিল। হিত হরিবংশ 'বিষ্ণুপদ' এবং 'হোরি' বিষয়ক কবিতা গান গাওয়ার উপযোগী করে রচনা করেন। এইসব পদ ধ্রুপদ, ধামার এবং ভজনের রীতিতে গাওয়া হত।

এই বল্লভ সম্প্রদায়ের আর একজন কৃষ্ণদাস হরিদাসের সমসাময়িক। হরিদাস বল্লভ সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাসলীলা, 'হোরি' তথা হোলি' প্রভৃতি গায়ন-পদ্ধতির উন্নতিসাধন করেন। কিন্তু কে ধ্রুপদের ধাতু ও তালের নাম পরিবর্তন করেন এবং ধামার নামের উদ্ভাবন করেন তা বলা কঠিন। অথচ 'ধামার' এই সময়ে প্রচলিত ছিল। ধামার তাল বিশেষ। ধ্রুপদ যখন ধামার তালে গীত হয় তখন তাকে ধামার আখ্যাই দেওয়া হয়। ধামারে ধ্রুপদের মতো পরিপূর্ণ স্থির গাম্ভীর্য নেই। এতে শৃঙ্গাররসোদ্দীপক প্রেমগীতিই বেশি রচিত হয়ে থাকে। তাই ধামার একটু লঘু প্রকৃতির এবং এতে অলংকার থাকে বেশি। ধামার তালে ধ্রুপদ রচিত হলে যেমন তাকে ধামার বলা হয়, তেমনি ঝাঁপতালে ধ্রুপদ রচিত হলে তাকে 'সাদ্‌রা' বলা হয়। সাদ্‌রার গতি ত্বরান্বিত। তার চলার গতির ঢং লাফিয়ে চলার মতো। ঝাঁপতালের লয়ে এবং প্রধানত বীররসে প্রধান বিষয় নিয়ে 'সাদরা' রচিত হয়। এতেও তানের অবকাশ নেই।[1]

কেউ কেউ বলেন যে, 'হোরি' গান ধ্রুপদেরই একটি বিশিষ্ট শ্রেণী। বসন্তোৎসব উপলক্ষে ভগবৎলীলা সম্বন্ধীয় ধামার তালাশ্রিত ধ্রুপদকেই 'হোরি' বলা হয়। কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ বলতে আমরা চারটি অঙ্গ (তুক) যুক্ত গানকেই বিশেষভাবে বুঝব। এই চারটি অঙ্গযুক্ত গানই সাধারণভাবে চৌতাল বা চৌতালের অভিজাত গান বলে পরিচিত। হোরি বা হোলি বিষয়ক ধামার গান চারতাল যুক্ত ধ্রুপদ গান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

১। 'হোরী' আর 'হোরি' এক জিনিস নয়। 'হোরি' ধামার তালে গাওয়া বসন্তলীলার ধ্রুপদাঙ্গ গান, আর 'হোলি' ধামার তাল ছাড়া চাঁচর, দীপচাঁদ প্রভৃতি তালে গাওয়া বসন্ত সঙ্গীত।

৯৫ বছর বয়সে স্বামী হরিদাস লৌকিক দেহ ত্যাগ করে নিত্যকুঞ্জ বিহারে লীন হয়ে গেলেন। যদিও সাধারণ লোক তাঁকে এক মহান সঙ্গীতধারার প্রবর্তক হিসাবে জানেন তবুও তাঁর মহান দান তাঁর সাধনক্ষেত্রে। রাধাকৃষ্ণের মাধুর্য ভক্তির চরম বিকাশের কেন্দ্র ছিল বৃন্দাবন। এই বৃন্দাবনে যে পঞ্চম ভক্তিরস মাধুর্য নানারূপে পল্লবিত হয়েছিল তাতে স্বামীজী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভক্তিরসের এক বিশিষ্ট স্থান আছে। তাঁর উপাসনা ছিল সখীভাবের উপাসনা। তাঁর উপাসনায় শ্যাম এবং শ্যামা নিরন্তর থাকতেন। এই রসে রসিক সাধকের অনন্যতাই মূল মন্ত্র—এমনি অনন্যতা যার জন্য সমস্ত সংসার, নিজের ব্যক্তিত্ব, রীতিনীতি, মর্যাদা, ধর্ম, কর্ম, তীর্থ ব্রতাদি সাধন, অন্য দেব-দেবী, এমন কি নিজের উপাস্য ঠাকুরের অন্য রূপ বা অন্য লীলার চিন্তা করারও অবকাশ থাকত না। এই বঙ্কিম পথের সাধক ভক্তিরসের মাধ্যমে আনন্দময় লোকে বিচরণ করতে থাকেন। স্বামীজীর শিষ্য-পরম্পরায় অনেক প্রসিদ্ধ বাণী-রচয়িতা আছেন, যাঁরা বিভিন্ন রাগরাগিণীতে বহু পদ রচনা করেছেন। সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত ও ইতিহাসের ওপর অনেক গ্রন্থ লেখা হয়েছে। এই সমস্ত সামগ্রী হাতে লেখা গ্রন্থে সীমিত আছে। সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত যে-শিষ্যরা দীক্ষা নিয়েছেন তাঁদেরই কেবল বলা হত এবং শুধুমাত্র তাঁদেরই বাণী পাঠের অধিকার দেওয়া হত। সেজন্য এই তত্ত্ব আজও সর্বসাধারণের অজানা রয়ে গেছে। বৃন্দাবনের কয়েকটি স্থানে স্বামীজীর সম্প্রদায় বর্তমান।

(১) শ্রী 'বাঁকেবিহারীজী'র মন্দির—যেখানে বিহারীজীর গোস্বামী স্বামীর উপাস্য ঠাকুরের সেবা পূজা করেন।

(২) নিধিবন—যেখানে স্বামীজী তথা তাঁর কতিপয় শিষ্যের সমাধি আছে।

(৩) শ্রীগোরেলালজীর মন্দির—যেখানে স্বামীজীর শিষ্য-পরম্পরার স্বামী নরহরি দেবজীর সেবা ঠাকুর বিরাজমান।

(৪) শ্রীরসিক বিহারীজীর মন্দির—যেখানে স্বামী রসিকদেবজীর সেব্য ঠাকুর আছেন।

(৫) টট্টী স্থান—যা স্থাপন করেছিলেন স্বামী ললিতমোহিনী দেব।

শেষোক্ত তিন স্থানে স্বামীজীর সম্প্রদায়ের বিরক্ত সাধু বাস করেন। এই বিরক্ত সাধুদের উপাসনার অনন্যতা, নিস্পৃহতা এবং আদর্শ চরিত্র অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিশেষ বিশেষ উৎসবে এবং গুরুদেবের জয়ন্তী দিবসে এখানে 'সমাজ' হয়, যেখানে স্বামীজী ও তাঁর শিষ্য-পরম্পরায় রচিত পদ গাওয়া হয়। শুক্লা ভাদ্র-মাসের ৮ তারিখে, টট্টী স্থানে স্বামীজীর জয়ন্তীতে খুব বড় মেলা হয়। এই অবসরে সর্বসাধারণ এই স্থানে প্রবেশের সুযোগ পায়। স্বামীজীর নিজের মাটির পাত্র কেবল এই দিনে সকলের সামনে আনা হয়। এই সময় কয়েক দিন সমাজ হয় এবং এতে 'বিরক্ত' সাধুরা নিজেদের পরম্পরাগত ধ্রুপদ গেয়ে থাকেন। কেবলমাত্র দুদিন অল্প সময়ের জন্য বাইরের গায়কদের গান করতে দেওয়া হয় যাতে তাঁরা সঙ্গীতের মাধ্যমে স্বামীজীর পূজা করতে পারেন।

সঙ্গীত স্বামীজীর সম্প্রদায়ের উপাসনার একটি মুখ্য অঙ্গ। এই বৈরাগী সম্প্রদায় আপন গুরুমুখে ধ্রুপদ গানকে পরম্পরায় গেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সকলেই প্রতিভাবান ছিলেন এমন নয়। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ সাধনা এবং অভ্যাসের দ্বারা পরম্পরায় সঙ্গীতকে অক্ষুন্ন রেখেছেন। স্বামী হরিদাসজীর গায়কীর স্বরূপ কি ছিল তা জানার কোনও উপায় নেই। একথা বলা সম্পূর্ণ ঠিক নয় যে বিরক্ত সম্প্রদা আজকাল যেভাবে ধ্রুপদ গান করেন তা স্বামীজীর গায়কী। তবে একথা বল যায় যে এই গায়কী বর্তমানের ধ্রুপদ গানের থেকে পৃথক। আর এও সম্ভব যে এই সাধুদের গানের মধ্যে স্বামীজীর নিজের গায়কীর কিছু অংশ বিদ্যমান আছে।

স্বামী হরিদাসের অবদান

স্বামী হরিদাস সিদ্ধান্তের ১৮টি আর শৃংগারের ১১০টি, মোট ১২৮টি পদ রচনা করেন। তাঁর অধিকাংশ পদে 'শ্রীহরিদাসের স্বামী শ্যামকুঞ্জবিহারী' এই কথা পাওয়া যায়। এই কথা ছাড়াও তাঁর কিছু পদ আছে। শৃংগারের পদ 'শ্রীকেলিমাল' নামে সংগৃহীত হয়। এই সংগ্রহের মধ্যে দেড়শো বছরের পুরনো পদও রয়েছে। স্বামীজীর বাণী সম্প্রদায়ের নিকট উপাসনীয় বলে মানা হত এবং শিষ্য-পরম্পরায় তাদের রক্ষা, পুজো তাদের প্রতিলিপি হয়ে আসছে। সুতরাং সংখ্যা আর স্বরূপ সম্পর্কে ভুল করার কারণ নেই। স্বামীজীর নামে এর অতিরিক্ত যে পদ সঙ্গীতপ্রেমীদের সামনে আছে তা হয়তো নকল অথবা অন্য কোনও হরিদাস নামক ব্যক্তির দ্বারা রচিত।

ধ্রুপদের চার বাণীর মধ্যে ডাগর বাণীর আদি প্রবর্তক হিসাবে স্বামী হরিদাসের নাম করা হয়। কিছু সংখ্যক লোক স্বামীজীর সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তার একটা সম্পর্ক দাঁড় করানোর চেষ্টা করে থাকে। এটা ঠিক নয়। স্বামীজী আজন্ম বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হননি। তাঁর 'বিরক্ত' নামে শিষ্যেরা বংশ-পরম্পরায় বৃন্দাবনে আছেন। 'ডাগর' বাণীর সঙ্গে স্বামীজীর কোনও সম্বন্ধ নেই। 'সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম'-এ হরিদাস ডাগর (ডাগর অথবা ডাগুর) নামে কিছু পদ সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু এই ব্যক্তি স্বামী হরিদাস নন। হতে পারে এই বাণী স্বামীজীর বহু বছর পরে ধ্রুপদ গায়কদের প্রসিদ্ধ ঘরানাতে পৃথক পৃথক ভাবে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে এর কিছু সম্বন্ধ আছে এটা প্রমাণ করা দূরে থাক, এ-রকম কথা বলাও কঠিন।

বৈজু বাওরা ও তানসেনের সঙ্গে স্বামী হরিদাসজীর কি সম্পর্ক ছিল তাও বিচার করে দেখতে হবে। সম্রাট আকবর ও তানসেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় সেই প্রাচীন চিত্র থেকে যেখানে স্বামী হরিদাসের সামনে তানসেন বসে আছেন এবং সম্রাট আকবর দাঁড়িয়ে আছেন। এই চিত্রের ২০০ থেকে ২৫০ বছরের প্রতিচ্ছবি দিল্লীর রাষ্ট্রীয় সংগ্রহালয়ে আছে। এই ছবির প্রায় সমসাময়িক বা তার চেয়েও পুরনো এক

প্রতিচ্ছবি কৃষ্ণগড়ের রাজার সংগ্রহালয়ে আছে। এই প্রতিচ্ছবি আরো পুরনো কোনও চিত্রের আধারে তৈরি, এরকম অনুমান করা খুব অযৌক্তিক হবে না। কিন্তু তানসেন কি স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন? তাঁদের সম্প্রদায়ে শিষ্য শব্দের যে অর্থ তাতে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন না। কারণ 'বিরক্ত' ও গৃহস্থ শিষ্যেরা তাহলে অন্যান্য দেবতার স্তুতি করতেন না। অবশ্য তাঁরা স্বামীজীর প্রশংসাসূচক এবং তাঁর উপাস্য ঠাকুর 'বাঁকে বিহারীজী'-র স্তুতিবাচক পদ রচনা করেছেন। এ থেকে মনে হয় কিছু সময়ের জন্য তাঁরা স্বামীজীর কৃপা লাভ করেছিলেন এবং সম্ভবত স্বামীজীর জন্যই সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁরা কিছু পেয়েছিলেন।

স্বামীজী শৃংগারের ১১০ পদের রাগ-বিভাজন করেছেন এইভাবে—

কানাড়া—৩০	গৌড়—২
কেদারা—২২	বসন্ত—১
কল্যাণ—১২	গৌরী—৬
সারঙ্গ—১১	নট—২
বিভাস—১০	বিলাবল—২
মল্লার—৮	

এই রাগ-বিভাজন প্রমাণ সাপেক্ষ। কোনও অজ্ঞাত কবির এক প্রাচীন কবিতায় এই সংখ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সিদ্ধান্তের ১৮ পদের রাগ অনেক পুঁথিতে নির্ণয় করা হয়নি। একটি পুঁথিতে রাগ-রাগিণীর সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে—

বিভাস—৪
বিলাবল—১
আশাবরী—৭
কল্যাণ—৬

হরিদাস স্বামীর রচিত পদ 'সিদ্ধান্ত' ও 'কেলিমাল' গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। রাজা মানের সময় ধ্রুপদের যে পরিবর্তন হয় হরিদাস স্বামীর গান সে ধরনের নয়—তিনি পূর্ববর্তী প্রথায় প্রবন্ধ ভিত্তিক ধ্রুপদ গাইতেন। তাঁর পদে তাল মুখ্য, গানের ছন্দ গৌণ। তাঁর পদে সালগসূড় প্রবন্ধের মত চারটি ধাতু ছিল এবং আভোগ অংশে গায়ক ও লেখকের কথা থাকত। তবে অঙ্গ ব্যবহার করা হত কম। তাঁর গানের ভাষা ব্রজভাষা। তবে এই ভাষা শুদ্ধ এবং ভাবগম্ভীর। তাঁর পদলালিত্যও অপূর্ব। যেমন—

পূরিয়া। চৌতাল
সহজ জোরি প্রগট ভই,
জো রংগ কী গৌর শ্যামঘন দামিনী জৈসে।
প্রথম হূতি আজহূ অনেক রহে হৈ নটার কৈসে,
অংগ-অংগ কে উঘরই সুখরই সুন্দর তা বৈসে বৈসে।
শ্রীহরিদাস কে স্বামী,
শ্যাম কুঞ্জবিহারী অদ্ভুত রূপ অনৈসে।

হরিদাস ধ্রুপদকে গভীর অন্তর্মুখী করে তোলেন। তার আগে ধ্রুপদ ছিল হালকা; তার প্রেরণা ছিল সাধারণের মনোরঞ্জন। হরিদাসই ধ্রুপদকে স্থিতিধর্মী ধ্যানধর্মী করে সাধনার অঙ্গ করে তোলেন। তখনই ধ্রুপদ মার্গসঙ্গীত হিসাবে পরিগণিত হয়। এই পরবর্তী ধ্রুপদ সম্বন্ধে দিলীপ কুমার রায় লিখেছেন—"যথার্থ ধ্রুপদের মর্মবাণী বিধৃত শান্তিরসে, গাম্ভীর্যে, ভাবসংযমে, উদার অথচ নিবিড় সন্ন্যাসে, করুণ অথচ প্রসন্ন বৈরাগে * * * * * ধ্রুপদ হল স্বভাব অন্তর্মুখী। যে গাছলতা ওর নেই খেয়াল বা টপ্পার মতন। ও শান্তিময়, গহনবাসী। ও প্রেরণা খোঁজে বহির্জীবনের অভিঘাতে সংঘাতে, আনন্দমেলায় নয়: খোঁজে অন্তরের ধ্যানস্তব্ধ, ভাবগাঢ়, সংযতপ্রভ স্বধালোকে, লতা পল্লবের প্রগলভতায়, বন্যা জোয়ারের কলহাস্যে, পিক পাপিয়ার কুহুধ্বনিতে ওর মুক্তি নেই। ওর মুক্তি—গম্ভীর কঠিন স্থাপত্যকারুর অচপল স্পন্দে, সমাহিতিতে, শান্তিতে, সংযমে।" [সাঙ্গীতিকী, পৃঃ ৪২-৫৮]

সপ্তম অধ্যায়

ধ্রুপদের চরম উন্নতির যুগ

আমরা দেখেছি যে রাজা মানসিংহের সময় ধ্রুপদের ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। তবে মোগল যুগেই ধ্রুপদ সঙ্গীতের চরম উন্নতি ঘটে বা ধ্রুপদের নবজন্ম হয়। ভারতের ইতিহাসে মোগল যুগ নানা দিক থেকে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। এই যুগ শুধু নতুন সৃষ্টির নয়—এই যুগ তুর্ক-আফগান যুগের সম্প্রসারণ, অর্থাৎ আগের যুগে যা শুরু হয়েছিল এই যুগে তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

এই যুগে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। এই যুগেই 'দীন-ইলাহী' ধর্মমত প্রচার করেন সম্রাট আকবর। এই যুগে সাহিত্য, স্থাপত্য, শিল্প, চিত্রকলা, সঙ্গীত সব-কিছুরই বিকাশ ঘটে। এই সব ব্যাপারেই আগের যুগে যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিশ্রণ শুরু হয় তা এ যুগেও অব্যাহত থাকে। মোগল সম্প্রদায়ের প্রায় সবাই শিল্প-সাহিত্য ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর গান রচনা করতেন। হুমায়ুন তাঁর প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গীত পছন্দ করতেন বলে জানা যায়।

আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান তিন জনেই সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এর ফলে মোগল যুগে সঙ্গীতের ব্যাপক প্রসার এবং উন্নতি সম্ভব হয়। এদিক থেকে একমাত্র ব্যতিক্রম ঔরঙ্গজেব। তিনি সভাগায়কদের পদচ্যুত করেন এবং তাঁরা এর প্রতিবাদে সঙ্গীতের এক শোকযাত্রার অনুষ্ঠান করেন। ঔরঙ্গজেব

সঙ্গীতকে শুধু নিরুৎসাহই করেননি, সঙ্গীতচর্চা বন্ধ করেও দিয়েছিলেন।[১] শুধু তাই নয়, তিনি ধর্ম-সঙ্গীতও নিষিদ্ধ করেন।[২]

মোগল যুগে সঙ্গীতের যে ব্যাপক প্রসার ঘটে, তা শুধু উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, দক্ষিণ ভারতেও এর প্রসার ঘটে। এ প্রসঙ্গে বিজাপুর, বিদর, আহম্মদনগর, গোলকুন্ডা প্রভৃতি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মোগল সম্রাটদের শাসনকাল, বিশেষ করে সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিঃ) ভারতীয় সঙ্গীতের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। নতুন নতুন সঙ্গীতধারার সৃষ্টি হয় এই যুগে। হিন্দু সঙ্গীত এবং মুসলমান সঙ্গীতের মিশ্রণও হয় এই যুগে। সব দিক থেকেই ভারতীয় সঙ্গীত বৈশিষ্ট্য লাভ করে এই যুগে।

বিজাপুরের আদিলশাহী সুলতানেরা সঙ্গীতপ্রীতির জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। বিজাপুর মার্গসঙ্গীত, বিশেষত ধ্রুপদ-এর চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহিম আদিলশাহ (দ্বিতীয়) আকবরের সমসাময়িক ছিলেন এবং তিনি সঙ্গীতপ্রেমী ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সম্রাট আকবরের নির্দেশে আসাদ বেগ ১৬০৩-০৪ খ্রিস্টাব্দে বিজাপুরের রাজসভা পরিদর্শনে যান। তাঁর বিদায় উপলক্ষে যে ভোজসভার আয়োজন করা হয় তাতে সঙ্গীত পরিবেশনের ব্যবস্থা ছিল। ইব্রাহিম সঙ্গীতের মধ্যে এমনভাবে ডুবে গিয়েছিলেন যে তিনি আসাদ বেগের অনেক প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারছিলেন না। তাঁদের মধ্যে যে আলোচনা হচ্ছিল তা সবই সঙ্গীত এবং সঙ্গীতজ্ঞদের সম্পর্কে।[৩]

ডঃ নাজির আহম্মদ তাঁর সম্পাদিত ইব্রাহিম আদিলশাহ কর্তৃক রচিত 'কিতাব-ই-নৌরস' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন যে ইব্রাহিম ধ্রুপদ গানে রীতিমত পারদর্শী ছিলেন। তাঁর এই গ্রন্থ মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং সম্রাট কিতাব-ই-নৌরসের অন্তর্ভুক্ত ধ্রুপদ আদিলশাহ বক্তার খাঁ-এর কাছ থেকে শিখেছিলেন বলে তিনি দাবি করেছেন। ডঃ নাজির আহম্মদ বলেছেন, "The Sultan's achievements in music will be best judged from his own composition, the Kitab-i-Nawras.

১। "Aurangzeb positively discouraged music and placed a ban upon it."—'An Advanced History of India', by R. C. Mazumdar, H. C. Roychoudhuri, Kalikinkar Dutta, New York (1965), p. 60.

২। "He (Aurangzeb) also prohibited religious music on the day at the Profet's birth."—Atulananda Chakrabarti, 'Hindus and Musalmans of India,' Calcutta (1940), P. 139.

৩। Swami Prajnanananda, 'A Historical Study of Indian Music', Calcutta (1965), p. 178.

He has stated by Jahangir to have learnt this art from Bakhtar Khan, a notable statesman at the court of Bijapur, to whom the Sultan is stated to have married his niece subsequently." তিনি আরও বলেছেন, "Unfortunately the names of only two of the musicians have survived ; the first is Bakhtar Khan about whom we have spoken earlier. He is stated to be the King's teacher in Dhrupada form of music. But he seemed to be younger than the Sultan himself. * * The other musician at the court of Ibrahim was Chand Khan."[১]

ইব্রাহিম সঙ্গীতজ্ঞদের যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। বক্তার খাঁ-এর সঙ্গে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহদানই এর প্রমাণ। উপরে যে সমস্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে শুধু মোগল দরবারেই নয়, ইব্রাহিম আদিল শাহ (দ্বিতীয়)-র রাজ্যেও ধ্রুপদের স্থান গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আদিলশাহ-র গানের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তানসেন প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞদের মতো রাজপ্রশংসাসূচক গান তিনি করেননি। তাঁর গানে সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতির স্তব আছে, পীর গঙ্গাধর-এর বন্দনা আছে, রাগ বর্ণনা আছে, প্রাকৃতিক রূপ বর্ণনা এবং মিলন-বিরহ সম্পর্কিত ভাবাত্মক কল্পনাও আছে। তাঁর গানে অপূর্ব কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ তাঁর একটি গান এখানে উদ্ধৃত করা যায়—

উপমা সুন্দরী সোহে সুন সদা বরসাত।
বিজলিয়া চমকে জগা জোতসোঁ বখিনী দাঁত ॥
কিসবত রংগরংগ দিসে জ্যু বাদল
ছায়ে বরসে মেঘ সো থোরে জল ॥
গরজে সো তু কহে রাগ মলহার
ইবরাহিম মোর রাঝি নাচে পুকার ॥

আদিলশাহ-র অধিকাংশ গানই কানাড়া রাগে রচিত। রাগ নামের পূর্বে তিনি নৌরস কথাটি ব্যবহার করতেন। সম্ভবত এই কারণেই পরবর্তীকালে তাঁর কানাড়া রাগের গান নৌরসী কানাড়া নামে পরিচিত হয়। "আদিল শাহর গানে সাধারণত তিনটি ধাতু বা তুক্ পাওয়া যায়। তিনি এদের নাম ঠিকমতো দেননি ; প্রথমটির নাম নেই—সেটিকে স্থায়ী বলতেন কি ধ্রুব বলতেন তা জানা যায় না ; দ্বিতীয় তুক্‌কে আদিল শাহ বলেছেন 'বৈন', কচিৎ 'অন্তরা' ; তৃতীয় তুকের নাম আভোগই আছে। এই তিনটি তুক্ দেখে জাহাঙ্গীর তাঁর 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'তে গানগুলিকে ধ্রুপদ ও খ্যালের মধ্যবর্তী বলেছেন।"[২]

১। Kitab-i-Nauras by Ibrahim Adil Shah, edited by Dr. Nazim Ahmed, New Delhi (1956), pp. 48, 52-53.

২। ড. বিমল রায়, ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা (১৩৫৭), পৃঃ ১৫।

এক ... সাহেব নামে তানসেনের নাম যুক্ত হতে দেখা যায়। শের শাহ্-এর মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জালাল খান (মৃত্যুর সময় তিনি রেওয়াতে ছিলেন) সুলতান ইস... —এই নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ... হয়। তখন মুবারিজ খান (শের শাহের ভা... মহম্মদ আদিল শাহ্ নামে সিংহাসন অধিকার করেন। ... সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন এবং খুব ভাল পাখোয়াজ বাজাতে পারতেন। বদাওনি-র বিবরণ অনুসারে বাজবাহাদুর এবং তানসেন তাঁর সঙ্গীত-... ছিলেন। বদাওনি লিখেছেন—"Adil was so highly skilled in singing and dancing that Miyan Tansin, the well-known Kalan-wat[1] who is a past master in this art used to own to ... pupil, ... az Bahadur, son of Suzawal Khan, who was also one of the most gifted men of his age and had no equal in this life-wasting[2], accomplishment acquired the art (of music) from 'Adli[3]'".

বদাওনির বিবরণ থেকে আরও জানা যায় যে রামদাস নামে লক্ষ্ণৌ-এর একজন সঙ্গীতজ্ঞ খান খানান বৈরাম খান্-এর প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর তানসেনের মতোই মিষ্টি ছিল। তিনি বৈরাম খান্-এর কাছ থেকে গায়ক হিসাবে এক লাখ তংকা পুরস্কার পেয়েছিলেন।[5] বদাওনি আরও বলেছেন যে সেখ বংদু নামে একজন গায়ক সঙ্গীতে তানসেনের চেয়ে বেশি কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন এবং আকবর তাঁকে এক হাজার টাকা পারিতোষিক দান করেন। শেখরা সঙ্গীত এবং নৃত্যপ্রিয় ছিলেন। সুলতানী আমলে সুলতানের

১। কলাবন্ত অথবা কালোয়াত।

২। বদাওনির এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে তিনি সঙ্গীতকলাকে ভালো চোখে দেখেননি।

৩। বদাওনি-র মত অনুসারে 'আদলি' ছিল আদিল শাহের জনপ্রিয় নাম।

৪। 'Muntakhabu-T-Twarikh', vol. 1, by Abdul-L-Quadir Ibn-I-Muluk Shah Known as Al-Badaoni, translated by W. H. Lowe, M. A., published by RAAS, Calcutta (1898), p. 557.

৫। 'Khan Khanan, although he had nothing in his treasures, gave at one sitting a lac of tankhas worth in money and goods to Ram Das of Lakhnou, who was one of the musicians of Aslim Shah and one that in music and song you might term a second Miyan Tan Sin.—'Muntakhabu-T-Twarikh', Vol. II by Abdul-L-Quadir Ibn-I-Muluk Shah Known as Al-Badaoni translated by W. H. Lowe, M. A., Published by R. A. S. Calcutta (1924), p. 37.

বহাউদ্দীন জাকেরিয়া একজন নামকরা সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে মূলতানী রাগ এই নামকরণটি তাঁর নির্দেশই হয়। আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি শেখ হাজী মহম্মদ গওস। তানসেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা সুবিদিত।
আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী'তে আকবরের সভাগায়কদের তালিকায় উল্লেখ বাজবহাদুর-এর নাম উল্লেখ করে তাঁকে "একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক"[১] হিসাবে ঘোষণা করলেও তাঁকে অন্যান্য সভাগায়কদের মতো পেশাদার সঙ্গীতজ্ঞ রূপে গণ্য করা ঠিক নয়। কারণ তিনি ছিলেন মালবের শাসনকর্তা। রানী দুর্গাবতীর কাছে পরাজিত হয়ে তিনি বিলাসে ডুবে যান। এই সময়েই নৃত্য, গীত তাঁর প্রিয় হয়ে ওঠে। 'তবাকৎ-ই-আকবরী' গ্রন্থের লেখক খাজা-নিজামুদ্দীন আহম্মদ বলেছেন—"Baz Bahadur was unrivalled in his time, in the art of music and in various kinds of Hindi tunes. The greater part of his time was spent in the society of prostitutes and dancing women in all kinds of vice".[২]
আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায় যে বাজবহাদুরের সভাগায়ক ও নর্তকীরা সমগ্র ভারতবর্ষে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে রূপমতীর নাম সবচেয়ে পরিচিত। এই রূপমতী ও বাজবহাদুরকে ঘিরে মালব এবং রাজস্থানের পল্লী-সঙ্গীতে মধুর কাহিনী ছড়িয়ে আছে। বাজবহাদুরের সঙ্গে রূপমতীর কি সম্পর্ক ছিল ইতিহাসে তা স্পষ্ট নয়। খাজা নিজামুদ্দীন রূপমতীকে বাজবহাদুরের 'প্রিয়তমা পত্নী'[৩] বলে উল্লেখ করেছেন।
বাজবহাদুরের প্রকৃত নাম বায়াজিদ। তাঁর পিতার নাম শুজাত খাঁ (ইতিহাসে সাধারণত তিনি সাজাওয়াল খাঁ নামে পরিচিত)। ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে শের শাহ মালব অধিকার করেন এবং শুজাত খাঁকে এই প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাজবহাদুর মালবের শাসনভার গ্রহণ করেন। "তাঁর গানে রাজা মানের সঙ্গীত-পদ্ধতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই প্রভাব তাঁর পত্নী রূপমতীর গানের ভাবায়, তানে ও ভাবেও বর্তমান আছে। এই প্রকৃতির গানের জন্য বাজবহাদুরকে খ্যাল গায়ক বলা হয়। আসলে কিন্তু এ গায়ন-রীতি ধ্রুপদেরই। আর বাজবহাদুর আপন বিশিষ্ট ভঙ্গীতে গান করে এই রীতিকে বাজ-খানী রীতি নামে পরিচিত করিয়েছিলেন।"[৪]

১। "Bazbahadur ruler of Malwa, a singer without rival." —Abul Fazl, Ain-i-Akbari, translated by Blochmann, Delhi (1965), p. 681.

২। Tabaquat-I-Akbari, Vol. II, by Kwajah Nizamuddin Ahmad, translated by B. Dey, Published by RAS Calcutta (1936), P. 252.

৩। Ibid, P. 252.

৪। ডঃ [illegible], 'ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ', প্রথম খণ্ড, কলিকাতা ([illegible]), পৃঃ [illegible]।

আকবরের রাজত্বকালের ষষ্ঠ বর্ষে মালব অভিযানের [illegible] নির্দেশ দেন। সারংপুরের কাছে এক যুদ্ধে বাজবাহাদুর পরাজিত হন। তিনি মালব পুনরাধিকার করেন বটে, কিন্তু পুনরায় তাঁকে পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে হয়। কোনরকম সাহায্য সংগ্রহ করতে না পেরে আকবরের রাজত্বকালের পঞ্চদশ বর্ষে তিনি আকবরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁকে প্রথমে একহাজারি, পরে দুইহাজারি মনসবদার পদে উন্নীত করা হয়। আকবরের সেনাদলের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধের সময়েই রূপমতীর মৃত্যু ঘটে।[1] বাজবাহাদুর এবং রূপমতীর সমাধি উজ্জয়িনীতে একটি সরোবরের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থান করছে।

আইন-ই-আকবরী রচয়িতা আবুল ফজলের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে, আকবরের রাজসভায় ছত্রিশ জন প্রধান সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। এঁরা হলেন:

তানসেন, বাবা রামদাস, সুভান খাঁ, সুজান খাঁ, মিঞা চাঁদ, বিচিত্র খাঁ, মহম্মদ খাঁ ঢাড়ী, বীরমণ্ডল খাঁ, বাজবহাদুর, শাহাব খাঁ, দাউদ ঢাড়ী, সরোদ খাঁ, মিঞা লাল, তানতরঙ্গ খাঁ, মুল্লা ইশাক ঢাড়ী, উস্তা দোস্ত, নানক জারজু, পুরবী খাঁ, সুরদাস (বাবা রামদাসের পুত্র), চাঁদ খাঁ, রঙ্গসেন, শেখ দেওয়ান ঢাড়ী, রহমতুল্লা, মীর সঙ্গীদ আলী, উস্তা ইউসুফ, কাসীম, তাশ বেগ, সুলতান হাফিজ হোসেন, বহরম কালি, সুলতান হাসিম মশাদ, উস্তা শা মহম্মদ, উস্তা আমিন হাফিজ খাওজালি, মীর আবদুল্লা, পীর জাদা, উস্তা মহম্মদ হোসেন।

এই ছত্রিশ জন সঙ্গীতজ্ঞের মধ্যে বীরমণ্ডল খাঁ, শাহাব খাঁ, উস্তা দোস্ত মশাদ, পুরবী খাঁ, শেখ দেওয়ান ঢাড়ী, মীর সঙ্গীদ আলী, উস্তা ইউসুফ, কাসীম, তাশ বেগ, বহরাম কালি, সুলতান হাসিম, উস্তা শা মহম্মদ, উস্তা আমিন, মীর আবদুল্লা, উস্তা মহম্মদ হোসেন—এঁরা ছিলেন বাদ্যযন্ত্রী। আর সবাই ছিলেন গায়ক। আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায় যে আকবরের সভায় বহু সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। আবুল ফজল নিজেই বলেছেন যে তিনি মাত্র ৩৬ জন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের নাম করেছেন। এইসব সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে হিন্দু, ইরাণী, তুরাণী, কাশ্মীরী প্রভৃতি জাতির সঙ্গীতজ্ঞ তো ছিলেনই, পুরুষ এবং নারী উভয় শ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞরাই তাঁর সভা আলোকিত করেছিলেন। সঙ্গীত-সম্রাট তানসেন ছিলেন এঁদের মধ্যমণি।

১। এই যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন আধম খান। 'তবাকৎ-ই-আকবরী' (রচয়িতা খাজা নিজামউদ্দীন আহমদ) গ্রন্থে বলা হয়েছে যে বাজবাহাদুরকে পরাজিত হতে দেখে এক খোজা রূপমতীকে তরবারির আঘাতে হত্যা করার চেষ্টা করে। কারণ ভয় ছিল যে রূপমতী আধম খানের হাতে পড়তে পারেন। কিন্তু তরবারির আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়নি। তিনি সতীত্ব রক্ষার জন্য বিষ খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন।—'Tabaquat-I-Akbari' by Khawajah Nizamuddin Ahmad, Vol. III, translated by B. Dey, Calcutta (1936), P. 253.

আকবরের রাজসভায় বেশ কিছু সংখ্যক গায়ক ছিলেন গোয়ালিয়রের। বাবা রামদাস, শুভান খাঁ, সুজ্ঞান খাঁ, মিঞা চাঁদ, বীরমণ্ডল খাঁ, শাহাব খাঁ, মিঞা লাল, নায়ক চর্জু, চাঁদ খাঁ প্রভৃতি গোয়ালিয়র থেকে এসেছিলেন, মশাদ থেকে এসেছিলেন উস্তা দোস্ত, হাফিজ খাজা সুলতান হাসিম, হরাৎ থেকে এসেছিলেন বাহরাম কালি, খুরাশান থেকে এসেছিলেন পীরজাদা।

তানসেন

ভারতবর্ষের একাধিক খ্যাতিমান সঙ্গীতজ্ঞের জীবন কিংবদন্তীর ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যাঁকে সম্রাট বলা হয় তাঁর জীবনও তার ব্যতিক্রম নয়। তানসেনের জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ, প্রকৃত নাম, তাঁর পিতৃপরিচয়, ধর্মান্তর গ্রহণ, তাঁর গুরু—সমস্ত বিষয়েই নানা মত বর্তমান।

প্রথমত, তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ। তানসেনের জন্মসময় সম্পর্কে যে যে খ্রিস্টাব্দ উল্লিখিত হয়েছে তা হল—১৪৯৩, ১৫০৬, ১৫২০, ১৫৩১, ১৫৫৮। এগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে এক্ষেত্রে দুটি কথা মনে রাখতে হবে: (১) তিনি আকবরের রাজসভায় যখন আসেন তখন তিনি শুধু বিবাহিতই নন, তাঁর পুত্রেরাও সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন। (২) তানসেন যখন আকবরের দরবারে আসেন তখন তিনি অতি বৃদ্ধ ছিলেন না। কারণ সঙ্গীতপ্রতিভা যদি তাঁর একেবারেই নষ্ট হয়ে যেত তাহলে আকবরের দরবারে এসে তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন না। আকবরের রাজত্ব শুরু হয় ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে এবং তানসেন আকবরের দরবারে আসেন ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে। এ অবস্থায় তানসেনের জন্ম ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে হবারই সম্ভাবনা। আবুল ফজল ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাঁর আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ রচনা করেন। সে সময় তানসেন বেঁচে ছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল সম্ভবত ১৫৮৫ থেকে ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। তানসেনের মৃত্যুর পর তাঁর দেহ গোয়ালিয়রে বিরাট পর্বত-দুর্গের পাদদেশে মহম্মদ গওসের সমাধির পাশে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করা হয়।

তানসেনের নাম নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই। কেউ বলেছেন 'তানসেন' উপাধি বিশেষ। এই উপাধি কে দিয়েছিলেন তা নিয়েও মতভেদ আছে। ফজলআলির 'কুল্লিয়াৎ-গোয়ালিয়র'-এর অনুসরণে বলা হয়েছে যে তানসেন উপাধি তিনি পেয়েছিলেন গোয়ালিয়র-রাজ বিক্রমজিতের দরবারে। আবার কেউ বলেছেন সম্রাট আকবর তানসেনকে এই উপাধি দান করেন। বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী তাঁর 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাস' (১৯৬৫) নামক গ্রন্থে এই তথ্য লিপিবদ্ধ করে বলেছেন, "এই উপাধির অর্থ যিনি সঙ্গীতে 'তান' (সুর লহরী) দ্বারা 'সৈন' অর্থাৎ হৃদয় দ্রবীভূত করতে পারেন তিনিই তানসেন।" (পৃঃ ৩৮-৩৯)।

'তানসেন' উপাধি হিসাবে ধরলেও তানসেনের প্রকৃত নাম এবং তাঁর পিতার নাম

নিয়েও গোলযোগ কম নয়। কেউ বলেছেন তাঁর নাম রত্নাকর পাণ্ডে এবং তাঁর পিতার নাম মুকুন্দরাম পাণ্ডে বা মকরন্দ পাণ্ডে বা পাঁড়ে। তানসেনের নাম বলা হয়েছে রামতনু।[১] আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার আগে তাঁর নাম ছিল তন্নামিশ্র।[২]

তানসেন কোন ধর্মাবলম্বী তা নিয়েও নানা রকম কাহিনী প্রচলিত। এইরূপ বলা হয় যে, তাঁর পিতা কাশীধামে কথকতার দ্বারা জীবিকা অর্জন করতেন। পণ্ডিত ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তানসেনের আগেও তাঁর কয়েকটি সন্তান জন্মেছিল কিন্তু একটিও বাঁচেনি। তিনি তাই গোয়ালিয়রে হজরৎ মহম্মদ গওস নামক একজন পীরের শরণাপন্ন হন। এই পীর প্রদত্ত মাদুলির বলেই তানসেন জন্মগ্রহণ করার পর মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পান। এই পীরের প্রভাবেই নাকি তানসেন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর নাম হয় মহম্মদ আতা আলী খাঁ। কেউ কেউ বলেন হোসেনী ব্রাহ্মণী নামক এক মুসলমান রমণীকে বিবাহ করার জন্য তাঁকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল। এই হোসেনীর হিন্দু নাম ছিল প্রেমকুমারী। তাঁর পিতা সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সপরিবারে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তর গ্রহণের পর প্রেমকুমারীর ইসলামী নাম রাখা হয় 'হোসেনী'।[৩] এই সময় গোয়ালিয়রের অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। আইন-ই-আকবরীতে যে ছত্রিশ জন সঙ্গীতজ্ঞের নাম আছে তাঁদের মধ্যে পনেরো জন গোয়ালিয়রের। এঁদের মধ্যে ছিলেন তানতরঙ্গ খাঁ, শ্রীজ্ঞান খাঁ, বিচিত্র খাঁ, বীরমণ্ডল খাঁ, মিঞা চাঁদ, পুরবীন খাঁ, চাঁদ খাঁ প্রভৃতি।

তানসেনের গুরু

তানসেনের সাঙ্গীতিক জীবন শুরু গোয়ালিয়রে। এ পর্যন্ত যে-সব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে তানসেন বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামী এবং গোয়ালিয়রের শেখ মহম্মদ গওস—এই দুজনের কাছেই সঙ্গীত শিক্ষা করেন। হরিদাস স্বামী যেমন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মহান উত্তরাধিকার বহন করেছেন, গওসও তেমনি বহন করেছেন পারস্য সঙ্গীতের উত্তরাধিকার। তানসেনের সঙ্গীতে আমরা এই দুই ধারার সমন্বয় দেখতে পেয়েছি। গওসের সঙ্গে তানসেনের সম্পর্ক জন্মের পর থেকেই—একথা আগেই বলা হয়েছে।

১। বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান', কলিকাতা (১৩৬৪), পৃঃ ১২।

২ ...া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করনেকে পূর্ব তন্নমিশ্রকে নামসে পুকারে যাতে থে।"—বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে, 'উত্তর ভারতী সঙ্গীতকা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', হাথরাস, ইউ. পি, (১৯৬৬), পৃঃ ৩০।

৩। বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাস', পৃঃ ৩৫-৩৭ এবং হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান, পৃঃ ১২।

কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে তানসেন গওসের কাছে শুধু সঙ্গীতই শিক্ষা করেননি, গওসের অতুল সম্পত্তিরও অধিকারী হয়েছিলেন তিনি (বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাস', পৃঃ ৫৮)।

বারাণসী ধামে তানসেনের সঙ্গে হরিদাস স্বামীর দেখা হয়—একথা কেউ কেউ বলেছেন ('হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান', পৃঃ ১৩)। আবার কেউ বলেছেন তাঁদের প্রথম দেখা হয় গোয়ালিয়রে। আবার এমন মতও প্রচলিত আছে যে হরিদাস স্বামীর অদ্ভুত সঙ্গীতপ্রতিভার কথা শুনে তানসেন নিজেই বৃন্দাবনে গিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দশ বছর হরিদাস স্বামীর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করার পর পিতার অন্তিম সময়ে তানসেন গোয়ালিয়রে ফিরে আসেন। এই সময় গওসের নিকট তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন। শেখ মহম্মদ গওস হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। এজন্য বদাওনি তাঁর প্রতি রীতিমতো অপ্রসন্ন হন। তাঁর বক্তব্য, "শেখ মহম্মদ গওসকে আমি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য ব্যগ্র ছিলাম ; কিন্তু যখন জানতে পারলাম যে হিন্দুদের কাছ থেকেও তিনি অভিবাদন গ্রহণ করে থাকেন তখন আমার সে ইচ্ছা অন্তর্হিত হল এবং তাঁর সম্বন্ধে যে সন্তুষ্টির ধারণা ছিল তাও অন্তর্হিত হল।"[১]

আকবরের দরবারে তানসেন

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এর সাত বছর পরে তানসেন আকবরের দরবারে স্থান লাভ করেন। আকবরের সভায় আসার আগেই তানসেন সঙ্গীতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আকবরের রাজসভায় আসার আগে তানসেন রেওয়ার অন্তর্গত বান্ধগড়ের রাজা রামচাঁদ বাঘেলা-র[২] রাজসভায় ছিলেন। তাঁর দিল্লীর দরবারে আগমন সম্পর্কে আইন-ই-আকবরীতে এইরূপে বিবরণ আছে—"সম্রাট আকবরের রাজত্বলাভের ৭ম বর্ষে তানসেনের খ্যাতির কথা তিনি শুনতে পেলেন। তিনি আগ্রায় তানসেনকে নিয়ে আসবার জন্য জালালউদ্দীন কুরচিকে পাঠিয়ে দিলেন। আকবরের অনুরোধ উপেক্ষা করার ক্ষমতা রামচাঁদের ছিল না। তিনি বাদ্যযন্ত্র এবং অনেক উপহার সহ তানসেনকে আগ্রায় পাঠালেন। তানসেন প্রথম রাজসভায় গান গেয়ে দুই লক্ষ টাকা ইনাম পেলেন।) তিনি আকবরের সভায় থেকে গেলেন। তাঁর অধিকাংশ সঙ্গীত

১। Atulananda Chakrabarti, 'Hindus and Musalmans of India', Calcutta (1940), p. 129.

২। উত্তরে কৈমুর পর্বতশ্রেণী এবং দক্ষিণে বিকাটেল পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বাঘেলা নামে এক উপজাতি বসবাস করত। এরা পরে বঙ্গ এবং কলিঙ্গর অঞ্চলে বসবাস করে এবং এই অঞ্চলের নাম হয় বাঘেলখণ্ড। বাঘেলারাজ বিক্রমদেবের সঙ্গে জৌনপুরের শর্কী শাসকদের ভাল সম্পর্ক ছিল। এঁর বংশেরই রাজা রামচাঁদ। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রাজা রামচাঁদ শক্তিশালী শাসকরূপে পরিগণিত হন।

আকবরের নামে লেখা এবং এখন পর্যন্ত হিন্দুস্থানের জনসাধারণ সেই গান গেয়ে থাকেন।"[১]

সঙ্গীতপ্রেমী হিসেবে রাজা রামচাঁদের খ্যাতি ছিল। তিনি বিশেষভাবে ধ্রুপদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ আছে যে তিনি তানসেনকে এক কোটি তঙ্খা (স্বর্ণ মুদ্রা) দান করেন। এই বিবরণ 'বীরভানুদয়' কাব্যের লেখক কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে। 'বীরভানুদয়'-এর লেখক বলেছেন—প্রতিটি গান, প্রতিটি তান এবং প্রতিটি ধ্রুপদের জন্য তিনি (রাজা) এই তানসেন নামীয় সঙ্গীতজ্ঞকে (কলাবিদ) এক কোটি টাকা দান করেছেন। এইসমস্ত বিবরণে অতিশয়োক্তি থাকতে পারে, কিন্তু এ-থেকে তানসেনের সাঙ্গীতিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

তানসেন যখন মোগল দরবারে আসেন তার আগেই তিনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন এবং তিনি তখনই 'তানসেন'—এই নামে পরিচিত ছিলেন। তানসেন মোগল দরবারে আসার এক বছর পরে আব্দুল মজিদ আসফ খাঁ রাজা রামচাঁদের রাজ্য অধিকার করেন এবং রামচাঁদ বিখ্যাত বন্ধু দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁকে পরে রাজ্যে পুনপ্রতিষ্ঠিত করা হয় বটে, কিন্তু সেটা মোগল সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের শর্তে। ১৫৯২ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামচাঁদের মৃত্যু হয়।

তানসেনের সাঙ্গীতিক অবদান

তানসেনের সাঙ্গীতিক প্রতিভার পরিচয় অনেকেই দিয়েছেন। 'আইন-ই-আকবরী' রচয়িতা আবুল ফজল লিখেছেন—"তানসেনের মত গায়ক বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে একজনও জন্মগ্রহণ করেননি।"[২] 'বৈষ্ণব কি বার্তা'য় লেখা আছে—"তানসেন সঙ্গীত বিদ্যায় পারঙ্গম ছিলেন। তিনি আকবরের দরবারে সকল সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।" 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'-তে জাহাঙ্গীর তাঁর পিতার দরবারের অন্যতম রত্ন তানসেনের খুব প্রশংসা করেছেন।

দুঃখের বিষয়, তানসেনের সঙ্গীতপ্রতিভার শুধু একটা দিকই দেখা হয়ে থাকে। গায়ক হিসাবে অতুলনীয় যশের অধিকারী তানসেনের কবি-যশ ভাগ্যে ঘটেনি। কারণ সঙ্গীতশিল্পী তানসেনের আড়ালে কবি তানসেন ঢাকা পড়েছিলেন। তিনি নিজের রচিত গানই গাইতেন। সে গানে কাব্যরস অপেক্ষা সঙ্গীতরসই প্রধান আকর্ষণীয় ছিল। ক্লাসিক গানের সকল রচয়িতাদের সম্পর্কেই যে কথা

১। Abul Fazl, Ain-i-Akbari, translated by Blochmann, Delhi (1956), p. 445.

২। "Miyan Tansen of Gwalyar. A singer like him has not been in India for the last thousand years." Abul Fazal, Ain-i-Akbari, translated by Blochmann, Delhi (1965), P. 681.

যাতে অর্থাৎ তাঁদের গানের কাব্যসৌন্দর্য সুর হতে অনেকটা চাপা পড়ে যায়—তানসেনের ভাগ্যেও তাই ঘটেছে।

কিন্তু যে গান নবরত্নের মানস সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সে গানের ভাষার দিক থেকে দৃষ্টি ফেরানো সম্ভব নয়। তানসেন যে যুগের (ষোড়শ শতাব্দী) মানুষ, সে যুগ প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের, বিশেষত কাব্য সাহিত্যের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ। একদিকে তুলসীদাস ও সুরদাসের কাব্যমণ্ডিত গান, ফারসী রাজভাষা—পোশাকি ভাষা, ফারসী সাহিত্যের চর্চা এবং তাতে আকবর ও তাঁর অমাত্যদের উৎসাহ ; তেমনি অন্যদিকে দেশ-ভাষা হিন্দী (ব্রজভাষা) চর্চায় সম্রাট ও তাঁর সভাসদদের উৎসাহ ছিল অফুরন্ত।

"আকবর নিজে হিন্দী ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। 'অকব্বর' বা অকব্বর সাহি—এই ভণিতায় আকবরের রচনা বলিয়া প্রচারিত কতকগুলি হিন্দী দোহা বা কবিতা পাওয়া যায়। তাঁহার সভাসদগণের মধ্যে রাজা বীরবল, নরহরি, আব্দুর রহীম খাঁ—খানান ও বীকানেরের রাজকুমার পৃথ্বীরাজ রাঠোড় উচ্চদরের কবি বলিয়া হিন্দী ও রাজস্থানী সাহিত্যে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন।"[১]

তানসেন নিঃসন্দেহে একজন উচ্চস্তরের গীতিকবি। কিন্তু কবি বা সাহিত্যিকদের মজলিশে তাঁর কাব্য পাঠ করা হত না, কালোয়াতের জলসায় এবং রাজদরবারে সঙ্গীতপিপাসুদের সম্মুখে গাওয়া হত তাঁর কাব্যসমৃদ্ধ গান। তানসেনের আগের ধ্রুপদ রচয়িতাগণ শব্দ ও ছন্দের ওপরে বিশেষ জোর দিতেন। তানসেন সুরের দিকে এবং সুরের মাধুর্যের দিকে দৃষ্টি বেশি দিয়েছেন সত্য, কিন্তু তাঁর গানের কবিত্বগুণ মোটেই অল্প নয়।

তানসেন ব্রজভাষায় পদ রচনা করেছেন। ব্রজভাষা মথুরা অঞ্চলের জনভাষা (ব্রজবুলি নয়) এবং এই ভাষার একটি বিরাট সাহিত্য আছে। এই ভাষা গীতিকবিতার উপযুক্ত। শ্রুতিমাধুর্যে ও গাম্ভীর্যে ব্রজভাষা সুন্দর ও শক্তিশালী এবং গীতিকবিতার বিশেষ উপযোগী। তানসেন ও অন্যান্য গীতিকবিদের ব্রজভাষাকে মধ্যযুগের আর্য-ভাষা বলা যায়। এই ভাষায় স্বরবর্ণ বেশি বলে ব্রজভাষা শ্রুতিসুখকর। এই ভাষায় প্রায় সব শব্দই স্বরান্ত। তাই এই ভাষা গানের ভাষার উপযোগী।

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ব্রজভাষার বৈশিষ্ট্য এবং গানে তার ব্যবহারের উপযোগিতা বর্ণনা করে বলেছেন, "গানে ব্যবহৃত হইলে ব্রজভাষার একটু উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য দুই এক ক্ষেত্রে আসিয়া যায়—অন্ততঃ ধ্রুপদ গানের কোনও কোনও ধারায় এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়—অনুনাসিক বর্ণের পরে বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বর্ণ আসিলে এই আনুনাসিক যুক্ত সংযুক্ত বর্ণের পূর্বেকার অ-কারকে ঔ-কারবৎ উচ্চারণ করা হয়—অ-কারের সাধারণ হিন্দী অ-কার ঘেঁষা উচ্চারণ না হইয়া কতকটা বাংলার দীর্ঘ অ-কারবৎ উচ্চারণ

১। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, 'কবি-তানসেন', প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৫০।

আসে—পংকজ, শংখ, গঙ্গ, পণ্ড ইত্যাদি শব্দ গানের সময়ে শোনায় যেন—পৌংকজ, শোংখ, গোঙ্গ, পোণ্ড। ইহাতে গীতকালে এই সানুনাসিক সংযুক্ত বর্ণগুলির বিশেষ একটু শ্রুতিমাধুর্য আসিয়া যায়।"[1]

তানসেনের পদের একটি লক্ষণীয় বিষয়ও হচ্ছে পদের ভাষায় সংক্ষেপ বা সংকেত। তানসেনের গানের পদগুলি এমন ভাবে সাজানো যাতে আমাদের মানসপটে একটি চিত্র অংকিত হয়ে ওঠে। যেমন ঃ

রাগিণী হিন্দোল। চৌতাল

সুন্দর সরস ঋতুরাজ বসন্ত আয়ত ভাবন, কুঞ্জ কুঞ্জ
ফুলি ফুলি (ফুলে ফলে) ভবর (ভ্রমর) গুঞ্জ,
কোয়িল পঞ্চম গান সুভাবে নরনারী ॥
কানন কানন ফুটত চমেলী, বকুল গন্ধরাজ বেলী,
মোতিয়া গুলাব সুগন্ধ মনোহারী ॥
পবন চলত মন্দ মন্দ, বিছুড়ি গন্ধ চহুঁ দিস্, গুঞ্জন
ধুন নাদ পঞ্চম পূরেত সবহু বন ভুর ॥
রতি-পতি ভজ জুবক জুবতী, নাচত গায়ত হিন্দোল গীত ;
গোবিন্দ-মঙ্গল তানসেন গায়ো রী ॥

বিষয়বস্তুর সুনির্দিষ্টতা ও বাহ্যবস্তুর ধরাবাঁধা নিয়মের জন্য ধ্রুবপদ গান স্বচ্ছন্দ কাব্যসৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নয়। মাত্র কয়েকটি বিষয় অবলম্বন করে ধ্রুপদের বাণী রচনা করা হয়, যেমন ঃ ব্রহ্মা, মহাদেব, পার্বতী, দেবদেবীগণ, শ্রীকৃষ্ণ-রাধালীলা প্রভৃতি বর্ণনা এবং ইসলাম মতে আল্লার গুণকীর্তন, মহম্মদ এবং মুসলমান সাধকগণের স্তুতিবাদ প্রভৃতি। প্রাচীন হিন্দী এবং সংস্কৃত ভাষায় ধ্রুপদ গান রচনা করা হয়ে থাকে। তানসেনের সময়ে আরবী-ফারসী বহুল উর্দু ভাষার সৃষ্টি হয়নি। অবশ্য ইসলাম ধর্মের অনুকূল পদে আরবী-ফারসী নাম এবং শব্দ, এমনকি বাক্য পর্যন্ত পাওয়া যায়।

ধ্রুপদের পদ রচনায় কাব্যশক্তি বিকাশের পথে নানা বাধা থাকা সত্ত্বেও তানসেন একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। নানা বিধি নিষেধ থাকা সত্ত্বেও ধ্রুপদের পদ রচনায় স্বীয় প্রতিভা প্রকাশে সক্ষম হয়েছিলেন তানসেন। ধ্রুপদ গানের যে এক ধীরোদাত্ত, স্নিগ্ধ, গভীর ভাব আছে, তানসেনের রচনায় তা মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। তাঁর রচনাশৈলীর উদারতা ও আভিজাত্য দ্বারা তাঁর শব্দ-রচনার কৌশল ধ্রুপদ গানকে আরও পুষ্ট ও সমৃদ্ধ ও উদ্ভাসিত করে। দেবতার মহিমা বর্ণনাতে তিনি যে সকল বিশেষণ বা সংজ্ঞা দান করেছেন তার মধ্যেও মৌলিকত্ব ও মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বসন্তের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও আনন্দসমারোহ, বর্ষার ঘনঘটা, মেঘগর্জন ও অবিরাম বৃষ্টিপাতের ধ্বনি তাঁর রচিত বসন্ত ও মল্লার রাগে ভরপুর। প্রাচীন ও মধ্য যুগে হিন্দু কাব্য ও ভক্তিবাদের সারাংশ

১। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'কবি তানসেন', প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪২।

তানসেনের গানে সন্নিবেশিত। দেবতাদের মহিমা কীর্তনের স...
পদে যে সমস্ত বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন, যে সকল সংজ্ঞা দান করেছেন, সেগুলির মধ্যে যেন একটি আদিম মহত্ত্ব—বিশালত্ব আছে। উদাহরণ স্বরূপ পরমব্রহ্মা বা শিব বা বিষ্ণু বিষয়ক কয়েকটি পদের উল্লেখ করা যায়। পাখির গান, মলয় পবন বসন্ত ঋতু, পুরবী বাতাস, বিজলী চমকের ঘনঘটা, বর্ষার রিমঝিম স্নিগ্ধতা, রাধাকৃষ্ণের অনৈসর্গিক প্রেমলীলা—এ সবই আছে তাঁর পদে। "ভারতীয় কাব্য সাহিত্যে মহিমময় ও মাধুর্যময় যাহা কিছু আছে সে সমস্তের দ্বারা তানসেনের পদ যেন ভরপুর; প্রাচীন ও মধ্যযুগের হিন্দু কাব্য ও ভক্তিবাদ মথিয়া নবনীতটুকু যেন তানসেনের পদে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। ধ্রুপদের বাণী এবং অন্য কবিদের রাগরাগিণী বর্ণনার পদ—এই সব পদে যেন প্রাচীন রাজপুত ও মোগল চিত্রের কবিতাময় ব্যাখ্যা ও বর্ণনা পাওয়া যায়—এই দুইটি বস্তু ভারতের কাব্যোদ্যানে দুইটি অনিন্দ্যসুন্দর সৌরভময় পুষ্প।"[১]
রাজদরবারে থাকলেও তানসেন যে গান রচনা করেছেন তা জনসমাজের অনুভূতির বাইরে নয়। সকলের মনের কথা তিনি গানের মধ্যে ব্যক্ত করেছেন। তাই মনে হয় তানসেনের গান জাতীয় চিত্ত থেকে রস পেয়ে সুশোভিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তানসেনের গানকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়:

(১) যৌবন—এই সময়ে তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা-মহারাজার গুণগান এবং ঋতু প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন। এই পদগুলি উল্লাস ও উজ্জ্বলতায় পূর্ণ।

(২) প্রৌঢ়াবস্থা—এই সময়ে তানসেন দেবতাদের লীলা ও মহিমা কীর্তন করেন। এই শ্রেণীর পদে তাঁর ঐশ্বর্যবোধ ও অন্তর্দৃষ্টি আছে।

(৩) পরিণত ও বার্দ্ধক্য অবস্থা—এই শ্রেণীর পদে আছে আত্মানুভূতি, ভাবগাম্ভীর্য ও ভক্তির গভীরতা।

নবাব দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় তানসেনের সঙ্গীতচর্চা চলেছিল। এ অবস্থায় তাঁর গানে যে নবাবের প্রশংসা থাকবে তা সহজেই অনুমেয়। আকবরের প্রশংসাসূচক গান তানসেন অনেকগুলি রচনা করেছিলেন। আকবর শুধু তাঁর পৃষ্ঠপোষক নন, তিনি ছিলেন সত্যিকারের একজন গুণী ব্যক্তি। তিনি সঙ্গীত-চর্চা করতেন এবং নিজে নকাড়া বাজাতে পারতেন। সঙ্গীতশাস্ত্র সম্পর্কেও তাঁর উৎসাহ কম ছিল না। এহেন আকবরের গুণগান যে তানসেন করবেন সেটা আর অস্বাভাবিক কি। আকবরের প্রশংসাসূচক একটি গান উদ্ধৃত করছি:

দরবারী কানাড়া। চৌতাল

"চড়ো চিরঞ্জীব শাহ আকবর শাহানশাহ
বাদশাহ, তখত বৈঠো ছত্র ফিরে নিশান।

১। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, 'কবি তানসেন', প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪১।

দিল্লীপতি তুম নবী-জি কো নায়ব
অতি সুন্দর সুলতান।
জয়ো দেশ লিয়ে কর জোর কমান
রাজারাব উমরার সব মানত তোরি আন।
কহে মিয়াঁ তানসেন শুনিয়ে মহাজ্ঞান।
তুমসে তুমহি ঔর নাহি দুজো,
গুণিজননকো রাখত মান॥

তানসেনের বিনম্র এবং প্রার্থনাত্মক পদগুলি অতুলনীয়। কারণ এগুলিতে তাঁর হৃদয়ের সারল্য, বিশ্বাস ও প্রীতি প্রকাশিত হয়েছে। একটি তাত্ত্বিক, ধর্মজ্ঞ ও ভক্ত প্রাণের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর ধর্ম বিষয়ক পদগুলিতে। তানসেন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেও হিন্দু সংস্কৃতির প্রধানতম বিষয়গুলির সঙ্গে তাঁর যথার্থ পরিচয় এবং সেগুলি সম্পর্কে তাঁর আস্থা ও শ্রদ্ধার প্রকাশ তাঁর পদেই পাওয়া যায়। শিব, বিষ্ণু, সূর্য, গণেশ, সরস্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর মহান ও বিরাট কল্পনার অন্তর্নিহিত গভীর চিন্তা, জ্ঞান ও উপলব্ধি এবং সৌন্দর্যবোধ—সব দিকেই ছিল তাঁর শিল্পীর দৃষ্টি। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং তন্ত্র ও মধ্যযুগের সাধুসন্তদের ভক্তিবাদ—এ সবের মধ্যে যে মনীষা, যে সত্যদৃষ্টি, যে প্রাণ, যে রসদৃষ্টি বর্তমান, সে সব কিছুরই উত্তরসাধক হলেন তানসেন। তানসেনের ধ্রুপদ গান শুনে শ্রোতার মনে জাগে দিব্যভাব। এখানে এই ধরনের দুটি গান উদ্ধৃত করছি।

রাগ ভৈরব। ঢিমা ত্রিতাল

মহাদেব মহাকাল ধূরজটি শূলী পঞ্চ-বদন প্রসন্ন নেত্র॥
পরমেশ্বর পরাৎপর মহাজোগী মহেশ্বর পরম পুরুষ
প্রেমময় পরা-শান্তি দাতা॥
সরিতাগণ (নদীসমূহ) ভিন্ন ভিন্ন পন্থ হ্নেসে আবত
সিন্ধুর পাই বহত মগন
তানসেন কহে তৈসে ভগত ভিন্ন ভিন্ন মুরতি
উপাসত একহী ব্রহ্ম আদত॥

রাগিণী ভৈরবী। চৌতাল

অনন্ত-কান—কৃপা করো, হিয়া-পর ঠারো, হবি করুণ নৈন,
করুণাপতি, মুরালী অধর, ললিত-মধুর, বঙ্কিম ভর বঙ্কবিহারী॥
বদন খীন (দেহ দুর্বল) ইন্দিন হীন, পান সুমরি সুমরি
(স্মরণ করে করে)
অস্থির প্রাণ, নিরাশা প্রবর (প্রবল) বিশ্বআধার,
নেহ ছোড়ি প্রাণ জাত, হরি॥

বিষয় আপদ, সুখ সম্পদ ধন জন দারা বান্ধব সুত
সব-কো ছোড়ি চলিহোঁ (আমি চলে যাব) এক করম
অব সাঙ্গ (সঙ্গে) রহিয়োঁ (রয়েছে)।
পতিত পাবন প্রভু জনার্দন পতিত দীন তানসেন ;
বিশ্বমোহন, পরগামী প্রাণ আশ্রয় দীজে, গোলকবিহারী ॥

তানসেন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ধ্রুপদের মধ্যে আল্লার মহিমাকীর্তন, নবীমহম্মদের ও মুসলমান সাধকদের গুণবর্ণনা পাওয়া যায়। মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাবে সে যুগের হিন্দু শুষ্ক জ্ঞান-মার্গ পরিত্যাগ করে যে মাধুর্যময় ভক্তির ধারা সৃষ্টি করেছিল (মীরাবাঈ, তুলসীদাস, সুরদাস-এর পদ এর দৃষ্টান্ত) তানসেন তার অন্যতম উদগাতা। তানসেনের পদ ভারতীয় চিত্ত থেকেই রস গ্রহণ করেছে।

সুরস্রষ্টা তানসেন

তানসেন একাধারে গীতিকার এবং সুরস্রষ্টা। ধ্রুপদ রচনায় তানসেনের পূর্বসূরিদের বিশেষ নজর ছিল শব্দ ও ছন্দের ওপরে। তানসেন শব্দ ও ছন্দের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখেও বিশেষ নজর দিলেন সুর ও সুর-মাধুর্যের দিকে।

প্রাচীন ভারতের প্রবন্ধ সঙ্গীতের আধারেই ধ্রুপদের সৃষ্টি। তবে ধ্রুপদ সঙ্গীত নিছক প্রাচীনের সংরক্ষণ বা অন্ধ-অনুকরণ মাত্র ছিল না। তা যদি হত তবে ধ্রুপদের প্রসার ঘটত না। তানসেনের ধ্রুপদ সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ধ্রুপদ তানসেনের আগেই সৃষ্টি হয়েছিল। গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহের সময়েই এই সঙ্গীতের প্রসার ঘটে। কিন্তু তানসেনের সময়ে ধ্রুপদের নতুন করে জন্ম হয়।)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেমন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ভাবধারার প্রভাব বাংলার উদ্বেলিত জাতীয় চিত্তে রস সঞ্চার করে নবচেতনার সৃষ্টি করেছিল, তেমনি এই ষোড়শ শতাব্দী। এই শতাব্দীতে ভক্তিবাদ শুধু জনজীবনেই নবজাগরণ আনল না, মুসলমান প্রভাবে সুরের ক্ষেত্রেও নবজাগরণ এল। এই কাজ শুরু হয়েছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমীর খসরুর দ্বারা—তানসেনের গানে সেই সমন্বয়ের ধারার এক উজ্জ্বল রূপের প্রকাশ দেখলাম।

সঙ্গীতের অন্যতম দিকপাল হরিদাস স্বামীর শিষ্য তানসেন। এই হরিদাস স্বামীর মতো আর একজন লোককে রাজা মানসিংহ শ্রদ্ধা করতেন। এঁর নাম মহম্মদ গওস্। ইনি পারস্য সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। এই মহম্মদ গওস্-এর কাছে তানসেন পারস্য সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ফলে একদিকে হরিদাস স্বামী ও অপরদিকে মহম্মদ গওসের শিক্ষার সমন্বয় করে তানসেন এক অভিনব পদ্ধতির প্রবর্তন করেন।(তানসেন যে সব অভিনব রাগরাগিণী সৃষ্টি করেন তা হচ্ছে—দরবারী কল্যাণ, দরবারী আসাবরী, দরবারী টোড়ী, শাহানা, মিঞাকী

সারং, মিঞাকী মল্লার, মিঞাকী জয়জয়ন্তী প্রভৃতি। এ সব রাগই প্রাচীন সঙ্গীত ও পারস্য সঙ্গীতের ঢঙে মিশ্রিত। তা ছাড়া তাঁর ধ্রুপদে কথার বাহুল্যের পরিবর্তে তানের বাহুল্য এবং মীড়ের কাজ—এসবই গোয়ালিয়রের সাধনার ফল। গোয়ালিয়রেই তাঁর সঙ্গীতসাধনার প্রথম প্রকাশ, আকবরের দরবারে তার পূর্ণ বিকাশ। তানসেন পদ বাহুল্যের পরিবর্তে তানের প্রয়োগ বেশি করেছেন। নিজে তিনি গৌড়বাণী প্রয়োগ করেছেন বেশি। তাঁর পূর্বেই ধ্রুপদ রচয়িতাগণ শব্দ ও ছন্দের ওপরে বিশেষ নজর দিয়েছেন—তানসেন তার সঙ্গে সুর মাধুর্যের দিকে বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন। তাঁর ধ্রুপদ এবং আলাপ গায়ন পদ্ধতিতে আলংকারিক প্রয়োগের বিশেষত্ব আছে। তাঁর গানে আশ্, মীড়, গমক ও মূর্ছনার প্রয়োগকে পরবর্তী যুগের ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতির পূর্বাভাস বলা যায়। ধ্রুপদের পর ধামারের ভাব, সুর, রচনা, লীলায়িত ছন্দ এবং আলংকারিক প্রয়োগ ধ্রুপদ ও খেয়ালের যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেছে। তাই বলা যায় যে তানসেন ভারতীয় সঙ্গীতের মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছেন।

আকবরের দরবার থেকে দীর্ঘদিনের জন্য বিদায় নিয়ে তানসেন সারা ভারত পরিক্রমার দ্বারা ভারতীয় সঙ্গীতের আত্মা ও রসের সন্ধান করেন। নানা দেশের দেশীয় সঙ্গীত, পল্লী সঙ্গীতের মধুর রূপ এবং প্রকৃতির সুর-ঝংকার এইভাবে তাঁর গানে দানা বাঁধতে থাকে এবং তা হয়ে ওঠে মাধুর্যমণ্ডিত। এই অভিনব সুষমা ও মাধুর্যমণ্ডিত সুরলহরী ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিল।

তানসেনের সঙ্গীতকে ঘিরে অনেক রকম অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত তা হচ্ছে তাঁর 'দীপক' রাগ সম্পর্কিত। 'দীপক' রাগ গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠত, এমনকি রাজসভাতেও একবার নাকি দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল এবং তিনি নিজে সেই আগুনে দগ্ধ হয়েছিলেন। তানসেনদুহিতা সরস্বতী এবং সাধিকা রূপবতী মেঘমল্লার গেয়ে বর্ষাধারায় তানসেনের দগ্ধ দেহ শীতল করেন (হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান, পৃঃ ২৬-২৭)। এই কিংবদন্তীর সত্যাসত্য বিচার না করে মোটামুটি বলা যায় যে তানসেন কত বড় গায়ক ছিলেন, তা প্রমাণের জন্যই এই ধরনের কাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। তানসেন প্রচলিত 'দীপক' রাগের আমূল পরিবর্তন করেছেন। এই পরিবর্তিত 'দীপক' রাগ সেনী ঘরাণার নিজস্ব সম্পত্তি। অন্যান্য রাগ শিক্ষার পর এই ঘরাণার গায়কদের এই রাগ শিক্ষা দেওয়ার কথা আজও প্রচলিত আছে।

এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য এবং তা হচ্ছে এই যে, তানসেন ধ্রুপদের নানা দিকে নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন; কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল তিনি উচ্চমানের গায়ক হিসেবে পরিগণিত হলেও সঙ্গীত নায়ক হিসেবে তাঁর সমসাময়িক যুগে স্বীকৃতি পাননি।

তানসেন গায়ক রূপেই প্রসিদ্ধ। অথচ যন্ত্রসঙ্গীতেও তাঁর অবদান কম নয়। (তাঁকে রবাব যন্ত্রের উদ্ভাবক বলা হয়।[1] এটি মুসলমানী বাদ্যযন্ত্র। এই যন্ত্রে ভারতীয় সুরবৈচিত্র্যকে ফুটিয়ে তোলেন তানসেন। তার ফলে রবাব অন্যতম সঙ্গীতযন্ত্র হিসাবে পরিচিত হয়। Popley বলেছেন, "The great Tansen played this instrument. It is a handsome instrument and has a very pleasing tone, somewhat fuller than that of the Sarangi."[2]

তানসেন 'রাগমালা' এবং 'সঙ্গীতসার' নামে দুখানি সঙ্গীতগ্রন্থ রচনা করেন বলে জানা যায়। তানসেন যখন আকবরের সভায় ছিলেন সেই সময় 'রাগমালা' গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।)

ধ্রুপদের চারটি বাণী

ধ্রুপদের যে বাণীর কথা শোনা যায় তা আকবরের সময় সৃষ্টি। ধ্রুপদ সঙ্গীতের চারটি বাণীর পরিচয় পাই। এই চারটি বাণী হল—(১) গৌড়হার বা গৌড়ী, (২) খাণ্ডার, (৩) ডাগুর বা ডাগর, এবং (৪) নৌহার।

'মাদনুল মুসিকী' নামক সঙ্গীতগ্রন্থ রচয়িতা হাকিম মহম্মদ এই চারটি বাণীর উদ্ভাবকদের সম্বন্ধে লিখেছেন :

আকবরের দরবারে তখন চারজন মহাগুণী বাস করতেন। তাঁরা হলেন—

(১) তানসেন—গোয়ালিয়র নিবাসী। তাঁর পিতার নাম মকরন্দ। তানসেন বৃন্দাবনের স্বামী হরিদাসের শিষ্য ছিলেন। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে তানসেনের জন্ম হয়।

(২) ব্রিজচন্দ—ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। দিল্লীর নিকটবর্তী ডাগুর গ্রামে তাঁর বাড়ি ছিল।

(৩) রাজা সমোখন সিংহ—রাজপুত ছিলেন। তিনি ছিলেন বীণাবাদক। তিনি খাণ্ডার নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন।

(৪) শ্রীচন্দ্র—জাতিতে রাজপুত। নোহার নামক স্থানের অধিবাসী।

আকবরের সময় এই চারজন চারটি বাণীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তানসেন ছিলেন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। সেজন্য তাঁর বাণীর নাম ছিল 'গৌড়ী' অথবা 'গৌড়হার' বাণী। প্রসিদ্ধ বীণাবাদক সমোখন সিংহ তানসেনের কন্যাকে বিবাহ করায় তাঁর নতুন নাম হয় নবাৎ খাঁ। নবাৎ খাঁ-র বাসস্থান ছিল খাণ্ডার। তাই তাঁর বাণীর নাম হয় 'খাণ্ডার' বাণী। ব্রিজচন্দের বাসস্থানের নাম অনুযায়ী তাঁর বাণীর নাম হয় 'ডাগুর' বাণী। রাজপুত শ্রীচন্দ নৌহারের অধিবাসী ছিলেন, তাই তাঁর বাণীর নাম 'নৌহার' বাণী।

১। Herbert A. Popley, 'The Music of India', Calcutta (1950), P. 18.

২। Ibid, P. 115.

চারটি বাণীর উদ্ভাবক এবং তাঁরা কোন অঞ্চলের অধিবাসী—এ নিয়ে কিছু কিছু মতপার্থক্য আছে। যেমন, ডাগুর বাণীর উদ্ভাবক ব্রিজচন্দ-কে হাকিম মহম্মদ বলেছেন দিল্লীর নিকটবর্তী ডাগর গ্রামের অধিবাসী। আবার কেউ কেউ বলেছেন তিনি রাজপুতানার অন্তর্গত ডাগর-এর অধিবাসী। আবার শ্রীচন্দকে কেউ বলেছেন রাজপুত, কেউ বলেছেন তিনি দিল্লী প্রদেশের অন্তর্গত নৌহার-এর অধিবাসী। কেউ কেউ আবার নৌহার বাণীর উদ্ভাবক হিসাবে মোগল দরবারের গায়ক সুজন খাঁ নৌহারের নাম করেছেন।

এই চার বাণীর মধ্যে গৌড়ী বাণীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার প্রসাদগুণ। এই বাণী শান্তরসের উদ্দীপক। এর গতি ধীর। অন্যদিকে খাণ্ডার বাণী তীব্র রস উদ্দীপক। এর গতি খুব বিলম্বিত নয়। বৈচিত্র্য এবং ঐশ্বর্য প্রকাশই এর বিশেষত্ব। ডাগর বাণীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার সারল্য ও লালিত্য। এর গতি সহজ ও সরল। নৌহার রীতি আশ্চর্য রসোদ্দীপক এবং এর গতি খানিকটা দ্রুত। এক সুর থেকে দু-তিনটি সুর অতিক্রম করে পরবর্তী সুরে যাওয়া এর বৈশিষ্ট্য।

যাকে শুদ্ধ বাণী বলা হয় তা গৌড়ী ও ডাগুর বা ডাগর বাণীরই নামান্তর। খাণ্ডার বাণী যদি শুদ্ধ বাণীর গতি ও ছন্দ না ভেঙে চলে তা হলে তাতে সুরের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য উদ্ঘাটিত হতে পারে। আপন আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাণীগুলি সংহত হলেও চার বাণীর মধ্যে গৌড়ী বাণীকে রাজা, ডাগর বাণীকে মন্ত্রী, খাণ্ডারকে সেনাপতি এবং নৌহারকে ভৃত্যের স্থান দেওয়া হয়ে থাকে।

গৌড়ী বাণী এবং ডাগুর বাণী শুদ্ধ বাণীর অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃত 'ভিন্না রীতি'ই খাণ্ডার বাণী। এর বাণীতে সুরগুলি গাওয়া হয় কেটে কেটে। সুর প্রয়োগের বক্রতা এই বাণীতে আনে বৈচিত্র্য ও মাধুর্য। সূক্ষ্ম মধুর গমক সহযোগে এই বাণীতে গান গাওয়া হয়। তবে গমকের উৎকট প্রয়োগ এই বাণীর বিকৃতি ঘটায়। সূক্ষ্ম গমক ও শ্রুতি প্রয়োগ দ্বারা খাণ্ডার বাণীতে যথেষ্ট মধুর রস সৃষ্টি করে গেছেন তানসেন বংশীয় বীণকারগণ।

এখানে চারটি গান পর পর স্বরলিপি সহ উদ্ধৃত করা হল:

গৌড়হার বাণী
বিলাসখানি টোড়ী—চৌতাল

স্থায়ী—প্রেমনগর বৃন্দাবন আনন্দধাম।
মহাতীর্থ ভকতনকে গগন পবন মধুর মধুর ॥
অন্তরা—হরিনারায়ণ কৃষ্ণ নারায়ণী রাধিকা।
যুগল রূপ করে বিহরণ অতি মনোহর ॥
সঞ্চারী—গোপীজন বল্লভ শ্রীরাধামাধব।
লীলা রচে নব নব ঘনশ্যাম সুন্দর।

*আভোগ—কৃষ্ণ মন্ত্র সাধক জন গায়ে সদা নাম গান।
নরশন পাওনেকে ধায়ে অন্তর ॥

৩ ৪
সা ঋা | জ্ঞা পা I
প্রে ০ ০ ম

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
II দা মা | মা মা | ঋা ঋজ্ঞা | ঋা সা | সা দ্া-সা সা I
ন ০ গ র বৃ ন্দা ০ ব ন আ ০ ০ ন
I ঋা সা | সা ঋা | জ্ঞা জ্ঞা | সা ঋা | -জ্ঞা পা | -া পা I
০ শ ধা ০ ০ ম ম হা ০ তী ০ র্থ
I মা মা | দা দা | মা মা | দা র্সা | র্ঋা ণা | দা মা I
ভ ক ত ন ০ কে গ গ ন প ব ন
I জ্ঞা ঋা | -জ্ঞা জ্ঞা | ঋা ঋা | -সা সা | সা -ঋা | -জ্ঞা পা II
ম ধু ০ র ম ধু ০ র প্রে ০ ০ ম
II জ্ঞা পা | দা না | র্সা -া র্সা র্সা | -া ঋা | -র্সা -র্সা I
হ রি না ০ রা ০ য় ণ ০ কৃ ০ ষ্ণ
১ ০ ২ ০ ৩ ৪
I র্সা র্ঋা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্ঋা র্জ্ঞা | র্ঋা র্সা | -া-া II
না ০ রা ০ য় ণী রা ০ ধি কা ০ ০
I পা দা | র্সা র্সা | র্ঋা র্সা | র্ঋা ণা | দা মা | মা মা I
যু গ ল রূ ০ প ক রে বি চ র ণ
I জ্ঞা পা | দা মা | ঋা জ্ঞা | ঋা সা | সা ঋা | জ্ঞা পা II
অ তি ০ ম ন ০ হ র প্রে ০ ০ ম
II জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা | ঋা জ্ঞা | ঋা সা | সা সা I
গো ০ পী ০ জ ন ব ০ ০ ল্ল ০ ভ
I সা ঋা | ন্া দ্া | সা সা | সা ঋা | সা জ্ঞা | -া -া I
শ্রী ০ রা ০ ধা ০ মা ০ ধ ব ০ ০
I সা ঋা | জ্ঞা পা | পা পা | দা দা | ণা দা | মা মা I
নী ল ০ র ত ০ ন ব ০ ন ০ ব
I দা ণা | র্ঋা ণা | দা মা | জ্ঞা ঋা | জ্ঞা ঋা | সা সা I
ঘ ন শ্যা ০ ০ ম সু ০ ন্ দ ০ র
I জ্ঞা পা | দা র্সা | র্সা র্সা | সা -া | র্সা র্সা | র্ঋা র্সা I
কৃ ০ ষ্ণ ম ০ ন্ত্র সা ০ ধ ক জ ন
I র্সা র্ঋা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা | -া র্জ্ঞা -া | র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্ঋা | র্সা র্সা I
গা ০ য়ে স ০ দা না ০ ম গা ০ ন

I দা সা | । র্সা | ঋর্সা র্সা | র্ঋ ণা | দা মা | মা মা I
দ র ০ শ ০ ন পা ও য় না ০ কে

I জ্ঞা পা | দা -মা | জ্ঞঋা জ্ঞা | ঋা সা | সা -ঋা | জ্ঞা পা II II
ধা ০ য়ে ০ অ ন ০ ত র প্রে ০ ০ ম

খাণ্ডার বাণী

মিশ্রা মল্লার। চৌতাল

স্থায়ী—বরথা ঋতু আয়ে শ্রাবণ মে।
দেখ বরষত চার প্রহর
চউদিশ ঘন ঘোর ॥

অন্তরা—প্রবল মেঘ দল বেগ চলে।
দমকত চমকত দামিনী
গরজত ঘন ঘন ॥

সঞ্চারী—বহত পবন জোর জোর
দেখ গগন ভয়ঙ্কর
কাঁপত সং জীন জীবন ॥

আভোগ—তরুবর পর কোয়েলিয়া
বৈঠ রহত বোল না বোলে।
রবি শশী নেহি গগনমে শোভে ॥

৩ ৪
ণমঃ পঃ। I
ব০ র

১' ০ ২ ০ ৩ ৪
II র্রা র্রা | র্সা র্না | র্সা র্সা | ণপা ণপা | মজ্ঞা মরা | সা সা I
খা ০ ০ ঋতু আ য়ে শ্রা০ ০০ ব০ ০ণ মে ০

I রা সা | ণ্ধ্া ণ্ধ্া | না সা | রা পা | মজ্ঞা মরা | সা সা I
দে খো ব ০ র ০ ০ ষত চা ০ র০ ০প্র হ র

I মা পা | ধা ণধা | ণা পা | র্সা মজ্ঞা | রা রা | মা ণমঃ পঃ II
চ উ ০ দি০ ০ শ ঘন ঘো০ ০ ০ র ব০ র

II মপা ণা | পা ণা | প্রা মপা | ণধা ণধা | না না | র্সা । I
প্রব ০ লমে ০ ঘ দল বে০ ০০ ০ গচ লে ০

১' ০ ২ ০ ৩ ৪
I র্জ্ঞা র্মা | র্মা র্রা | র্জ্ঞা র্সা | র্সা র্সর্রা | সা র্রনা | র্সা র্সা I
দম ০ কত দা ০০ ০ মি০ ০নী

I ণধা ণধা | ণধা ণধা | ণা পা | পা র্সা | জ্ঞা মা | রসা ণপঃ র্সঃ II
গ০ র০ ০০ জ০ ০ ত ০ ঘন ঘ ০ ০ন ব০ র

II সা সা | সা সা | ণা ধা | ণধা ণা | পা ণ্মা | পা পা I
ব হ ত প ০ বন জো০ ০ র জো০ ০ র

I মা জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞমা | পা ণপা | জ্ঞা জ্ঞা | মা রা | জ্ঞরা সা I
দে ০ খো গম্র ০ গন ভ র ০ ঙক ০০ র

II ণ্ ধা ণ্ ধা | ণ্ ধা না | সা সা | রা পা | পা জ্ঞা | মা রসা I
কাঁ ০ ০ ০ প ০ ত ০ সব জী ০ ব জী ০ বন

I মা পা | পা ণধা | ণা পা | ণধা ণধা | না না | র্সা -া I
ত রু ব র০ ০ পর কো০ ০০ ০ য়েলি য়া ০

I র্সা র্সা | র্রা র্রা | র্রা র্রা | র্পা র্পা | র্মজ্ঞা র্মা | র্রা র্সা I
বৈ ০ ঠ র ০হ ত বো ০ ০ ল০ না বো লে

I ণধা ণধা | ণধা ণধা | ণপা র্সা | জ্ঞা জ্ঞা | মা রা | সা ণমঃ র্সঃ II II
র০ বি০ শ০ শী০ ০০ নেহি গ গন মে শো ভে ব০ র

ডাগর বাণী

মালকোষ। চৌতাল

স্থায়ী—এ মহামায়া দয়া না হোতা মো পর।
কেয়া কিয়া কসুর তেরো চরণ পর ॥
অন্তরা—তুহি ব্রহ্ম সনাতনী ত্রিজগতকে জননী
মহাশক্তি দে মা তু ইহ জীবন পর ॥
সঞ্চারী—পরমেশ্বরী নাম ধরত পরমজ্ঞান দায়িণী।
কহত তিন লোক তেরো মহিমা অপার ॥
আভোগ—করুণা কর করুণাময়ী সন্তানকে ভরসা মায়ি
সদা ভক্ত বৎসল কর রে উদ্ধার ॥

৩ ৪ ৬
র্সা র্সা | া দমা I
এ ০ ০ মহা

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
II মা দজ্ঞা | মা মা | জ্ঞা জ্ঞা | মা মা | জ্ঞা জ্ঞা | সা সা I
মা ০০ ০ য়া দ য়া ০ না হো ০ ০ তা

I দ্ ণ্ সা | মা মা | জ্ঞমা গা | -ণা | দা দা | ণদা মা I
মো০ ০ ০ পর কেয়া ০ কিয়া ক সু ০ র

I র্সা ণা | দা দা | ণদা মা | জ্ঞমা জ্ঞসা | র্সা র্সা | -া দমা II
তে রো চ ০০ রণ প০ ০র এ ০ ০ মহা

II জ্ঞা মা | দা ণা | র্সা র্সা | -া র্জ্ঞণা | র্সা র্সা I
তু ০ হি ব্র ০ হ্ম স না০ ত০ ০ ন

I দা দা | দা দা | ণা ণা | ণা দর্সা | ণা দা | ৯া ৯া I
ত্রি জ গ ত কে ০ জন নী ০ ০ '০
১' ০ ৩ ০ ০ ৪
I দা ণা | র্সা জ্ঞা | জ্ঞা র্সা | র্মা জ্ঞা | র্সা র্সা | -া র্সা I
ম হা ০ শ ক্ তি দে ০ ০ মা ০ তু
I সা র্সা | ণা দা | মা মা | জ্ঞমা জ্ঞসা | র্সা র্সা | -া দমা II
ই হ জী ০ ব ন প০ ০র এ ০ ০ মহা
II সা সা | মা মা | মা মা | মা -া | মা মা | দা মা I
প র মে ০ শ্বরী না ০ ম ধ র অ
I জ্ঞা মা | ণা ণা | ণা ণা | দা দা | ণা দা | মা মা I
প র ম ব্রা ০ ন দা ০ ০ রি ০ নী
I সা র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্সা | দা দা | ণা দা | মা মা I
ক হ ত ০ তি ন লো ০ ০ ০ ০ ক
I মা র্সা | ণা দা | দা মা | জ্ঞা জ্ঞা | মা জ্ঞা | সা সা I
তে ০ রো ম হিমা অ পা ০ ০ ০ র
I জ্ঞা মা | ণা দা | দা দণা | ণা র্সা | জ্ঞ'ণা র্সা | র্সা র্সা I
ক রু ণা ০ ০ করো ক রু ণা০ ০ ম রী
I দা দা | দা ণা | ণা ণা | -া দর্সা | ণা দা | মা মা I
স ন্ তা ন ০ কে ০ ভর সা মা ০ রি
I দা ণা | র্সা জ্ঞা | জ্ঞা র্সজ্ঞা | র্মা জ্ঞা | র্সা র্সা | -া-া I
স দা ০ ভ ক্ ত০ ব ৎ স ল ০ ০
I সা র্সা | ণা দা | মা মা | জ্ঞমা জ্ঞসা | র্সা র্সা | -া ণদা IIII
ক রো রে ০ উ ০ দ্ধা০ ০র এ ০ ০ মহা

নোহার বাণী

বাহার। চৌতাল

স্থায়ী—বোল রহে ঘনশ্যাম
ঘন ঘন মুরলীয়া বাজাওয়াত।
শ্রীরাধিকা নাম লিয়ে
শুনায়ে রাগ রঙ্গ ভরি॥

অন্তরা—মনোহর লেত রাগ বাহার
সব ছোড়কে ধায়ে যমুনা কিনার।
ভূল গয়ি সব খান পান ঘরকি কাম
বৃন্দাবন কি সব নরনারী॥

সঞ্চারী—গোকুল কি গোপাল যশোদা কি লাল
পালক হ্যায় জগত সংসার।
জগদীশ্বর জগন্নাথ
অতি দয়াল ভকত বৎসল ॥

আভোগ—সব জন গায়ে গোবিন্দ নাম
ত্যজ আজ হরি গোলকধাম
কংস ঘাতক দেবকীনন্দন
জয় জয় নারায়ণ শ্রীরাধাপতি ত্রিভঙ্গিম ঠাম ॥

০ ৩ ৪
র্সা ধা | ণপা মা মা ণধা I
বো ল ০র হে ০ঘন

১ʹ ০ ২ ০ ৩ ৪
II র্সা র্সা | জ্ঞমা রসা | জ্ঞমা ণধা | পা পা | না না | র্সা র্সা I
শ্যা ম ঘন ঘন মৃ০ রলী স্বা ০ বা জা ও হাত
I র্সা র্রা | র্সা র্রা | র্সা নর্সা | ধণা পমা | জ্ঞা জ্ঞামা | রা সা I
শ্রী রা ধিকা না ম লিয়ে ০০ ০০ শূন্য ০০ য়ে ০
I মা মা | ণমা ণধা | ধা নর্সা | র্সা ধা | ণপা মা | মা ণধা II
রা গ রং০ ঙ্গ০ ০ ভরি বো ল ০র হে ০ঘ ন
১ʹ ০ ২ ০ ৩ ৪
II মা ণধা | র্সা -া | -া র্সা | ণধা ণধা | ণমা ণধা | র্সা র্সা I
মন হর নে ০ ০ত রা০ ০০ ০০ গবা হা র
I র্সা র্রা | র্সা র্রা | র্সা না | র্সনা র্সধা | ণা পমা | মা মা I
সব ছো ড়কে ধা য়ে যমু না০ ০০ ০ কিনা ০ র
I র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্সা র্রা | র্সা র্সা | ণা ণা | ধা ধণা | র্সা র্সা I
ভূ লগ য়ি০ ০ সব খা০ ০নপা ০ ন
I ণপ মপা | জ্ঞা জ্ঞমা | রা সা | সা মা | মা মপা | মপা -া I
ঘর কি০ বা ০০ ০ম বৃন্দা ০বন কি ০
I মা ণধা | না -া | র্সা র্সা | র্সা ধা | ণপা মা | মা ণধা II
সব নর না ০ ০ রী বো ল ০র হে ০ঘন
II মা মা | মা মা | পা পা | ণপা মপা | জ্ঞা জ্ঞমা | রা সা I
গো কু ল কিগো পা ল যশো দাকি লা ০০ ০ল
I সা সা | ধ্া ণ্প্ | ম্া ম্া | ণ্া ণ্ধ্া | সা সা | সা সা I
পা ০ ল ০ক হ্যা য় জগ তস ং০ সা র
I সা মা | মা মা | -া মা | মা মা | পা জ্ঞ | জ্ঞা মা I
জগ দী ০শ্ব ০র জগ ০ না ০ থ

I ধা ধা | ধণা ধা | ণা পা | জ্ঞা জ্ঞা | মা রা | জ্ঞা সা I
অ তি দ০ য়া ০ ল ভ ক ত ব ৎ সল

I মা ণধা | র্সা -া | -া র্সা | ণধা ণধা | ণমা ণধা | র্সা র্সা I
সব জন গা ০ ০ য়ে গো০ বি০ ০০ ০ন্দ না ম

I র্সা র্রা | র্সা -া | -া নর্সা | নর্সা র্বসা | ধণা পা | মা মা I
ত্যজ আ য়ে ০ ০ হরি গো০ লক ধা০ ০ ০ ম

I জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা র্মা | র্রা র্সা | ধণা পমা | ণধা না | র্সা র্সা I
ধ্ ং সখা ০ ত ন দে০ বকী ন০ ০ ন্দ ন

I ণপা মপা | জ্ঞা জ্ঞমা | রা সা | সা া | মা মা | পা -া I
জয় জয় না ০০ রা য়ণ শ্রী ০ রা ধাপ তি ০

I মা ণা | ধা ধা | না র্সা | র্সা ধা | ণপা মা | মা ণধা II II
ত্রিভ ০ ঙ্গি ম ঠা ম বো ল ০র হে ০ ঘন

সাধারণত এই কথা বিশ্বাস করা হয় যে আকবরের রাজত্বকালেই এই বাণীগুলির উদ্ভব হয়। কিন্তু এই বিশ্বাসের মূলে কতটা সত্যতা আছে তা পর্যালোচনার বিষয়। কারণ বিভিন্ন ধরনের গীতির প্রচলন মতঙ্গের (৫ম-৭ম শতাব্দী) পূর্বেই ছিল। মতঙ্গ, পার্শ্বদেব, শার্ঙ্গদেব প্রভৃতি পণ্ডিতরা তাঁদের গ্রন্থ 'বৃহদ্দেশী', 'সঙ্গীত-সময়-সার' এবং 'সঙ্গীতরত্নাকর' গ্রন্থে ওইসব গীতির পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন। মতঙ্গ বলেছেন সাত প্রকারের গীতির (রাগগীতি) প্রচলন ছিল। সেগুলি হচ্ছে: শুদ্ধা, ভিন্না অথবা ভিন্নকা, গৌড়ী অথবা গৌড়ীকা, রাগগীতি, সাধারণী, ভাষা এবং বিভাষা। এই রাগগীতিগুলির নামকরণ হয়েছিল তাদের রাগ অনুসারে। এই রাগগীতিগুলির বিশেষ ধরনের গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছিল। সেগুলি যখন গাওয়া হত তখন বিভিন্ন গায়নশৈলী বিকশিত হত। এই বিভিন্ন গায়নশৈলীকেই বর্তমানের বিভিন্ন রীতি বলে গ্রহণ করা চলে। যাষ্টিকের মত অনুসারে রাগগীতির সংখ্যা পাঁচ এবং সেগুলি হচ্ছে—শুদ্ধা, ভিন্না, বেসরা, গৌড়ী অথবা গৌড় এবং সাধারিত অথবা সাধারণী। দুর্গাশক্তি তিন প্রকার রাগগীতির কথা বলেছেন এবং শার্দুল একটি মাত্র রাগগীতির কথা উল্লেখ করেছেন। এইসব উক্তি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে প্রাচীন রাগগীতি এমন কি গ্রাম-রাগগীতিও বিভিন্ন রীতিতে গাওয়া হত।

মতঙ্গ এবং শার্ঙ্গদেব তাঁদের উল্লিখিত ৭ অথবা ৫টি রাগগীতির যে পরিচয় দিয়েছেন তা মোটামুটি এই:

(১) শুদ্ধা রাগগীতির স্বর, ঋজু কোমল এবং মধুর হত।

(২) ভিন্না রাগগীতির স্বর বক্র, কিন্তু এতে থাকত সূক্ষ্ম এবং গমকের তান মাধুর্য।

(৩) গৌড়ী রাগগীতিতে ব্যবহৃত স্বরগুলি কম্পন অথবা গমক সহযোগে স্থির ওজন রক্ষা করে তিনটি সপ্তকের মধ্যে বার বার ঘোরাফেরা করত।

(৪) বেসরা রাগগীতির স্বরগুলি দ্রুত লয়ে এবং দ্রুততর কম্পন সহযোগে ব্যবহৃত হত।
(৫) সাধারণী রাগগীতির নিজস্ব কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। অপর চারটি রাগগীতির মিশ্রণে এই রাগগীতি সৃষ্ট হত।
(৬) ভাষা রাগগীতির স্বরগুলি মিষ্ট। এগুলি স্পর্শ স্বর এবং কাকু সহযোগে গাওয়া হত।
(৭) বিভাষা রাগগীতির স্বরগুলি ছিল স্নিগ্ধ এবং আনন্দদায়ক। এই রাগগীতিতে ব্যবহৃত স্বরগুলি তিনটি সপ্তকের মধ্যে বিচরণ করত। এর স্বরগুলি বিভিন্ন গমক সহযোগে গাওয়া হত।[১]

বিভিন্ন রাগ (অর্থাৎ গ্রামরাগ) এই সব রাগগীতি থেকেই উৎপন্ন হয় এবং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, যে-রাগগুলি (গ্রাম-রাগগুলি) পরবর্তী কালে সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলি রাগের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসারে গাওয়া হত।[২]

উপরের বিবরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রবন্ধ গীতির বিভিন্ন পদ্ধতিতে গাওয়ার রীতি ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নতুন কোনও আবিষ্কার নয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে পরবর্তীকালে যে বাণীগুলি সৃষ্টি হয় সেগুলি প্রাচীন যুগের রীতিকে ভিত্তি করেই হয়।

এ প্রসঙ্গে কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের পর্যালোচনা এখানে বিবৃত করা যাচ্ছে। তিনি বলেছেন যে হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদের চারটি বাণীর নাম পাই আমরা। এই বাণীগুলি ধ্রুবপদ গায়ন রীতি নির্দেশ করে। গৌড়ীয় বাণী শাস্ত্রীয় শুদ্ধাগীতির অনুরূপ। এতে রাগের আঙ্গিক অনুসারে ঋজু মীড়ের টান থাকে। যদিও মিঞা তানসেন অন্য রীতি জানতেন, কিন্তু গৌড়হার বাণীতেই তিনি সবচেয়ে বেশি দক্ষ ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁ-র শিষ্যমহলে প্রধানত এই রীতিই অনুসরণ করা হত। অনুরূপভাবেই ডাগর বাণী ভিন্না গীতির মত। এতে মিষ্টি এবং সূক্ষ্ম গমকের সঙ্গে বক্ররেখার মীড়ের কাজ থাকত। ডাগর বাণী খুব মাধুর্যপূর্ণ এবং বলা হয়ে থাকে যে বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামীর শিষ্যরা এবং তানসেনের কন্যা সরস্বতী দেবী এই রীতিতে গান গাইতেন। সরস্বতী দেবীর স্বামী মিশ্রী সিং একজন বিখ্যাত বীণাবাদক ছিলেন। খাণ্ডার বাণী শাস্ত্রীয় বেসরা গীতির মত। এতে থাকত দ্রুত গমকের কাজ। বলা হয়ে থাকে যে ধ্রুবপদের এই বাণী অনুসরণ করতেন বাজবহাদুর এবং মিশ্রী সিং-ও তাঁর বীণা বাদ্যে এই রীতি অনুসরণ করতেন। পরবর্তীকালে মিশ্রী সিং-এর উত্তরাধিকারীরা ডাগর বাণী এবং খাণ্ডার বাণী এই দুই রীতিতেই গান গাইতেন। নৌহার বাণী শাস্ত্রীয় গৌড়ী

১। 'বৃহদ্দেশী' (ত্রিবান্দ্রম সংস্করণ), পৃঃ ৮২-৮৪।

২। Swami Prajnanananda, 'A Historical Study of Indian Music', Calcutta (1965), P. 185.

গীতির মত। এতে ছুট্ অলংকার থাকত। এই বাণীতে স্বরগুলি বিভিন্ন গমক সহযোগে উল্লম্ফন রীতিতে ব্যবহৃত হত।

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী আরও বলেছেন যে, ধ্রুবপদের বিভিন্ন রাগের বিশেষ বিশেষ ভাবাবেগের সঙ্গে সঙ্গীত রেখে শব্দ নির্দেশ এবং শব্দের সুর নির্দেশ করা হত। বলা হয়ে থাকে যে সুমধুর গৌড়হার বাণী প্রশান্ত ভাবাবেগ এবং শান্ত রস সৃষ্টি করে; ডাগর বাণী সৃষ্টি করে মধুর রস এবং করুণ রস; খাণ্ডার বাণী সৃষ্টি করে বীর রস এবং নৌহার বাণী সৃষ্টি করে অদ্ভুত রস।[১]

নবাৎ খাঁ-তানতরঙ্গ-বিলাস খাঁ

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, 'মাদনুল মুসিকী' নামক সঙ্গীতগ্রন্থ প্রণেতা হাকিম মহম্মদ রাজা সমোখন সিংকে খাণ্ডার-বাণীর জনক আখ্যা দিয়েছেন। আজমীর সিংহল গড়ের ক্ষত্রিয় নৃপতি এই সমোখন সিং-এর পুত্র মিশ্রী সিং সঙ্গীতজগতে নবাৎ খাঁ নামে পরিচিত। তানসেনের কন্যা সরস্বতীকে বিবাহ করেন তিনি এবং এই সূত্রেই তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। সুপণ্ডিত সুদর্শনাচার্য শাস্ত্রী লিখেছেন, "তানসেনজীকে জামাতা নবাৎ খাঁজী (মিশ্রী সিংজী) বীণাবাদনমে শ্রীহরিদাস স্বামীজীকে শিষ্য থে। য়ে বীণামে বড়ে প্রধান রে শরীরমে বড়ে বলিষ্ঠ থে। নবাৎ খাঁজী জাতি প্রথম হিন্দু থে, পিছে বিবাহকি কারণ মুসলমান হুয়ে। নবাৎ খাঁজী জামাতা হোনেকে কারণ তানসেনজীকে পুত্রতুল্য হী থে, ইনসে সম্ভব হ্যায় কি ইনকো কুছ শিক্ষা তানসেনজীসে ভি প্রাপ্ত হুই, তো ভি য়ে প্রাধান্যসে বীণামে শ্রীহরিদাস স্বামীজীকে শিষ্য থে। বীণাকে অদ্বিতীয় ওস্তাদ হুয়ে। ইনকো খাণ্ডারে গোত থে।"

মিশ্রী সিং-এর মুসলমানী নাম নবাৎ খাঁ (মিশ্রী = নবাৎ, সিংহ = খাঁ)। ইনি তানসেনের সঙ্গীতসাধনায় যোগ্য সহযোগী ছিলেন। বীণাবাদনে তিনি যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তেমনি তাঁর বংশের সঙ্গীতসাধকেরাও বীণাবাদনে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। একদিকে এই বীণাবাদনে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য তাঁর বংশ যেমন বীণকার বংশ নামে পরিচিত, তেমনি তানসেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হেতু তাঁর বংশও সেনী নামে পরিচিত।

নবাৎ খাঁ প্রাচীন পদ্ধতিতেই বীণা বাজাতেন। কিন্তু তানসেনের নতুন গায়নরীতির সঙ্গে সহযোগিতা করতে গিয়ে তাঁর বীণাবাদনেও স্বভাবতই নতুনত্ব এসেছিল।

আকবরের রাজসভায় যে ছত্রিশজন সঙ্গীতজ্ঞের পরিচয় আবুল ফজল দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আমরা পাই তানতরঙ্গ খাঁ-কে। এঁকে মিঞা তানসেনের পুত্র এবং

১। B. K. Roychaudhury, 'Hindustani Music and Mian Tansen', Calcutta, p. 6-9.

কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী হিসাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আবুল ফজলের গ্রন্থে তানসেনের অন্যতম পুত্র হিসাবে বিলাস খাঁ-র নামেরও উল্লেখ আছে। এছাড়া শরৎ সেন, সুরৎ সেন এই দুই নামে তানসেনের দুই পুত্র ছিল—তানসেনের জীবনীকারেরা এই কথা লিখেছেন। কেউ কেউ তানতরঙ্গ খাঁকে তরঙ্গ সেনও বলতে চেয়েছেন। আবার তাঁর রচিত গানের ভণিতায় 'তানতরঙ্গ' নামই আছে। যেমন—

পটমঞ্জরী। সুরফাক্তা

ধীরে ধীরে কান্‌হ সাঁখোপর গহ আবন।
হোঁ তো অবহী জার কহোঁগী
নন্দরায় সোঁ রহ বিধতে' হমসো চন্দাবন।
কৈসে ছলবল বালক কর
ভেখ ধরো জব বামন।
তানতরঙ্গ-প্রভু ঐসী হোঁ ন গবাঁর,
তুম সোই লাগে বৌরাবন॥

তানসেনের পুত্রদের মধ্যে শরৎ সেনের কোনও সাঙ্গীতিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। সুরৎ সেন প্রাচীন প্রবন্ধ সঙ্গীতের চর্চা করতেন বলে জানা যায়। তানতরঙ্গ অবশ্য ধ্রুপদ গানে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি আকবরের রাজসভায় অন্যতম সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে স্থান লাভ করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে তানতরঙ্গ ছিলেন কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী. যন্ত্রের দিকে তাঁর আকর্ষণ ছিল না। অন্যদিকে বিলাস খাঁ কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী হলেও তাঁর বংশে যন্ত্র একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। এই যন্ত্র হল 'রবাব'। অন্যদিকে তানসেনের কন্যার বংশ অর্থাৎ নবাৎ খাঁ-সরস্বতীর বংশ বীণকার বংশ বলে পরিচিত। তানসেনের শিষ্যরা রবাবী বংশ এবং বীণকার বংশ হিসাবেই নিজেদের বিভক্ত করেছেন।[১]

তানতরঙ্গের মত বিলাস খাঁ-ও তানসেনের কাছ থেকেই সঙ্গীতশিক্ষা করেন; এঁদের গান যেমন ভগবৎ বিষয়ক গান তেমনি রাজ-প্রশংসাসূচক গান। এখানে বিলাস খাঁ রচিত ভগবৎ বিষয়ক একটি গান উদ্ধৃত করছি—

১। "The disciples of Tansen divided themselves into two groups, the Rababiyars and the Binkars. The former used the new instrument invented by Tansen, the Rabab; while the latter used the Bin, as the vina is called in the North." Herbert A. Popley, 'The Music of India', Calcutta (1951), pp. 17-18.

সুরট । চৌতাল

মেরে তো হরিনামকো অধার, জিন রচ্যো সংসার,
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ জঞ্জার।
জিন রচ্যো অরস কুরস, জিমী আসমান
নিরঞ্জন নিরংকার সাঁচী কেঁ্যান সেবো পরবরদিগার।
কাহেকু হূজো গুণহগার, কাহেকু লীজো এতো ভার,
সোই সবাদ কেঁ্যান তজিয়ে আঁকো নাম গুণাগার।
প্রভু বিলাস কহে পাক্ সাফ রহিয়ে
তয়ার জনম জীতব নহি বার বার।

আকবরের রাজসভায় সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে সঙ্গীত শুরু করলেও বিলাস খাঁ খ্যাতি লাভ করেন জাহাঙ্গীরের সময়ে (১৬০৫-১৬২৭)। জাহাঙ্গীরের দরবারে তিনি প্রধান সঙ্গীতজ্ঞের পদ লাভ করেন। বিলাস খাঁ সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে যে তিনি সংসার সম্পর্কে প্রায় উদাসীন ছিলেন এবং অর্থ, প্রতিপত্তি কোনও দিকেই তাঁর খেয়াল ছিল না। কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিলাস খাঁ-র প্রসিদ্ধি উপেক্ষা করবার নয়। তিনি বিলাসখানী টোড়ী, বিলাসখানী কল্যাণ প্রভৃতি নতুন রাগ বিন্যাস করেন। বিলাস খাঁ-র সবচেয়ে বেশি খ্যাতি যে বিলাসখানী টোড়ীর জন্য, তার একটি উদাহরণ ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল (১৬০৫-১৬২৭)

যে-সমস্ত সঙ্গীতজ্ঞ আকবরের সময়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে আমরা আকবরপুত্র জাহাঙ্গীরের দরবারেও দেখতে পাই। এঁদের মধ্যে একজন রঙ্গ খাঁ। এঁর অপর নাম দৈরং খাঁ। ইনি ধ্রুপদ সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। প্রায় আশি বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। এই সময়ের আর একজন সঙ্গীতজ্ঞ বিলাস খাঁ। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে যে লাল খাঁ-র কথা আছে তিনি বিলাস খাঁ-র জামাতা। তিনি শৈশব থেকেই তানসেনের সঙ্গে ছিলেন। লাল খাঁ-র চার পুত্রের মধ্যে খুশাল খাঁ এবং বিশ্রাম খাঁ পিতার ধ্রুপদের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছিলেন। খুশাল খাঁ (খুশহাল খাঁ) ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তিনি টোড়ী রাগ পরিবেশনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি এবং তাঁর ভাই বিশ্রাম খাঁ শাহজাহানের দরবারে শ্রেষ্ঠ গায়কের আসন অধিকার করেছিলেন।

গুণ সেন, সুরং সেন—এঁরা দুজনও জাহাঙ্গীরের দরবারে ছিলেন। এঁদের রচিত গান থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আকবরের সময় থেকে বাদশাহদের গুণগান করে গান রচনার একটা রেওয়াজ চলে আসছিল। সুরং সেন এবং গুণ সেন জাহাঙ্গীরের বন্দনা গান গেয়েছেন, এমনকি খুশাল শা এই ভনিতায় সঙ্গীতবিরোধী ঔরঙ্গজেবের গুণগানও করা হয়েছে।

জাহাঙ্গীরপুত্র শাহজাহানের শাসনকালকে মোগল শাসনের সুবর্ণ যুগ বলা হয়ে থাকে। মোগল শাসনের গরিমা এই যুগেই সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। এই যুগে সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্ব তেমন ছিল না, বহিরাক্রমণের সম্ভাবনাও কমে গিয়েছিল এবং বহির্বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটেছিল। এই যুগ জাঁকজমক এবং আড়ম্বরের যুগ। এ-যুগের স্থাপত্যশিল্প আজও বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই যুগে সঙ্গীতের কোনও উল্লেখযোগ্য নতুন প্রচেষ্টা অবশ্য দেখা যায়নি ; তবে আগের যুগের কয়েকজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ এই যুগেও বেঁচে ছিলেন। লাল খাঁ, খুশাল খাঁ, বিশ্রাম খাঁ, রঙ্গ খাঁ, জগন্নাথ কবিরায়, গুণ-সেন প্রভৃতি তো ছিলেনই, এছাড়াও ছিলেন আরও অনেক সঙ্গীতজ্ঞ, যেমন শেখ বহাউদ্দীন, শের মহম্মদ, মিশ্রা ভানু ঢাড়ী, সবাং খাঁ ঢাড়ী প্রভৃতি।
আবদুল হামিদ লাহরি তাঁর 'বাদশাহ নামা' গ্রন্থে শাহজাহান-এর রাজত্বকালের সঙ্গীতচর্চার বিবরণ দিয়েছেন। শাহজাহান সিংহাসন আরোহণের পরে পরেই (১৬২৭ খ্রিঃ) লাল খাঁ কলাবন্তকে সম্মানিত করেন। সেই সময় লাল খাঁ একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ধ্রুপদ গানে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। শাহজাহান তাঁকে 'গুণসমুদ্র' উপাধি দান করেন। এই সময় জগন্নাথ কবিরায় জাহাঙ্গীরের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ।

জগন্নাথ কবিরায়

ফকীরুল্লার 'রাগদর্পণ' একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। এই 'রাগদর্পণ'-এ তাঁর সমসাময়িক যে-সব সঙ্গীতজ্ঞের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন, জগন্নাথ তাঁদের অন্যতম। কাব্যকৃতির জন্য তিনি শাহজাহানের দরবারে উচ্চপদ লাভ করেছিলেন এবং এই দরবারেই তিনি 'কবিরায়' উপাধি লাভ করেন। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁর জন্ম। তানসেন যখন খ্যাতির উচ্চশিখরে তখন তাঁর বয়স খুবই অল্প। তবে সেইসময়েই তিনি সঙ্গীতচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। শোনা যায় তিনি তানসেনকে 'নট' রাগে ধ্রুপদ গেয়ে শুনিয়ে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। ফকীরুল্লার 'রাগদর্পণ' থেকে জানা যায় যে তানসেন সেদিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'এ গায়ক যদি বেঁচে থাকে এবং এর এই সম্ভাবনা যদি পরিণতি লাভ করে, তা হলে সঙ্গীতজগতে আমার পরেই হবে এর স্থান।' জগন্নাথ ধ্রুপদ গাইতেন। গানে সে-সময়ের রীতি অনুসারে তিনি শাহজাহানের গুণকীর্তন করেছেন। প্রায় এক শত বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। আকবরের রাজত্বকালের প্রথমদিকে তাঁর জন্ম এবং তিনি বেঁচে ছিলেন ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল শুরু হবারও দু বছর পর পর্যন্ত—অর্থাৎ ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

শেখ বহাউদ্দীন

শেখ বহাউদ্দীনের জীবন সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে শুরু হয়নি। অভিজাত ঘরের সন্তান বহাউদ্দীন প্রথম জীবনে শাহজাহানের শিকারের সঙ্গী ছিলেন এবং এই পশু শিকারই তাঁর মনে পরিবর্তন আনে। তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যান। দীর্ঘ পঁচিশ বছর নানা স্থান পর্যটনের পর তিনি নিজ গ্রামে (দোয়াবের অন্তর্গত ঝিনঝিনা পরগণার বারনাওয়া গ্রামে) ফিরে যান। এই সন্ন্যাসজীবনে তিনি কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করেন। প্রধানত দক্ষিণ অঞ্চলেই তিনি সঙ্গীতশিক্ষা করেন। তিনি গীত, ধ্রুপদ ও খেয়াল গান রচনা করতেন এবং নিজে গাইতেন। 'চুট্‌কলা' রচনাতেও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তিনি রবাব, বীণা বাদনে দক্ষ ছিলেন। তিনি 'খেয়াল' নামে একটি বাদ্যযন্ত্রও আবিষ্কার করেন বলে জানা যায়। ১৭শ শতকের শেষদিকে পরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

শেখ শের মহম্মদ

শেখ বহাউদ্দীনের মতই সংসার ত্যাগ করে তাঁরই সঙ্গে দেশ পর্যটনে বের হন শেখ শের মহম্মদ। তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন শেখ নাসিরুদ্দিন। তিনি ধ্রুপদ গাইলেও 'চুট্‌কলা' খেয়াল ও তারাণাতেই বেশি দক্ষ ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথমদিকে পাটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সুরদাস—বিধর্মী পাখোয়াজী সুরদাস আকবরের সময়ের মানুষ। মিঞা তানসেনের সঙ্গে সঙ্গত করেছিলেন তিনি। ফকীরুল্লাও তাঁকে দেখেছিলেন। তিনি প্রায় একশো বছর বেঁচে ছিলেন।

শাহজাহানের রাজত্বে আরও দুজন গুণীর সন্ধান পাওয়া যায় যাঁদের নাম ফকিরুল্লা মনে রাখতে পারেননি। তাঁরা দক্ষ সুর্ণা বা সানাইবাদক ছিলেন। এ ছাড়া আরও অনেক সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন যাঁরা শাহজাহানের সামনে আসেননি। ফকীরুল্লাও তাঁদের দেখেননি।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল (১৬৫৮-১৭০৭)

শাহজাহানের পর তাঁর পুত্র ঔরঙ্গজেব ক্ষমতা লাভ করেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর বিস্তৃত ঔরঙ্গজেবের শাসনকাল। এই যুগ থেকেই মুঘল-গরিমা অন্তর্হিত হতে থাকে। এই সময় ধর্মীয়-নীতি, রাজপুত-নীতির পরিবর্তন হতে থাকে। শাসনশক্তির সঙ্গে জনসাধারণের বিচ্ছিন্নতা ঘটে। ঔরঙ্গজেব নানা দিকে যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকার জন্য যে শিল্পকলার প্রতি উদাসীন হয়েছিলেন তা নয়, তাঁর চরিত্রই ছিল শিল্পকলা বিমুখী।

সঙ্গীতের প্রতি বিমুখতার জন্যই ঔরঙ্গজেবের সময় সঙ্গীতের উন্নতি ঘটেনি।

তবে তাঁর সময়ে কিন্তু দুখানি বিখ্যাত সঙ্গীত-গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের শাসন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত সইফ খান ফকীরুল্লা ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে 'রাগদর্পণ' রচনা করেন এবং সঙ্গীত-বিদ্বেষী সম্রাটকেই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন। ফকীরুল্লাকে যখন কাশ্মীরের গভর্নর করে দেওয়া হয় সেই সময়েই এই গ্রন্থটি রচিত হয়। এই গ্রন্থ যদিও 'মান কুতুহল' গ্রন্থের পারসী অনুবাদ, তথাপি এই গ্রন্থে সে-যুগের সঙ্গীত সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে। তিনি ধ্রুপদ, খেয়াল এবং অন্যান্য যে-সমস্ত গান তাঁর সময়ে প্রচলিত ছিল তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে বারোয়া রাগের ঠুংরী পারস্যের মুস্তাদাত এবং বারুয়ার অনুরূপ।

ঔরঙ্গজেবের সময়ে লেখা আর একখানি সঙ্গীত-গ্রন্থের নাম 'তুফাৎ-উল-হিন্দ'। এটি রাগদর্পণের নয়-দশ বছর পরে লেখা হয়। এই গ্রন্থের রচয়িতা মীর্জা খাঁ মা ইবন ফকরুদ্দিন মহম্মদ রাজপরিবারের শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে রাগ-রাগিণীর চিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দান করেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ভাগে গীতিকার ও নানারকম গীতের উল্লেখ আছে। প্রবন্ধ সম্বন্ধে মীর্জা খাঁ বলেছেন, "এর কয়েকটি প্রকারভেদ বর্তমান। যাঁরা প্রাচীন সঙ্গীতে অভিজ্ঞ তাঁরা এটি গেয়ে থাকেন। এটি প্রাকৃত ভাষায় গাওয়া হয়। আজকালকার ভাষায় একে বলে পাতালবাণী। ব্রজভাষায় একে নাগবাণী বলা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবন্ধ হচ্ছে—ধ্রুপদ। এটি চারটি তুকে নিবদ্ধ। এই তুকগুলির নাম হচ্ছে—আস্থান (স্থায়ী)। একে পিড়াবন্দাও বলা হয়। দ্বিতীয়টিকে অন্তরা বলে। পরের দুটি তুককে ভোগ বলা হয়; সাধারণ্যে এটি আভোগ নামে পরিচিত এবং গোয়ালিয়রের রাজা মান এটি রচনা করেন। ধ্রুপদ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দুই তুকের ধ্রুপদকে তিউট বলেন।"[১]

আগের যুগের গায়কদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক গায়ক ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালেও বেঁচে ছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মহম্মদ বাকী। ইনি ধ্রুপদ সঙ্গীতে নিপুণ ছিলেন এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বেঁচে ছিলেন। খুশাল খাঁ-ও ঔরঙ্গজেবের সময় বেঁচে ছিলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল থেকে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত যে-সমস্ত সঙ্গীতজ্ঞের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের বিবরণ দেওয়া হল।

(১) মিঞা ডালু (দালু) ঢাড়ী—ইনি ছিলেন উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ গায়ক। ফকীরুল্লা লিখেছেন যে, এঁর মত ধ্রুপদ তিনি আর কারও কাছে শোনেননি। ইনি বাদ্যযন্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন। আকবরাবাদে এঁর মৃত্যু হয়।

(২) মিসির মন্‌জন্‌ ঢাড়ী—বিলাস খাঁ-র শিষ্যদের অন্যতম মিসির মন্‌জন্‌ ঢাড়ীর সমকক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ খুব কমই ছিলেন। ইনি সুন্দর গীত-রচয়িতা ছিলেন।

১। রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'মুঘল যুগের সঙ্গীত চিন্তা', কলিকাতা (১৯৬৪), পৃঃ ৯৫-৯৬।

(৩) সবাৎ (সওয়াদ) খাঁ ঢাঢ়ী—ইনি ফতেপুরের অন্তর্গত ঝুনঝুনওয়ার বাসিন্দা ছিলেন। ইনি একাধারে উত্তম গায়ক ও গীত-রচয়িতা ছিলেন।

(৪) ওয়ালী ঢাঢ়ী—উত্তম গায়ক ছিলেন। আকবরাবাদে তাঁর মৃত্যু হয়।

(৫) রহীম দাস ঢাঢ়ী—গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মার্গসঙ্গীতে তাঁর জ্ঞান ছিল এবং তিনি মার্গসঙ্গীত গাইতেনও। ফকীরুল্লার সময়েও তিনি জীবিত ছিলেন।

(৬) করজু-ঢাঢ়ী—ফুলওয়ারের অধিবাসী ছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তিনি উচ্চ সম্মানের অধিকারী হন।

(৭) সালিহ্ রুবাবী ঢাঢ়ী—পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। বাদ্যযন্ত্রী হিসাবে রাজধানীতে তাঁর যথেষ্ট পসার ছিল।

(৮) ইলাহ্দাদ ঢাঢ়ী—ইনি ছিলেন জলন্ধরের অন্তর্গত একটি গ্রামের অধিবাসী। সারেঙ্গী বাজাতেন।

(৯) ভাহাঁর ঢাঢ়ী—খঞ্জরী বাদক ছিলেন। হোলিগানে এই বাদ্যযন্ত্রটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। ফকীরুল্লা বলেছেন যে, এঁর মত আর কারও বাজনা তিনি শোনেননি।

(১০) ফিরোজ ঢাঢ়ী—লাহোরের অধিবাসী ছিলেন। পাখোয়াজ বাজাতেন। তাঁর নিখুঁত বাজনা শ্রোতাদের মোহিত করে রাখত।

(১১) মিশ্রী খাঁ ঢাঢ়ী—বিলাস খাঁ-র ছাত্র ছিলেন। ১৭শ শতাব্দীতে শাহ সুজার সঙ্গে বাংলাদেশে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন গুণ খাঁ কলাবন্ত। তাঁরা দুজনেই ধ্রুপদ রচনা করতে ও গাইতে পারতেন। গুণ খাঁ সংস্কৃত প্রবন্ধ গানও গাইতেন। বাংলাদেশে এঁরা সে-যুগে গান শিখিয়েছিলেন কি না বলা যায় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সেনী ধ্রুপদ রীতি বিষ্ণুপুরে প্রচলিত হবার বহু পূর্বেই বাংলাদেশে এসেছিল।

(১) গুণ সেন—নায়ক ভানুর পৌত্র। ১৬শ শতকের শেষের দিকে তাঁর জন্ম হয়। গুণ সেনের মুসলমানী নাম নায়ক আফজল। তিনি কাশ্মীরে বাস করতেন এবং সেখানেই মারা যান। গুণ সেন মার্গসঙ্গীতের তত্ত্বে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ধ্রুপদ গান গাইতে ও রচনা করতে পারতেন।

(২) সুথর (সুঘর) সেন—ইনি বয়াজিদের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। সুন্দরভাবে রবাব বাজাতে পারতেন।

(৩) সুবল সেন ও তাঁর পুত্র হমীর সেন—উভয়েই উত্তম ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বের শেষ দিকে এঁদের মৃত্যু হয়।

(৪) সুদেস সেন বা সুধীন সেন—সুবল সেনের আর এক পুত্রের নাম সুদেস সেন বা সুধীন সেন। সুধীন সেনও গায়ক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি উচ্চস্তরের গান রচনা করতে পারতেন। ফকীরুল্লার সঙ্গে ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরে চলে যান তিনি।

(৫) সুবল সেন—তানসেনের পৌত্র এবং সুরত সেনের পুত্র সুবল সেন ১৬শ

শতকের শেষ দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৫৫ থেকে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মারা যান। শাহজাহানের রাজত্বকালে তিনি গায়ক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

মীর খাঁ কাওয়াল—দিল্লীনিবাসী মীর খাঁ কাওয়াল উচ্চশ্রেণীর গায়ক ছিলেন। গায়ক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

হুসেন খাঁ নওয়ার—ইনি পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর জীবিত ছিলেন। ইনিও ছিলেন একজন অতুলনীয় গায়ক।

শেখ কামাল—ইনি মিঞা ডালু (দালু) ঢাড়ী-র শিষ্য ছিলেন। সিপাহী-র কাজ করেন। গায়ক হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ১৬৭৭ খ্রিস্টাব্দে ফকীরুল্লার সঙ্গে কাশ্মীর গিয়েছিলেন।

বখৎ খাঁ—এই গুজরাটি কলাবন্ত বিলাস খাঁ-র শিষ্য ছিলেন। ইনি উচ্চ শ্রেণীর গায়ক ছিলেন। ধ্রুপদ গান গেয়ে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। প্রায় পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর বেঁচে ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রথম দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

ঘুলাম্ মহীউদ্দীন—অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তম সঙ্গীত রচনা করতেন।

গুণ খাঁ কলাবন্ত—শাহজাহানের রাজত্বকালে এই সঙ্গীতশিল্পীর নাম পাওয়া যায়। সঙ্গীতের বিভিন্ন শাখায় তাঁর দক্ষতা ছিল। মার্গসঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। বাংলাদেশে তাঁর মৃত্যু হয়।

সালিমচান্দ্ ডাগর—উঁচুদরের গাইয়ে ছিলেন। রচনাকার হিসাবেও তাঁর নাম পাওয়া যায়।

শেখ সাদুল্লা লাহোরী—এই অনুসন্ধিৎসু, জ্ঞানী, সুকণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ফকীরুল্লার সঙ্গে থাকতেন। অতিরিক্ত আফিং সেবন করতেন বলে তাঁর বয়স ষাট বছর অতিক্রম করলে তাঁর গান শ্রোতাদের কাছে আবেদন হারায়।

পুজো—পুজো ছিলেন শেখ্ শের মহম্মদ-এর ভাই। তিনি উচ্চ শ্রেণীর গায়ক ছিলেন। রচনাকার হিসাবে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেননি। পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর বয়সের মধ্যে রাজধানীতে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ফকীরুল্লার কর্মচারি ছিলেন।

বাহিদ্ খাঁ (নওছাওরী কলাবন্ত)—উঁচুদরের গায়ক ছিলেন। পঞ্চাশ থেকে ষাট বছরের মধ্যে মারা যান।

রাওরা কাওয়াল্—গায়ক হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। পঞ্চাশ-ষাট বছর বেঁচে ছিলেন।

কবীর্ কাওয়াল—সুকণ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি ছিলেন শেখ্ শের্ মহম্মদের শিষ্য। খেয়াল গানে তিনি নবীন পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

মালতীরাম কলাবন্ত—মালতীরাম কলাবন্ত ছিলেন বিধর্মী। তিনি পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর বেঁচে ছিলেন।

ধরমদাস কলাবন্ত—বিধর্মী ধরমদাস কলাবন্ত উঁচুদরের গায়ক ছিলেন। তিনি কর্মজীবন ত্যাগ করে সাধুর মতো জীবন যাপন করতে থাকেন। এই অবস্থায় পরিণত বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

ঈদল সিং—ঈদল সিং ছিলেন খড়্গপুর-এর (বিহারের অন্তর্গত) শাসনকর্তা। ইনি ছিলেন রাজা রোজ আফ্জুন-এর পুত্র এবং রাজারাম সাহার পৌত্র। ঈদল সিং নিজে দৌলৎ আফ্জুন্ খেতাব অর্জন করেন। ফকীরুল্লার সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন। ফকীরুল্লা তাঁর অতুলনীয় সঙ্গীত শুনেছিলেন। আমীর খসরু অথবা সুলতান হুসেন শর্কীর সমতুল্য জ্ঞানী ছিলেন ঈদল সিং। তিনি ধ্রুপদ খেয়াল ও তারাণা রচনা করেন।

মীর ইমাদ্—ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। সঙ্গীত-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। হিরাতের সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

রসীদ্ খাঁ নওহার—সুজান খাঁ-র পৌত্র রসীদ্ খাঁ নওহার দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। ফকীরুল্লা-র সময়েও তিনি জীবিত ছিলেন। ধ্রুপদ গানে তিনি পারদর্শী ছিলেন। পণ্ডিত হিসাবে তাঁকে আমীর খসরুর সঙ্গে তুলনা করা যায়।

সৈয়দ্ তবীব্ (তাখাল্লুস্ বা ছদ্মনাম বুধ্)—আরুসা পরগণা নিবাসী সৈয়দ্ তবীব্-এর কণ্ঠস্বর খুব ভাল ছিল না। কিন্তু রাজধানীর গায়কদের মধ্যে তাঁর গানের উচ্চারণ অর্থাৎ 'বাণী' ভাল ছিল। জীবনের প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে আকবরাবাদে তিনি বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিলেন।

সুন্দর ঘুনু—ঘুনু ভালই গান করতেন। সঙ্গীত-রচয়িতা হিসাবে তাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সুরস সৈন—এঁর নাম ছিল 'হয়াৎ'। জাহাঙ্গীরের দরবারে অল্প বয়সেই তিনি বাদক রূপে স্বীকৃতি পান। ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফকীরুল্লার সঙ্গে ছিলেন।

রসবীণ খাঁ—শাহজাহানের দরবারে এঁকে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন বীণকার। রসবীণ খাঁ-র প্রকৃত নাম ছিল 'মহম্মদ'।

বায়েজিদ্ রবাবী—দক্ষ বাদক ছিলেন। অত্যধিক মদ্যপান করতেন, সেজন্য তিনি বেশিদিন বাঁচতে পারেননি।

মৃদঙ্গ রায়—বিধর্মী কৃপারী-র খেতাব হল মৃদঙ্গ রায়। তিনি মার্গসঙ্গীতে পণ্ডিত ছিলেন। সম্রাট তাঁকে পছন্দ করতেন। তৎকালীন বাদকদের মধ্যে তিনি বেশ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ফকীরুল্লার সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন।

শিউকী—তম্বুর (তানপুরা নয়, পারসিক বাদ্য 'দুম্বা-বরাহ') বাদক ছিলেন। বাদ্যে কেউ তাঁর সমান দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। হিন্দু ফার্সী দুই ঢঙেই তিনি এই বাজনা বাজাতে পারতেন। কাশ্মীরে তাঁর মৃত্যু হয়।

অষ্টম অধ্যায়

খেয়াল গানের উদ্ভব ও বিকাশ

বাংলায় যাকে 'খেয়াল' (হিন্দী এবং উর্দুতে 'খ্যাল') বলা হয় সেই শব্দটি মূলত আরবী শব্দ। আরবী ভাষায় এর উচ্চারণটা অনেকটা এইরূপ—'খ'য়াল। কথাটির অর্থ চিন্তা, কল্পনা, উদ্দাম ভাবনা, মতলব, ঝোঁক প্রভৃতি। খেয়াল গান বলতে সাধারণভাবে আমাদের মনে এমন ধরনের গানের কথা জাগে যা কল্পনাত্মক এবং যা গায়কের মর্জির ওপরে নির্ভর করে। একটি বিশেষ রীতির গানের নাম 'খেয়াল' হওয়ার কারণ বিষয়বস্তু এবং প্রয়োগের দিক থেকে এটা কল্পনাত্মক। রাগের কাঠামো ছাড়া ধ্রুপদের মতো দৃঢ় বন্ধন এর নেই। গানের কাঠামোতে যতদূর সম্ভব স্বরবিস্তার এতে চলে। প্রথমে থাকে কিছু আলাপ; এতে অলংকার, কম্পন, গিটকিরি প্রভৃতি চলে—সর্বোপরি চলে তান প্রয়োগ। এতে শিল্পীর স্বাধীনতা বেশি।

সব রকমের বিষয়বস্তুই খেয়ালে গ্রাহ্য: ভক্তিমূলক, বীররসাত্মক এবং রোমান্টিক। তবে ধ্রুপদে যেমন যুদ্ধ সম্পর্কিত বা বীরত্বব্যঞ্জক বিষয় স্থান পেতে পারে, খেয়ালে ততটা সম্ভব নয়। খেয়ালে গাঢ়বদ্ধ কাঠিন্য থাকার জন্যই তারল্য তার চরিত্রলক্ষণ। খেয়ালের ধর্ম হল তালবন্ধন থেকে মুক্তি, সুরের রেখান্বিত গতি বিচিত্র সাবলীল প্রবাহ (যাকে বলা হয় তান কর্তব)। ধ্রুপদের সঙ্গে খেয়ালের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এই যে, রাগবিস্তারের ক্ষেত্রে এবং অলংকরণের ক্ষেত্রে খেয়াল গানে স্বাধীনতা অনেক বেশি। দিলীপকুমার

রায়ের ভাষায় বলতে গেলে, খেয়ালে রয়েছে 'ধ্রুপদী স্থাপত্যের শাসন অগ্রাহ্য করে সুরের ফুলনিকুঞ্জ লতাবিতান রচনা করার প্রয়াস ; লতাফুল কখনো হয় প্রগল্ভ কখনো বা স্বল্পবাক্। তাই কোনো খেয়ালে তান বেশি, কোন খেয়ালে কম। তবে খামখেয়ালী এটা ভুললে তো চলবে না।' এই কারণেই খেয়ালের নামকরণ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে দিলীপকুমার রায় বলেছেন, 'ধ্রুপদে রাগবিস্তারের পদ্ধতি ছিল ধরাবাঁধা। তাল ছন্দও ছিল প্রধানত গাম্ভীর্যমুখী। খেয়ালের ঔদার্যগুণে তালের এই বজ্র আঁটুনি থেকে রাগ পেল অব্যাহতি। তাই বোধ হয় ক্রোধন ধ্রুপদী পিতা কুলাঙ্গার সন্তানের এহেন নামকরণ করেন।'[১]

খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মতবাদ প্রচলিত। খেয়াল গান বলতে অনেকে সম্পূর্ণ নতুন একপ্রকার গায়ন-রীতি মনে করেন এবং মনে করেন যে এটা বাইরে থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, অনেকে যোজনাবৃত্তি কোন এক ব্যক্তিকে খেয়াল গানের উদ্ভাবক বলে ঘোষণা করে দেন। এইভাবে আমীর খসরু, হুসেন শাহ শর্কী এবং সদারঙ্গ, প্রত্যেকেই খেয়াল গানের উদ্ভাবক বলে প্রচারিত হয়েছেন। এই ধরনের মতবাদ যাঁরা প্রচার করেছেন তাঁরা ভুলে গেছেন যে কোন বিশেষ গায়ন-রীতির উদ্ভব হঠাৎ একদিন কোন ব্যক্তি ঘটাতে পারেন না। তাছাড়া খেয়াল ভারতীয় সঙ্গীতের অন্যতম একটি রীতি হিসাবে ভারতের বিরাট সঙ্গীত ঐতিহ্যের ভূমিকাকে অস্বীকার করেও দাঁড়াতে পারে না।

এই কথা মনে রেখে খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করা যাক :

(১) খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি মতবাদ হল এই যে, আলিজাতীয় প্রবন্ধের অন্তর্গত 'কৈবাড়' নামক প্রবন্ধ থেকে খেয়াল উদ্ভূত হয়েছে।

(২) খেয়ালের উদ্ভব সম্পর্কে দ্বিতীয় অভিমত এই যে, খেয়ালের উৎসমুখে রয়েছে একতালী এবং রাসক প্রবন্ধ।

(৩) কেউ কেউ বলেন শার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীতরত্নাকরে যে শাস্ত্রীয় আক্ষিপ্তিকার বর্ণনা দিয়েছেন (এই আক্ষিপ্তিকা দক্ষিণ ভারতের 'পল্লবী'-র অনুরূপ), তা থেকেই খেয়ালের উদ্ভব ঘটেছে।

(৪) কেউ কেউ বলেন যে সুরেলা শব্দ-গঠন এবং অলংকরণ প্রবণতার মিশ্রণের মধ্য দিয়ে খেয়াল এসেছে।

(৫) খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে যে মতটি সব চেয়ে প্রাধান্য বিস্তার করেছে তা হচ্ছে এই যে, কাওয়ালী বা কাব্বালি গানের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে খেয়াল এসেছে। এই মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁরা বলেন যে, সুলতান আলাউদ্দিন এবং আমীর খসরু-র পূর্বে উত্তর ভারতে কাওয়াল বা কাব্বাল নামক একদল

১। দিলীপকুমার রায়, 'সাঙ্গীতিকী', কলিকাতা (১৯৩৮), পৃঃ ৪১।

যাযাবর গায়ক সম্প্রদায় ছিল। এরা 'কাওয়ালী' নামক প্রেম-ভক্তি মূলক আঞ্চলিক গীতি গাইত।[1] এই কাওয়ালী থেকেই 'খেয়াল' বা 'খ্যাল' সৃষ্টি হয়।

এবার একে একে খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতগুলি পর্যালোচনা করা যাক :

খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি মতবাদ হল এই যে, আলিজাতীয় প্রবন্ধের অন্তর্গত 'কৈবাড়' নামক প্রবন্ধ থেকে 'খেয়াল' উদ্ভূত হয়েছে। এতে ছিল তিনটি সঙ্গীতাংশ (ধাতু) এবং এটি তিন 'অঙ্গ' বিশিষ্ট ভাবনী জাতীয়। 'সঙ্গীতসার' থেকে জানা যায় যে, এই প্রবন্ধে পাটাক্ষর দ্বারা উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুবের অনুষ্ঠান হয়। 'কৈবাড়' শব্দটি সম্বন্ধে কল্লিনাথ টীকায় বলেছেন—"কৈবাড় ইতি করপাট প্রধানত্বাত্তম্ভবোহপভ্রংশপদেনেয়ং সংজ্ঞা।" এ থেকে মনে করা যেতে পারে যে, মূলত শব্দটি ছিল 'করপাট'। এই সংস্কৃত শব্দটি প্রাকৃতে কৈবাট>কৈবাড় হয়েছে। মতঙ্গ তাঁর 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থে এই গীতির বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে :

অক্ষরৈর্গীয়তে সম্যক পাটৈরেব বি কেবলৈঃ।
কৈবাট ইতি স জ্ঞেয়ো গন্ধর্বৈস্তাল সংযুতঃ ॥

—অর্থাৎ, পাটাক্ষর সহযোগে গান্ধর্বতালে যে গীতি অনুষ্ঠিত হয়, তাকে 'কৈবাট' বলে।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে ঘনশ্যাম দাস (নরহরি চক্রবর্তী) কর্তৃক সংকলিত 'সঙ্গীতসিন্ধু সংগ্রহ' গ্রন্থে 'কায়বাল' নামীয় গীতের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তা এই :

এভ্যোহন্যো কায়বালাখ্যঃ স এবাদৌ নিরূপ্যতে।
যত্তালাঃ প্রকাশ্যন্তে পাটমাত্রেণ কেবলম্ ॥
পদানাং কল্পনাভোগে কায়বাল স ঈর্যতে।
উদাহরন্তু গীত প্রকাশে দৃশ্যতাম্ ॥

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, কায়বাল নামীয় গীতে পাট বা বাদ্যাক্ষর দ্বারা তাল প্রকাশ করা হত এবং আভোগ অংশে পদাদির কল্পনা করা হত। কৈবাড় প্রবন্ধের লক্ষণের সঙ্গে এই লক্ষণের মিল রয়েছে।

দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ বেঙ্কটমখী তাঁর 'চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা' (১৬২০) গ্রন্থের প্রবন্ধ প্রকরণে বলেছেন যে, তাঁর সময়ে এক গায়ক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছিল ; এঁরা আভোগটিকে পৃথকভাবে যোজনা করে এক ধরনের প্রবন্ধ গাইতেন। আভোগটিকে দুটি ভাগ করে তার প্রথম অর্ধটি তালবর্জিত আলাপের মতো গাওয়া হত, দ্বিতীয় অর্ধটি তালযুক্ত করে গাওয়া হত। 'কৈবাড়'

১। "দিল্লীর ঐ নিকটায় 'কাবাল' (কাওয়াল) নামক সঙ্গীত ব্যবসায়ী এক জাতি ছিল। সেখানে তাদের জাতীয় গান। এরা সর্বদা যে ভাল গান গায় তার নাম কাওয়ালী রাখা হয়েছে।"—কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গীতসূত্রসার', কলিকাতা (১৮৮৫)।

জাতীয় প্রবন্ধে এই প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হত। এই সমস্ত আলোচনার ওপরে ভিত্তি করে মন্তব্য করা হয়েছে—"এই সমস্ত বর্ণনা থেকে এইটি মনে হয় যে, এই কৈবাড়ই খেয়ালের আদিরূপ এবং পরিবর্তনটি এইভাবে হয়েছে—করপাট > কৈবাট > কৈবাড় > কায়বাল > খয়াল বা খেয়াল।"[1]

সিংহভূপালও বলেছেন যে, যে প্রবন্ধে পাট, অক্ষর এবং ধ্রুবা ও উদ্‌গ্রাহ এই দুই ধাতু থাকে এবং গ্রহ যেখানে উদ্‌গ্রাহতে শেষ হয় তাকেই কৈবাড় বলে :

'পাটাক্ষরৈব-ধ্রুবোদগ্রাহৌ কর্তব্যৌ

গ্রহ উদগ্রাহে সমাপ্তিরাস্য সা কৈবাড়ঃ ॥

কৈবাড় দুশ্রেণীর—সার্থক এবং অনর্থক। কল্লিনাথ কৈবাড় প্রবন্ধকে চার ভাগে ভাগ করেছেন—সার্থকশব্দকৈবাড়, অর্থহীনশব্দকৈবাড়, সার্থকমিশ্রকৈবাড় এবং অর্থহীনমিশ্রকৈবাড়। শেষোক্ত একটি কি দুটি শ্রেণীর প্রবন্ধে তিনটি করে সঙ্গীতাংশ (ধাতু) এবং তিনটি অঙ্গ (পাট, পদ, তাল) আছে এবং এগুলি ভাবনী জাতীয় : "পাটপদতালবদ্ধস্ত্রয়ঙ্গো ভাবনীজাতিমান"। ভাবনী জাতি সম্পর্কে সিংহভূপাল বলেছেন, "ত্রিভিরঙ্গৈ-রূপনিবন্ধ ভাবনী"—অর্থাৎ ভাবনী তিনটি অঙ্গে রূপ-নিবন্ধ।

কিন্তু সঙ্গীতরত্নাকরে আমরা দেখতে পাই যে সাধারণ কৈবাড় প্রবন্ধে দুটি অঙ্গ, কিন্তু মিশ্র জাতীয় কৈবাড় তা নয়। সুতরাং বলা যায় যে কৈবাড় প্রবন্ধ খেয়ালের উৎস নয়।

'খেয়াল'-এর উদ্ভব সম্পর্কে দ্বিতীয় অভিমত হল—খেয়াল-এর উৎস মূলে রয়েছে 'একতালী' এবং 'রাসক' প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ দুটি শুদ্ধসূড়-এর অন্তর্গত। 'রাসক' প্রবন্ধ 'ধ্রুবপদ'র মতো অর্থাৎ উদ্‌গ্রাহের প্রথমার্ধটি দুবার এবং পরের অর্ধটি একবার গাওয়া হয়। তবে এটি গমকস্থান বর্জিত অর্থাৎ সম্ভবত মেলাপক বর্জিত। এটি রাস তালে গাইবার রীতি। 'রাসক' সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেবের বর্ণনা এইরূপ :

ভজতে রাসকঃ সোঽয়ং রাসতালেন গীয়তে।

গণৈর্বর্ণৈশ্চ মাত্রাভিঃ কৈশ্চিদেনং ত্রিধা জগুঃ।

স্যাদ্রাসবলয়ো হংসতিলকো রতিরঙ্গকঃ।

চতুর্থস্তত্র মদনাবতারশ্ছগণাদিজঃ ॥

এই রাসক প্রবন্ধ দ্বি-অঙ্গ বিশিষ্ট 'তারাবলী' জাতীয় প্রবন্ধ। 'একতালী' প্রবন্ধের উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব অংশটি পুনরায় গাওয়ার পর গীত শেষ হয়। এটিও মেলাপক বর্জিত দ্বি-অঙ্গ বিশিষ্ট 'তারাবলী' জাতীয় প্রবন্ধ। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে শুধুমাত্র দুটি ধাতু থাকলেই তা খেয়াল গান হয় না।

খেয়ালের উৎস সম্পর্কে তৃতীয় মত হচ্ছে এই যে, আক্ষিপ্তিকা খেয়ালের উৎস। নিবন্ধ শ্রেণীর আক্ষিপ্তিকা স্বর এবং পদ সমন্বিত।

১। রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'সঙ্গীত সমীক্ষা', কলিকাতা (১৯৬৪), পৃঃ ১৭৫।

খেয়াল গানের বৈশিষ্ট্য হল পদের সঙ্গে এবং তালের সঙ্গে বিস্তার থাকে। আক্ষিপ্তিকার গায়ন-পদ্ধতিও এইরূপ :

চঞ্চৎপুটাদি তালেন মার্গত্রয় বিভূষিতা।
আক্ষিপ্তিকা স্বরপদ গ্রথিতা কথিতা বুধৈঃ ॥
সোহত্র করণ বর্তিন্যো প্রবন্ধান্তর গর্তোরিহ।
মতঙ্গাদি মতাদ্রূমৌ ভাষাদিম্বব রূপকম্ ॥

(সঙ্গীতরত্নাকর, রাগবিবেকাধ্যায় ২৬, ২৭)

এই আক্ষিপ্তিকার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের পল্লবী-র সাদৃশ্য রয়েছে। এ সম্পর্কে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের N. S. Ramchandran তাঁর 'Ragas of Carnatic Music' গ্রন্থে লিখেছেন, "Sarangadeva defines 'Aksiptika' as made up of swaras and padas, sung according to Chancharputa and other talas and adorned by the Margas. The 'Pallavi' receives similar treatment at the present day. Kallinatha states that it is a variety of nibaddhagita. In it any one of the Marga talas is applied. In this is used one of the three Margas, viz, chitra etc. and this is sung according to the rules applicable to Jatis. The swaras sa, rice etc. and words are arranged in it. Because the padas and talas are thrown up as it were, it is named Aksiptika. This is so considered by Matanga and others.

দেখা যাচ্ছে পদ ও তালের ক্ষেপণ অর্থে আক্ষিপ্তিকার মতো খেয়ালও তাল ও মাত্রায় নিবন্ধ, মার্গশ্রেণীর তাল আক্ষিপ্তিকায় ব্যবহৃত হয়। এই আক্ষিপ্তিকার সঙ্গে কিন্তু আলাপ এবং 'রূপক'-এর পার্থক্য আছে—একথা টীকাকার কল্লিনাথ বলেছেন। এই রূপককেই খেয়ালের অগ্রদূত বলা হয়। আক্ষিপ্তিকা থেকে খেয়াল গানের উদ্ভব হয়েছে একথা বলা ঠিক নয়।

সঙ্গীতরত্নাকর-এ রূপক প্রবন্ধের পরিচয় এইভাবে দেওয়া হয়েছে—

গুণান্বিতং দোষহীনং নবং রূপকমুত্তমম্।
রাগেন ধাতুমাতুভ্যাং তথা তাললয়ৌভুবৈঃ ॥
নূতনৈ রূপকং নূতনং রাগঃ স্থায়ান্তরৈর্ণবঃ।
ধাতুরাগাংশভেদেন মাতোস্তু নবতা ভবেৎ ॥
প্রতিপাদ্য বিশেষেণ রসালঙ্কার ভেদতঃ।
লয়গ্রহবিশেষেণ তালানাং নবতা মতা ॥
তালবিশ্রামতোহন্যোন বিশ্রামেণ লয়ো নবঃ।
ছন্দগণগ্রহন্যাস প্রবন্ধায়বৈর্নবৈঃ ॥

রূপক প্রবন্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর নতুনত্ব। শার্ঙ্গদেব মোটামুটিভাবে

যা বলতে চেয়েছেন তা হচ্ছে এই যে, এই নতুন ধরনের রূপক একটি দোষহীন ও গুণান্বিত গীতি, নতুন নতুন রাগের প্রয়োগে, কলির বিভিন্ন সংস্থানে, পদবৈচিত্র্যে এবং তাল-লয়ের বিচিত্র সমাবেশে এই গীত নতুনরূপে প্রতিভাত হয়। কেবলমাত্র নতুন রাগের প্রয়োগেই নয়, রাগের অবয়বের বৈচিত্র্য ঘটিয়ে রূপক প্রতিবার নবভাবে রূপায়িত করা হয়। রাগাংশ ভেদেও নতুনত্ব সম্পাদন করা হয়। এই গীতের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু এবং রসালংকার ভেদে বাক্যাংশেরও নতুনত্ব পরিলক্ষিত হয়। তাল বৈচিত্র্য এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এতে দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত—এই তিন প্রকার লয়ের পরিবর্তন ঘটানো হয়, সম, অতীত, অনাগত—এই তিন গ্রহের বৈষম্য প্রদর্শিত হয়। তাল বর্জনাদির দ্বারা অপরাপর অবয়বের বিশ্রাম ঘটিয়ে লয়ের নতুনত্ব সৃষ্টি হয়। ছন্দ, গণ-নিয়ম, গ্রহ, ন্যাস প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করার সুযোগ এই গানে আছে।

খেয়াল এবং রূপক প্রবন্ধের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ রতনজংকার বলেছেন, 'খেয়াল একটি পার্সী শব্দ এবং আমাদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এর অর্থ দাঁড়ায় কল্পনা, স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তা এবং আমাদের ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, সংস্কৃত গ্রন্থে যে রূপকম্ জাতীয় গীতের কথা পাওয়া যায় তারই মধ্যে এর বীজ নিহিত।' তাঁর ভাষায় বলতে গেলে, 'Roopakam is a musical compositson in which there is scope for creating novelty, something original out of the trodden path in the Raga as well in the wordings of the composition, by emphasising which, though ordinarily occurring in the Raga being sung are prominent in some other sympathetic Raga, by using fresh word expressing some emotion, by making changes in the Tala and Laya. It may not therefore be too fantastic perhaps to consider the Kheyal as an off-shoot of the Roopakam type of musical compositions. Within a short time after Sarangdeva the old system of music was fast receding in the background and a new one in which influence of foreign music was beginning to rush in was coming into vogue'.

এ বিষয়ে ঠাকুর জয়দেব সিং নতুন আলোকপাত করেছেন। খেয়ালের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'এরূপ মনে করা হয়ে থাকে যে, আমীর খসরু এই রীতির উদ্ভাবক এবং এটি ভারতীয় সঙ্গীতে পূর্বে ছিল না। আমীর খসরু খ্যাতি লাভ করেন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এমন কোন নিজস্ব গায়নরীতি কি ছিল না যা সব দিক থেকে মাধুর্যময়? শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকর' এই ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই লেখা হয়। আমরা এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য তাঁর দিকেই দৃষ্টিপাত করব। শার্ঙ্গদেব পাঁচ

রকম সঙ্গীত রীতির উল্লেখ করেছেন : শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা এবং সাধারণী। তিনি বলেছেন—

'শুদ্ধা স্যাদবক্রৈব-লালতৈঃ স্বরৈঃ।
ভিন্না বক্রৈঃ স্বরৈঃ সূক্ষ্মৈর্মধুরৈর্গমকৈর্বৃত্তা ॥"

ঠাকুর সাহেব বলতে চান যে খেয়াল নতুন রীতির গান নয়। প্রাচীন শাস্ত্রীয় সাধারণী গীতি থেকে এটা নতুন করে সৃষ্টি হয়েছিল এবং এর মনোমুগ্ধকর রীতিটি দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রচলিত রূপকালপ্তি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ঠাকুর সাহেবের নিজের ভাষায় বলতে গেলে, 'I maintain that the so-called Khayal style of musical composition is nothing but only a natural development of the Sadharani-giti, which used the exquisite features of all the styles. It is this Sadharani-giti with the predominant use of bhinna in it that became the Khayal.'[১]

ঠাকুর সাহেব কর্তৃক উল্লিখিত 'সাধারণী গীতি'র কথা আমরা পাই মতঙ্গের বৃহদ্দেশী গ্রন্থে। গীতির পরিচয় দিতে গিয়ে মতঙ্গ শুদ্ধা, ভিন্নকা, গৌড়িকা, রাগ, সাধারণী, ভাষা ও বিভাষা—এই সাতটি গীতির উল্লেখ করেছেন। এই গীতিগুলির গুণ এবং প্রয়োগবিধি পৃথক পৃথক। শার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীতরত্নাকরে এই রাগগীতিগুলির কথা বলেছেন। শার্ঙ্গদেবের উক্তি থেকেই আমরা জানতে পারি যে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে, ভরতের সময়েও পাঁচটি গীতি বা রাগগীতি সহ গ্রামরাগ প্রচলিত ছিল।

সিংহভূপাল বলেছেন,

"গ্রামরাগঃ পঞ্চপ্রকার ভবন্তি
কেন বিশেষণ তেষাম্ পঞ্চ-প্রকারত্বম্।
অত আহ পঞ্চগীতি সমাশ্রয়াদিতি।"

ভরত চারটি গ্রামরাগের উল্লেখ করেছেন। এগুলি মাগধী, অর্ধ-মাগধী, সম্ভাবিতা এবং পৃথুলা—এই চারটি গীতি সহযোগে প্রয়োগ করা হত।

শার্ঙ্গদেব 'সঙ্গীতরত্নাকর'-এর তৃতীয় অধ্যায়ে পাঁচটি গীতির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি পাঁচটি গীতির নাম বলেছেন শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা এবং সাধারণী। তাঁর বর্ণনা অনুসারে—

(১) অবক্র এবং ললিতস্বর যুক্ত গীতির নাম শুদ্ধা।

(২) মন্দ্র, মধ্য, তার—এই তিন স্থানে পরিব্যাপ্ত, দ্রুত কম্পনযুক্ত, গমক সমন্বিত, অখণ্ডিত স্থিতি, গাঢ়স্বর সম্পন্ন গীতি হল গৌড়ী।

(৩) বেসরা (অথবা বেগস্বরা) স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী, সঞ্চারী—এই চার বর্ণ সমৃদ্ধ এবং আবেগোচ্ছল।

১। 'A Historical Study of Indian Music' গ্রন্থে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ঠাকুর সাহেবের উক্তিগুলি উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত গ্রন্থের ২০৭-০৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(৪) বক্র, সূক্ষ্ম এবং মধুর স্বরসম্পন্ন গমকযুক্ত গীতির নাম ভিন্না।

(৫) উপরোক্ত চার প্রকার গীতির (অর্থাৎ শুদ্ধা, গৌড়ী, বেসরা, ভিন্না) মিশ্রণে যে গীতির সৃষ্টি হয় তার নাম সাধারণী। (সঙ্গীতরত্নাকর, ২য় অধ্যায়) সাধারণী গীতিই ছিল সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর, কারণ অপর চারটি গীতির শ্রেষ্ঠ অংশ নিয়ে এই গীতি রচিত। এই গীতি গমক পরিপূর্ণ, শ্রুতিমধুর এবং এর মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ভাবাবেগ থাকে। খেয়াল গানে এই সবগুলি গীতির সুন্দর অংশগুলি গ্রহণ করা হয়েছে। এতে সব রকম গমক[1] গ্রহণ করা হয়েছে ; খট্‌কা, মুড়কী, মীড়, কম্প, আন্দোলন—এ সবই সুন্দরভাবে খেয়ালের কাঠামোতে সন্নিবেশিত।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য এবং তা হল এই যে, খেয়ালের অলংকরণের সঙ্গে শাস্ত্রীয় রূপকালপ্তির সাদৃশ্য আছে। শার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীত-রত্নাকরের তৃতীয় অধ্যায়ে এই রূপকালপ্তির ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে :

রূপকস্থেন রাগেণ তালেন চ বিধিয়তে।
যা প্রোক্তা রূপকালপ্তিঃ সা পুনর্দ্বিবিধাভবেৎ॥

সিংহভূপাল বলেছেন, "প্রবন্ধস্থেন রাগেন তালেনচোপলক্ষিত যা আলপ্তি ক্রিয়তে সা রূপকালপ্তি।" অর্থাৎ প্রবন্ধস্থিত আলপ্তি অথবা আলাপ যখন রাগ এবং তালে আচরিত হয় তখন তাকে রূপকালপ্তি বলে।

রাগের আলাপনের নামই আলপ্তি। শার্ঙ্গদেব বলেছেন, "রাগালাপনমালপ্তিঃ প্রকটীকরণং মতম্।" সিংহভূপাল টীকায় বলেছেন, "যেন স্বরসন্দর্ভেন রাগঃ প্রকটীক্রিয়তে সা আলপ্তি। সা দ্বিবিধ, রাগালপ্তি রূপকালপ্তিশ্চ।" অর্থাৎ যে স্বর সন্দর্ভ দ্বারা রাগ প্রকটিত হয় তার নাম আলপ্তি। আলপ্তি দু'প্রকার—রাগালপ্তি এবং রূপকালপ্তি।

রাগালপ্তির শুধুমাত্র রাগকে কেন্দ্র করেই বিস্তার লাভ ঘটে। এটা রূপকের বা গানের মতো অংগযুক্ত নয়। রাগালপ্তির ব্যাপ্তিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। এর এক-একটি ভাগকে বলা হয় স্বস্থান। বিবিধ বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করে যাতে রাগ প্রতীয়মান হয় তার জন্য স্থায় প্রয়োগের ব্যবস্থা।

রূপকালপ্তি সৃজনশীল এবং কল্পনাত্মক গীতি (মনোধর্মী সঙ্গীত)। অন্য দিকে রাগালপ্তি প্রযুক্তিগত ব্যাপার। দৃশ্যকাব্যের ক্ষেত্রে 'রূপক'-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আলংকারিকরা বলেছেন, 'রূপরোপাৎ তু রূপকম্' অর্থাৎ রূপের আরোপই হচ্ছে রূপক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে মহাভারতের কৃষ্ণ, অর্জুন, কর্ণ প্রভৃতি হল এক-একটি রূপ। 'কর্ণার্জুন' নাটকে এক-একজন নট এর এক-একটি রূপ রূপায়িত করে। অর্থাৎ মহাভারতের কৃষ্ণ 'রূপ' আর নাটকের কৃষ্ণ 'রূপক'। রূপকালপ্তির ব্যাপারটিও এইরূপ। নিবন্ধ সঙ্গীতের যে বিশিষ্ট রূপ রয়েছে সেই রূপটিকে এক্ষেত্রে স্বরালাপে ফুটিয়ে তোলা

১। সঙ্গীতরত্নাকরে পনের প্রকার গমকের নাম পাওয়া যায়, সঙ্গীতপারিজাতে কুড়িটি গমকের নাম আছে এবং সেনী ঘরানায় প্রচলিত গমকের সংখ্যা বাইশ।

হয়। সোজাসুজি বলতে গেলে প্রবন্ধ সঙ্গীতের অনুকরণে এই রূপায়নকেই বলা হয় রূপকালপ্তি। এতে তানও সন্নিবেশিত থাকে।

রূপকালপ্তি দু'রকম—প্রতিগ্রহণিকা এবং ভঞ্জনী। রাগালপ্তি উপলক্ষে বিবিধ স্থায় প্রদর্শন করে যদি প্রবন্ধ সঙ্গীতের অবয়ব গ্রহণ করা হয় তাহলে তাকে প্রতিগ্রহণিকা রূপকালপ্তি বলে। এক্ষেত্রে আলপ্তি রূপককে গ্রহণ করছে।

ভঞ্জনী রূপকালপ্তি দু'রকম—স্থায়ভঞ্জনী এবং রূপকভঞ্জনী। প্রবন্ধের অনুরূপ রূপকে সংস্থিত স্থায়-এর বিচিত্র রীতি যখন প্রদর্শিত হয় তখন তাকে বলা হয় স্থায়ভঞ্জনী। এটি যদি আরও বিভিন্ন ভঙ্গীতে বৈচিত্র্য সহকারে অনুষ্ঠিত হয় তখন তাকে বলে রূপকভঞ্জনী। সিংহভূপাল দু'প্রকার ভঞ্জনীর সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এইভাবে: "যা স্যা মানপ্তৌ রূপকঃ সংস্থিতঃ প্রবন্ধান্তরীয়ো যাঃ স্থায়বর্গ-ব্যবস্থ্য প্রবন্ধস্য পদমানেক নানাপ্রকারোনেকা ভঙ্গিঃ ক্রিয়তে সা স্থায় ভঞ্জনী। রূপক ভঞ্জনী লক্ষিতি—তৈঃ পদৈরীতি। তৈঃ প্রবন্ধস্থৈ পদৈঃ ; তেন প্রবন্ধস্থেন মানেন সমগ্রমেব রূপক-মন্যথান্যথ ভঙ্গী-বিশেষণ যস্যামালপ্তৌ-গমক গায়েৎ সা রূপক ভঞ্জনী।" রাগের অবয়ব প্রতিষ্ঠা অথবা সংগঠনের রূপবন্ধকে স্থায় বলে। গায়ন পদ্ধতির বিভিন্ন কলাকৌশলও স্থায়ের অন্তর্ভুক্ত। স্থায়ভঞ্জনীর ক্ষেত্রে স্থায় শব্দের অর্থ অবশ্য সাঙ্গীতিক রচনারই অংশ।

সিংহভূপাল-এর মন্তব্য থেকে বোঝা যায় যে স্থায়ভঞ্জনী হল সুষ্ঠু সৃজনশীল কল্পনাত্মক রচনা। অন্যদিকে রূপকভঞ্জনী বলতে বোঝায়, 'শিল্পী যে গান করেন সেই গানের অন্তর্গত তানের মধ্যে তিনি আবদ্ধ নন, তিনি বিশেষ রাগ অনুসারে গমক অলংকার সহ অন্য তানও প্রয়োগ করে থাকেন।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে খেয়ালে যে অলংকরণ করা হয় সেইরূপ অলংকরণ স্থায় এবং রূপকভঞ্জনীতেও করা হয়ে থাকে।

শুদ্ধরূপক এবং আলাপ অথবা আলপ্তি এবং আক্ষিপ্তিকা থেকে রূপকালপ্তির অলংকরণ এবং ধরন কখনও কখনও পৃথক হয়। প্রবন্ধ এবং রূপক-এর মধ্যেও পার্থক্য আছে। প্রবন্ধে কাঠামোর সৌন্দর্যের ওপর জোর দেওয়া হয় আর রূপকে সৃজনশীল কল্পনার ওপর জোর দেওয়া হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে রূপকালপ্তির ওপর ভিত্তি করে সাধারণী গীতির কাঠামো থেকে খেয়ালের ক্রমবিকাশ ঘটেছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে খেয়াল সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্ট গান নয় এবং বিদেশ থেকেও তা আমদানি করা হয়নি এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমীর খসরু তার উদ্ভাবন করেননি। এই গান কাওয়ালদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কাওয়ালরা কাওয়ালী নামে দ্রুত লয়ে আঞ্চলিক গীতি গাইত। তারা তাদের গানে শুধুমাত্র 'কাউলা' ব্যবহার করত। ঠাকুর জয়দেব সিং বলেছেন, "সংস্কৃতে 'বচন' শব্দ বলতে যা বোঝায় 'কাউলা' বলতেও তাই বোঝায়। যদিও শব্দ দুটির ব্যাপক অর্থে ব্যবহার আছে, তথাপি সঙ্গীতে দুটি শব্দই

বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন হিন্দু ধর্মে 'বচন', 'বাণী' অথবা 'শব্দ' বলতে রহস্যময় অথবা ভক্তিমূলক গান বোঝায়, তেমনি মুসলমান ধর্মে 'কাওয়ালী' অথবা 'কাউলা' শব্দের অর্থ রহস্যময় গান।" আমীর খসরু কাওয়ালী বা কব্বালী সম্পর্কেই বেশি আগ্রহী ছিলেন, তিনি এই ধরনের গানে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন এবং প্রচুর গানও রচনা করেছিলেন। এই আমীর খসরুকে আমরা পাই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এবং এই ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকর প্রকাশিত হয়। আমীর খসরু নিঃসন্দেহে একজন অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী। তাছাড়া পারসী, উর্দু, হিন্দি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। সুতরাং সঙ্গীতরত্নাকর-এ বর্ণিত সাধারণী-রাগগীতি এবং রূপকালপ্তি প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকারই কথা। এটা হতে পারে যে তিনি তাঁর সময়ে প্রচলিত কাওয়ালী রীতির মধ্যে কোনও বিশেষ রীতিকে খেয়াল নামে অভিহিত করে থাকবেন। কিন্তু এরও কোনও প্রমাণ নেই। যদি তাই হয় তাহলে এটা সম্ভব যে এই বিশেষ রীতিই ক্রমশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং এই রীতি ক্রমশ সংস্কৃত হয়ে ক্রমবিকাশের পথে পঞ্চদশ শতাব্দীতে শর্কী শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে শর্কী শাসকদের সময় ধ্রুপদের চর্চা ব্যাপক ছিল। যদিও এই সময়েই খেয়ালেরও প্রচলন দেখা যায়, তথাপি সুলতানদের সভায় পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে লাভ করে ধ্রুপদই। ক্যাপটেন উইলার্ড খেয়ালের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তিনি বলেছেন, 'In the Kheyal the subject generally is a love tale and the person supposed to utter it, a female. The style is extremely graceful, one replete with studied elegance and embellishment.'১

উইলার্ডের উক্তি থেকে বুঝতে পারা যায় যে চটুল প্রেমসঙ্গীত হিসাবে খেয়ালের প্রচলন এই সময়ে ছিল এবং বিশেষভাবে নারীরা অর্থাৎ নর্তকীরা এই গান গাইত। তবে, উইলার্ড হুসেন শর্কীকে খেয়ালের প্রবর্তক হিসাবে যে ঘোষণা করেছেন সে সম্পর্কে মতভেদ আছে।

জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ শর্কী

পাশ্চাত্য সঙ্গীত সমালোচকগণ হুসেন শাহ শর্কীকে খেয়ালের উদ্ভাবক বলেছেন। Captain Willard-এর মতে 'খেয়াল' খইরাবাদ জেলার প্রচলিত ভাষায় প্রধানত রচিত হয়। তিনি আরও বলেছেন, 'জৌনপুরের সুলতান হুসেন শর্কী এই রীতির গানের প্রবর্তক।'২ A. H. Fox Strangways

১। 'A Treatise on the Music of Hindoostan', (1834), p. 67.

২। 'Sooltan Hoosyan Sharque of Jaunpur is the innovator of this class of song' 'Treatise on the Music of Hindoostan', (1834) by Captain Willard, p. 67.

তাঁর 'Music in Hindostan' (1914) বইতে লিখেছেন যে সাধারণ ধরনের খেয়াল ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদের পরবর্তী রূপ ; এটা ১৪০১ থেকে ১৪৪০-এর মধ্যে মহম্মদ (সুলতান) শর্কীর[১] সময় থেকে সৃষ্টি হয়।

রাগদর্পণে ফকীরুল্লা খেয়ালের পরিচয় দিয়েছেন এবং বলেছেন, 'খেয়াল দুটি কলিতে গঠিত এবং দেশীভাষায় গাওয়া হয়। বর্তমানে এটি দিল্লী অঞ্চলে প্রচলিত। আকবরের সময় এটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। যখন আকবরাবাদ রাজধানী হল সেই সময় যাবতীয় গায়ক ও ওস্তাদ যাঁদের তুলনা কোন যুগে দেখা যায়নি তাঁরা এখানে জমা হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই গোয়ালিয়রের বাসিন্দা ছিলেন…বর্তমানে যে সব ভাষা ভালোভাবে বলা হয় তা দশ শতেরও অধিক। এইসব ভাষার প্রেম ও প্রেমিক সম্বন্ধীয় গান রচিত হয়েছে। কতকগুলি খেয়াল আছে যেগুলি চারটি কলি সহযোগে গঠিত। কিন্তু প্রথম দুটি কলির পদান্তে মিল শেষের দুটি কলির মিল থেকে পৃথক।'[২] এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আকবরের পূর্ব থেকেই অর্থাৎ ষোড়শ শতকের আগেই 'খেয়াল' প্রচলিত হয়েছিল।

জৌনপুর যে সঙ্গীতের অন্যতম কেন্দ্র ছিল এবং হুসেন শাহ শর্কী যে সঙ্গীতের একজন বিখ্যাত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ফিরোজ তুঘলক তাঁর পৃষ্ঠপোষক মহম্মদ জৌন-এর স্মৃতি রক্ষার্থে জৌনপুর শহর নির্মাণ করেন। এই জৌনপুরের শাসনকর্তা খাজা জহান্ দিল্লীর সুলতানদের আনুগত্য অস্বীকার করে 'মালিক-উশ-শর্ক' উপাধি গ্রহণ করে স্বাধীন রাজবংশের পত্তন করেন। সেই থেকে জৌনপুরের সুলতানরা নিজেদের 'শর্কী' নামে অভিহিত করেছেন। এই বংশের সুলতান ইব্রাহিম শাহ শর্কী একজন সুযোগ্য নরপতি ছিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃতিবান ছিলেন এবং সাহিত্য, সঙ্গীত এবং অপরাপর কলাবিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এর ফলে তাঁর সময়েই জৌনপুর মুসলিম সংস্কৃতির একটি কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। জৌনপুরে সঙ্গীতের চর্চা দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত ছিল। এই রাজবংশেরই সুলতান হুসেন শাহ শর্কী। সুলতান মহম্মদ শা একজন অপদার্থ নরপতি ছিলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং অভিজাতশ্রেণীর লোকেরা তাঁকে হত্যা করে হুসেন শাহ শর্কীকে সিংহাসনে বসান (১৪৫৮)। তিনি বহলোল লোদী-র সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন এবং ওড়িশা অভিযান করেন। ১৪৬৬-তে তিনি গোয়ালিয়র দুর্গ আক্রমণ করেন এবং রাজা মানসিংহ তোমর

১। এখানে সম্ভবত ইব্রাহিম শা শর্কী-র কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। ইনি মুবারক শা শর্কীর মৃত্যুর পর ১৪০২ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রায় ৩৪ বছর রাজত্ব করেন।— 'An Advanced History of India', New York (1965). pp. 347-48.

২। রাজ্যেশ্বর মিত্র-এর অনুবাদ, 'মুঘল যুগের সঙ্গীত চিন্তা', কলিকাতা (১৯৬৪), পৃঃ ৫৭-৫৮।

প্রচুর ধন-সম্পদ খেসারৎ দিয়ে রেহাই পান। কিন্তু বহলোল লোদীর সঙ্গে আবার হুসেন শাহ শর্কীর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জৌনপুর স্বাধীনতা হারায়। হুসেন শাহ শর্কী পরাজিত হয়ে প্রথমে বিহারে এবং পরে বাংলাদেশের নবাব হুসেন শাহ-র রাজত্বে বাস করতে থাকেন। দীর্ঘদিন যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকলেও হুসেন শাহ শর্কী এরই মধ্যে সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষণা ও সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন। বহু গ্রন্থ থেকে আমরা তাঁর সঙ্গীতসাধনার কথা জানতে পারি। ইতিপূর্বে তাঁর সম্পর্কে Captain Willard-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। অতুলানন্দ চক্রবর্তী লিখেছেন, 'The culture of Jaunour is alive in the minds of many to-day. It lives through its gift of Khayal to Indian music. The Jaunpuri style of Khayal is a thing of joy in our daily life throughout India. For this enchanting legacy we are indebted to Sultan Hussain Sharqui.'[১]

এই ধরনের উক্তি সত্ত্বেও হুসেন শাহ শর্কীকে খেয়ালের প্রবর্তক বলতে অনেকেই রাজি নন। তিনি 'শ্যাম' এবং 'টোড়ী' রাগগুলির বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন একথা জানা যায়। তবে কেউ কেউ বলেন, তিনি যে সঙ্গীত-রীতির প্রবর্তন করেন তা 'চুটকলা' নামে পরিচিত। এই 'চুটকলা' এক ধরনের প্রেম সঙ্গীত। ফকীরুল্লা 'রাগদর্পণ'-এ বিভিন্ন প্রকার সঙ্গীতের বিবরণ দিতে গিয়ে জৌনপুরে প্রচলিত একপ্রকার গীতিকে 'চুটকলা' বলেছেন। এই গানে দুটি কলি থাকে; পদান্ত মিল এতে থাকে না এবং এই গান তালে গাওয়া হয় না। দুটি কলির প্রথমটিতে যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়, দ্বিতীয়টি কবিতার মতো।

এই গানের বিষয়—প্রেম ও বিরহ। এই গান যুদ্ধ সম্পর্কে রচিত হলে তাকে সাধরু-চুটকলা বলা হয়। গানের এইরূপ বিবরণ দেওয়ার পর ফকীরুল্লাই বলেছেন যে, এই গীতের স্রষ্টা সুলতান হুসেন শর্কী।

ক্যাপটেন উইলার্ড তাঁর বইতে 'চুট্‌কলা' সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তিনি খেয়াল থেকে উদ্ভূত এক তুক্‌ বিশিষ্ট গানকে বলেছেন 'চুট্‌কলা' এবং দুই তুক্‌ বিশিষ্ট গানকে বলেছেন 'বারুই' (A Treatise on the Music of Hindoostan, P. 67)। সুলতান হুসেন শর্কীর যুগেও প্রকৃত খেয়াল সৃষ্টি হয়নি। বরং বলা যায় নানা প্রচেষ্টা খেয়াল গঠনের দিকে এগিয়ে চলেছিল। এই সৃষ্টিকর্মে হুসেন শর্কীর অবদান অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাই বলে তিনি খেয়ালের উদ্ভাবন করেন—একথা স্বীকার করা কঠিন।

শর্কী শাসকদের সময় যে ধরনের খেয়াল রীতির প্রচলন হয়েছিল তার প্রসার বন্ধ হয়ে যায়নি।

আকবরের রাজত্বকালে অর্থাৎ ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে ধ্রুপদের যখন চরম

১। 'Hindus and Musalmans of India', Calcutta (1940), P. 95.

উন্নতির যুগ, তখনও এই ধরনের খেয়াল প্রচলিত ছিল। ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে লেখা 'রাগদর্পণ' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার গীতের বর্ণনা প্রসঙ্গে ফকীরুল্লা বলেছেন, 'খেয়াল দুই কলিতে গঠিত। দেশী ভাষায় এই গান গাওয়া হয়। বর্তমানে এই গান দিল্লী অঞ্চলে প্রচলিত। আকবরের সময় এটি প্রসিদ্ধি লাভ করে।'

ফকীরুল্লার মন্তব্য থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে আকবরের পূর্বেই খেয়ালের প্রচলন ছিল। আকবরের সময় তার প্রসিদ্ধি ঘটলেও রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে পারেনি। ব্যক্তিগতভাবে খেয়াল গান অনেকেরই পছন্দ ছিল এবং রাজপরিবারে খেয়াল গান অপরিচিত থাকার কথা নয়। কিন্তু ধর্মমন্দিরে খেয়াল প্রবেশাধিকার পায়নি। কারণ খেয়াল গানের গড়নের মধ্যে ঐহিক ভোগতৃষ্ণা যে পরিমাণে বলবতী, অধ্যাত্ম প্রেরণা সে পরিমাণে দুর্বল। খেয়াল পার্থিব ভোগসুখপরায়ণ রাজাদের এবং নর্তকীদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল। ঠাকুর জয়দেব সিং বলেছেন, 'Since the style was ornate and romantic, it did not find favour in the temples. It was mostly patronised by the kathiks, the dancing girls and kings.' ঠাকুর জয়দেব সিং আরও বলেছেন, 'জৌনপুরের শর্কী রাজারা চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে খেয়াল গানের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ষোড়শ শতকে এই গান রীতিমতো জনপ্রিয় ছিল।' ঠাকুর সাহের দেখিয়েছেন যে শ্রীবল্লভাচার্যের পৌত্র গোকুলনাথ ব্রজভাষায় 'চৌরাশি বৈষ্ণবোঁকী বার্তা' নামে যে বই সংকলন করেন তার ভেতরে খেয়াল গানের কথা আছে। শ্রীবল্লভাচার্য ষোড়শ শতকের লোক। সুতরাং খেয়াল যে তাঁর সময়ে প্রচলিত ছিল তা বুঝতে পারা যায়।

মোগল বাদশাহের যুগেই খেয়াল ধীরে ধীরে প্রতিপত্তি লাভ করে এবং সেই সঙ্গে ধ্রুপদও ধীরে ধীরে সরে যায়। আকবরের আমল পর্যন্ত এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া তেমন প্রকাশ হতে পারেনি। তারপর থেকেই ধ্রুপদের বিশুদ্ধি ক্রমশ নষ্ট হয়ে খেয়ালের পথকে সুগম করল। তানসেন গাইতেন শুদ্ধবাণী ধ্রুপদ—ধীর, স্থির, গম্ভীর তার রূপ। কিন্তু তানসেনের মৃত্যুর পর অপেক্ষাকৃত চটুল খান্ডার বাণী ধ্রুপদ এসে খেয়ালের প্রতিপত্তির পথ প্রশস্ত করে দিল। ওস্তাদরা বাদশাহের মনোরঞ্জনের জন্য এবং বাদশাহদের উৎসাহে ধ্রুপদ ছেড়ে খেয়ালের দিকে ঝুঁকলেন। ফলে ধীরে ধীরে ধ্রুপদ ম্লান হয়ে এল। এইভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে খেয়ালের প্রতিষ্ঠা হয় এবং শাহ সদারঙ্গ এই রীতির প্রতিষ্ঠাতা।

সদারঙ্গ

সদারঙ্গ ঢিমা খেয়াল প্রবর্তন করেন। ঢিমা খেয়াল প্রবর্তন করে ধ্রুপদ ও খেয়ালের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু দ্রুত লয় বিশিষ্ট খেয়ালের অগ্রগতি রোধ করা সম্ভব ছিল না। সদারঙ্গ ধ্রুপদের

অনুসারে বিলম্বিত খেয়াল প্রবর্তন করলেও দ্রুত খেয়াল-এর আগমন রোধ করা যে সম্ভব ছিল না তার কারণও রয়েছে। ধ্রুপদের মধ্যে সুষমা ও বিকাশের সীমা নির্ধারিত, খেয়ালের বিকাশ সীমাবদ্ধ নয়। খেয়াল-গায়ক নিজের অনুভূতি অনুযায়ী রাগের বিস্তার এবং অলংকার প্রয়োগ করতে পারেন।

সদারঙ্গের খেয়ালের সঙ্গে কাওয়ালী গানের স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কাওয়াল মধ্য লয়ে গাওয়ার রীতি। এতে রাগ কিংবা তানের বিস্তার নেই, গানের অঙ্গেই তান সন্নিবেশিত। চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ, বাজবহাদুর, শেখ বহাউদ্দীন, চীর মহম্মদ প্রভৃতি গায়করা হালকা চালের গান হিসাবেই কাওয়ালী গাইতেন।

সদারঙ্গ যে খেয়ালের প্রবর্তন করেন তার বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি ধ্রুপদ-ধারার কিছু পরিবর্তন করে খেয়াল গানের প্রবর্তন করেন। এই গানে ধ্রুপদের মতো শুধু মীড়ের তান নয়, দ্রুত লয়ের তানও প্রয়োগ হয়। গিটকিরি ইত্যাদি লঘু অলংকার এতে ব্যবহৃত হয়। এই গানে শুধু স্থায়ী এবং অন্তরা এই দুই তুক্ থাকে-এবং সঞ্চারী ও আভোগের ব্যবহার নেই। বিস্তার ও তানে ধ্রুপদের মতো বাট-উপজ হয় না। তার পরিবর্তে সোপতান ও 'আ'কার তানের প্রয়োগ বেশি দেখতে পাওয়া যায়। বীণার গমক ও জোড়ের অনুকরণে সদারঙ্গ গমক তানের প্রবর্তন করেন। তাঁর অধিকাংশ গানেই রয়েছে মহম্মদ শাহের গুণকীর্তন। সে যুগে এটা প্রায় রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে শাহের গুণকীর্তন ছাড়া অন্য গানও আছে। এখানে সদারঙ্গ-এর একটি খেয়াল গানের উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে—

দরবারী কানাড়া। বিলম্বিত একতাল

চটকন বোলিয়ে রি নারী,
হঃতো রঙ্গীল লাল রসকী রসাল।
তুম বিন মোহে নিদ ন আবে,
অধরনসে মীঠে বোলে রসকী রসাল॥

০ ৪ ৪
সা | রা -সা | -ররা -ণা | -সণ্া রসা I
চ ট ০ ০০ ০০ কন

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
II ণ্দ্া -া | -ণ্ -ম্া | প্ম্প্া | সা -া | ণ্দ্া ণ্দ্া | -ণ্া -সা I
বো ০ ০ ০ ০০লি য়ে০ ০০ রি ০ ০

I সা -া | -ণ্সা সা | ণ্া সা | রা মজ্ঞা | -মা -মপা | -পদা পপা I
না ০ ০০ রী হঃ তো রঙ্ গী ০ ০০ ০০ লে০

I মঃ -জ্ঞঃ | -মজ্ঞ -মা | রা সা | রা -া | -া -া | ণা পদা I

লা ০ ০০ ০ ল র স ০ ০ ০ কী র০

II

I মপা -মজ্ঞ | -মপা জ্ঞমা | রা সা | রা -সা | -ররা -ণ | -সণ্‌ রসা II

সা ০০ ০০ ০ ল "চ ট ০ ০০ ০ ০০ কন"

০ ৩ ৪

মা | মা পা | র্সা -া | -ণর্সা র্সা I

তু ম বি ন ০ ০০ মো

১' ০ ২ ০ ৩ ৪

II র্সা -া | সণ্‌ -র্সা | র্রা র্সা | র্রা -র্সা | -ণর্সা র্র'র্রা | -র্স'র্সা ণদা I

হে ০ নি০ ০ দ ন স্বা ০ ০০ ০০ ০০ নে০

I -ণা -পা | মজ্ঞা মজ্ঞা | মা পা | ণদা -ণপা | -ণঃ র্সাঃ | পণা পমা I

০ ০ অ ধ র ন সে০ ০০ ০ ০ স্মী তৈ০

I মপা -মজ্ঞা | মপা -জ্ঞমা | -রা সা | সা সা | -র্সা -া | না পমা I

বো ০০ ০০ ০ ০ লে র স ০ ০ কী র০

I মপা -মজ্ঞা | -মপা -জ্ঞমা | রা সা | রা সা | -ররা -ণ্‌ | -সণ্‌ রসা II II

সা ০০ ০০ ০ ল "চ ট ০ ০০ ০ ০০ কন"

সদারঙ্গের আসল নাম নিয়ামৎ খাঁ। তবে সদারঙ্গ নামেই তিনি পরিচিত। মহম্মদ শাহ-র দরবারে আসবার পর থেকে তিনি এই নামে পরিচিত হন। 'সদারঙ্গ' নামটিরও বিশেষ তাৎপর্য আছে। নিয়ামৎ খাঁ বীণায় ও কণ্ঠসঙ্গীতে 'খোসরঙ্গ' বা হৃদয়গ্রাহী বৈচিত্র্য সুষমা এত প্রচুর পরিমাণে এনেছিলেন যা পূর্ববর্তী কোনও সঙ্গীত-সাধক আনতে পারেননি। 'সদা তাঁর সঙ্গীত রঙ্গের ঔজ্জ্বল্য লক্ষিত হত বলে তাঁর নাম সদারঙ্গ রাখা হয়েছিল।'[১]

তিনি তানসেনের কন্যা বংশের খুশাল খাঁ-র (ঔরঙ্গজেবের সমসাময়িক) পৌত্র এবং লাল খাঁর পুত্র। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই তাঁর জন্ম।

সে-যুগে কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের মানের তারতম্য ছিল। সদারঙ্গ প্রথম জীবনে ছিলেন একজন নিপুণ বীণকার, কিন্তু যন্ত্র সম্বন্ধে গায়কদের অবহেলা তাঁকে পীড়িত করত। তাই তিনি কণ্ঠসঙ্গীত সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ-এর[২] সভাগায়ক ছিলেন।

১। বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান', কলিকাতা (১৩৬৪), পৃঃ ৫৮।

২। এঁর প্রকৃত নাম রোশন আখতার। তিনি বাহাদুর শাহ-র চতুর্থ পুত্র জহান শাহ-র ছেলে। ইনি ১৭১৯ থেকে ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি সুপুরুষ ছিলেন এবং আমোদ-প্রমোদের মধ্যে ডুবে থেকে একেবারে বিলাসের জীবন যাপন করেন।

বংশবৈশিষ্ট্য অনুসারে সদারঙ্গ ছিলেন বীণকার এবং ধ্রুপদ-ধামার গায়ক। কেউ কেউ বলেছেন যে ধামার সদারঙ্গের সময়েই সৃষ্টি হয় এবং সদারঙ্গকে ধামারের সৃষ্টিকর্তাও বলা হয়। ধামার ধ্রুপদ ও খেয়ালের মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ। এর মধ্যে একটু চঞ্চল ভাব রয়েছে। ধামার প্রধ ত কৃষ্ণের দোললীলামূলক। খেয়ালের বিষয়বস্তুর মধ্যেও কৃষ্ণলীলার বর্ণনা পাওয়া যায় এবং মুসলমান সাধক ও মহম্মদের স্তুতিবাদও পাওয়া যায় না এমন নয়। সদারঙ্গ বহু ধামার রচনা করেছিলেন এবং ধামারকে তিনি জনপ্রিয় করে তোলেন। সম্ভবত এই জন্যই তাঁকে ধামারের সৃষ্টিকর্তা বলা হয়।

সদারঙ্গ কিছু সংখ্যক ধ্রুপদও রচনা করেন। তানসেনের মতোই তাঁর রচনায়ও কাব্যসৌন্দর্য লক্ষ করা যায়। যেমন—

সব বনমে কৈসে সোহে ঋতুরাজ দিন আঈ
মন্দ মন্দ পবন বহত বহু বরণ হোয় সুমন।
সদারঙ্গকে প্রভু আজ লেতহি মুরলজী সাজ
বজাবে পঞ্চমরাগ সুর নর হোয় মগন।

সদারঙ্গ প্রায় প্রতিটি রাগের ওপরেই ধামার গান রচনা করেন। ধামার গানের ভাব, ভাষা, বিষয়বস্তু একই। তা সত্বেও এর মধ্যেও তিনি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। তাঁর অপূর্ব কবিপ্রতিভার জন্যই এটি সম্ভব হয়েছিল।

ধ্রুপদ এবং ধামার রচনা করলেও খেয়াল-গায়ক হিসাবেই তাঁর খ্যাতি। তাঁর হাতেই খেয়ালের নতুন করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। মহম্মদ শাহের সময় খেয়াল গান যে উন্নতিলাভ করে এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে, তা তাঁরই প্রচেষ্টায়। তিনি যে কলাবন্তী খেয়ালের উদ্ভাবক তার মধ্যে নায়িকা ভেদ, নায়ক প্রশংসা, ঋতু বর্ণনা প্রভৃতি বিষয়ের সমাবেশ রয়েছে। তিনি ব্রজভাষা, হিন্দীভাষা, পাঞ্জাবী ভাষা প্রভৃতিতে দক্ষ ছিলেন। তাঁর গানে বিভিন্ন ভাষার শব্দ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

যন্ত্রসঙ্গীত অবলম্বনে তিনি তাঁর সাঙ্গীতিক জীবন শুরু করেন। যন্ত্রসঙ্গীতে তাঁর দান সামান্য নয়। তিনি সেতারে তিন তারের পরিবর্তে সাতটি তার সংযোজিত করেন এবং সেতারে চিকারীর তার সংযোজিত করে ধ্রুপদ ভাঙা বিলম্বিত গৎ প্রবর্তন করেন। বিলাস খাঁ বংশীয় মসীদ খাঁ সদারঙ্গেরই শিষ্য।

অদারঙ্গ

বিখ্যাত খেয়াল-গায়ক হিসাবে সদারঙ্গ-এর পরেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি হলেন অদারঙ্গ। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক। অদারঙ্গের প্রকৃত নাম ফিরোজ খাঁ। 'অদারঙ্গ' মোগল দরবার প্রদত্ত উপাধি বিশেষ। ইনি সদারঙ্গের প্রথম পুত্র। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এঁর জন্ম। ইনিও মহম্মদ শাহ-এর দরবার অলংকৃত করেছিলেন। সদারঙ্গের মতোই ইনিও বীণকার এবং খেয়াল ও ধামার গানে দক্ষ ছিলেন। অদারঙ্গের একটি গান—

পুরিয়া। ধামার

লাজোই আঁখিয়া তামে কজরা পরো
অতি চতুর সুন্দর নার।
য়া দরশ গয় কছু সুধ ন রহত
রাতে মতবারো খেলত ধমার।
চন্দন বন্দন বুকা রোরি
কেশরকী পিচকার।
রঙ্গ মচায়ো গোকুলমে
হোরি খেলত নন্দকুমার॥

অদারঙ্গের গানে যেমন ভাব-গাম্ভীর্য লক্ষ করা যায়, তেমনি লক্ষ করা যায় তাঁর ভাষার মাধুর্য। তিনি মহম্মদ শাহ-র স্তুতি করে গান রচনা করেছেন। সদারঙ্গের মতোই তাঁর গানে নায়িকা ভেদ, ঋতুবর্ণনা রয়েছে। অদারঙ্গ ব্রজভাষা এবং পাঞ্জাবীভাষা ব্যবহার করেছেন তাঁর গানে। তিনি শুধু গায়ক নন, স্রষ্টাও বটে। তাঁর রচিত 'ফিরোজখানি টোড়ী' রাগ সঙ্গীতজগতে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

মহারঙ্গ

আর-একজন খেয়াল-গায়কের নাম মহারঙ্গ। ইনি সদারঙ্গের দ্বিতীয় পুত্র। এঁর আসল নাম ভূপৎ খাঁ। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনিও পিতা সদারঙ্গ এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অদারঙ্গের মতোই একাধারে বীণকার, ধামার এবং খেয়াল-গায়ক ছিলেন। বীণাবাদনে ইনি বেশি নিপুণ ছিলেন। এইজন্য ইনি শাহ বীণকার নামে পরিচিত।

মনরঙ্গ

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, মনরঙ্গ নামটি সদারঙ্গ, অদারঙ্গের অনুকরণে প্রচলিত। তবে মনরঙ্গ তাঁদের বংশের কেউ নন। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক, কিন্তু এঁর বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে, ইনি সদারঙ্গের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন বলেই সম্ভবত মনরঙ্গ নাম গ্রহণ করেছিলেন বা এই নামে অভিহিত হয়েছিলেন। তবে ইনি ধ্রুপদও গাইতেন এবং খেয়ালও গাইতেন। ইনি শুধু গায়কই ছিলেন না, সঙ্গীত-রচয়িতাও ছিলেন। এঁর রচিত একটি গানের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—

ভৈরবী। বিলম্বিত ত্রিতাল

করনা হোয় সো করলে প্যারে,
নাই জনম জাত দিন রৈন সবারে।

সগরী উমর বীত গয়ি হৈ, ছিন পল—
মাহ্ দিন সম্বৎসরে।
ধন যৌবন কছু থির নাই হৈ,
চেতনা হোয় তো চেত ভলারে।
মনরঙ্গ প্রভু মত ভুল জগত সঙ্গ,
কাহে কূ শির পর লেত তু ভারে।

মনরঙ্গ নতুন ধরনের 'সাদ্‌রা'-র প্রচার করেছেন। ফকীরুল্লার 'রাগদর্পণ' গ্রন্থে 'সাধ্‌রা' নামে যে গীতের পরিচয় আছে সেই গান চার, ছয়, বা আট কলিতে নিবদ্ধ। এটি যুদ্ধ বিষয়ক গীতি। কিন্তু এখানে যে 'সাদ্‌রা'-র উল্লেখ করা হচ্ছে সেটি অন্য শ্রেণীর। "ঝাঁপতালে রচিত হোরি বা ধ্রুপদ গানকে সাদ্‌রা বলা হয়। দিল্লীর সন্নিকটে শাহ দারা গ্রাম-নিবাসী এবং বৈজুবাওরার শিষ্য-পরম্পরাভুক্ত ভ্রাতৃদ্বয় শিবমোহন ও শিবনাথ ঝাঁপতালের ধ্রুপদে এক বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ রীতি প্রচলিত করিয়া স্বীয় গ্রামের নামানুযায়ী উহার নামকরণ করেন। পৃথক ভাবে ঝাঁপতালের অথবা ধ্রুপদের নাম সাদ্‌রা নহে, কিন্তু উভয়ের সম্মিলিত নাম সাদ্‌রা প্রখ্যাত হইয়াছে।"[১] ধ্রুপদ বলতে প্রধানত চৌতালের ধ্রুপদ, ধামার বলতে ধামার তালের ধ্রুপদ বোঝায়। সাদ্‌রা বলতে বোঝায় ঝাঁপতালে ধ্রুপদ অর্থাৎ যার মধ্যে ধ্রুপদের ভাব এবং খেয়ালের গতি একই সঙ্গে সন্নিবেশিত।

সদারঙ্গ, অদারঙ্গ প্রমুখ ছাড়াও অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও কয়েকজন খেয়াল-গায়কের নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে রয়েছেন হাসির খাঁ, গুলাম রসুল এবং তাঁর ভাই জান রসুল প্রমুখ। হাসির খাঁ কাওয়ালী খেয়াল গাইতেন। জানা যায় যে, সদারঙ্গ দুটি ভিক্ষুক বালককে খেয়াল গান শেখান। এই সুকণ্ঠ বালকদ্বয় সদারঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে কাওয়ালী গান শেখেন। এজন্য এ'রা কাওয়াল বলে পরিচিত এবং এ'দের বংশাবলীর গানকে কাওয়ালী ঘরাণার গান বলা হয়। এ'দের গানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ'রা বীণাযন্ত্রের আলাপের অনুকরণে খেয়াল গানের বিস্তার ও বোলতান এবং জোড়-এর অনুকরণে 'আ'-কার তান প্রয়োগ করতেন। গুলাম রসুল এবং জান রসুল পাঞ্জাব প্রদেশের সন্তান। এঁরা আসফদ্দোলা-র রাজত্বকালেও অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। এই দুভাই সদারঙ্গের খেয়াল ব্যাপকভাবে প্রচার করেন।

ধ্রুপদ-এর চারটি তুক্ (অংশ)—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। দুই তুক্ (স্থায়ী, অন্তরা)-বিশিষ্ট ধ্রুপদও আছে। সেজন্য এরকম বলা ঠিক নয় যে দুই তুক্ বিশিষ্ট গান হলে খেয়াল গান আর চার তুক্ বিশিষ্ট গানকে ধ্রুপদ বলে। ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের বিষয়বস্তুতে পার্থক্য আছে। ধ্রুপদের বিষয়বস্তু প্রধানত ঈশ্বরের লীলা বর্ণনা এবং রাজবন্দনা। খেয়ালের

১। বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, 'ভারতীয় সঙ্গীতকোষ', কলিকাতা (১৩৭২), পৃঃ ১৩১।

বিষয়বস্তু সাধারণত শৃঙ্গার রসাত্মক। অবশ্য কিছু কিছু প্রকৃতির বর্ণনাও পাওয়া যায় এই গানে।

ধ্রুপদ ও খেয়াল গানে ব্যবহৃত তালেও পার্থক্য আছে। ধ্রুপদ গান গাওয়া হয় চৌতাল, ব্রহ্মতাল, সুরফাঁক, তেওড়া, ঝাঁপতাল প্রভৃতি তালে। খেয়াল গানে ব্যবহৃত হয় ঝুমরা, তিলুয়াড়া, রূপক, তেওড়া, ঝাঁপতাল ও ত্রিতাল প্রভৃতি। অবশ্য এই ব্যাপারে উভয় প্রকার সঙ্গীতে মিলও বর্তমান। যেমন— তেওড়া এবং ঝাঁপতালে ধ্রুপদ ও খেয়াল দুই-ই গাওয়া হয়।

ধ্রুপদ এবং খেয়ালের গায়কী রীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ধ্রুপদ গানের প্রকৃতি গম্ভীর, গতি ধীর। এই গানে গমক-এর প্রাধান্য। গিটকিরি বা তান এই গানে ব্যবহৃত হয় না। ধ্রুপদে গানটি সম্পূর্ণ গাইবার পর গানের বাটে বিভিন্ন ছন্দ দেখানো হয়, গানের বিভিন্ন অংশ (কলি) নিয়ে বিভিন্ন সুরে গেয়ে উপজ করা হয়। খেয়াল গানে বিস্তার, সরগম, বোলতান এবং বিভিন্ন প্রকার তান প্রয়োগ করা হয়। এই গানে গমক-এর প্রয়োগ খুবই কম দেখা যায়। তান প্রয়োগ, গিটকিরির ব্যবহার এতে বেশি।

খেয়াল গানের ভাষার দিক থেকে বলা যায়, হিন্দী, গ্রাম্য হিন্দী, পাঞ্জাবী ও উর্দু মিশ্রিত ভাষায় খেয়াল রচিত হয়েছে। এই বাংলাদেশে বাংলা ভাষাতেও খেয়াল রচিত হয়েছে। রাধিকামোহন গোস্বামী, অঘোর চক্রবর্তী বাংলা খেয়াল গেয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দও বাংলা খেয়াল গাইতেন বলে জানা যায়। দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়-ও বাংলা খেয়াল প্রচলনের প্রচেষ্টা করেছিলেন।[১] ইদানীং কালেও এ-দিক থেকে কিছু প্রচেষ্টা লক্ষ করা যাচ্ছে। অবশ্য ভাষাটা খুব বড় কথা নয়—গানের প্রকৃতি তার গায়ন-পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত।

খেয়াল গান আবার দ্রুত, মধ্য এবং বিলম্বিত—এই তিন লয়ে গাওয়া বিলম্বিত খেয়ালকেই প্রকৃতপক্ষে খেয়াল গানের প্রাণ বলা যায়। তবে দ্রুত লয়ে এবং দ্রুত তান সহযোগেও খেয়াল গাওয়া হয়ে থাকে।

বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ের খেয়াল ছাড়াও নানা ভাবে খেয়াল গানে বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা হয়েছে। তার ফলে কয়েক ধরনের গীতি-রীতি প্রচলিত হয়েছে।

খেয়ালের অন্তর্ভুক্ত এই রীতিগুলির মধ্যে একটা হচ্ছে 'তরাণা' বা 'তেলেনা'। নাদের দের দানি দ্রিম তানা আলা দুম তোম নোম্ প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করে রাগ ও তাল যোগে গান করাকে তরাণা বলে। রাগের আলাপে এবং তরাণায় ব্যবহৃত শব্দগুলি সম্পূর্ণ অর্থহীন। কিন্তু তাদের গঠন ছন্দ অনুযায়ী। সুর ছন্দ ও লয়ের বাহন হিসেবেই এগুলির ব্যবহার চলে আসছে। যন্ত্রসঙ্গীতে যেমন ভাষার পরিবর্তে বোলের মাধ্যমে স্বরগুলি সুন্দর ধ্বনিত হয়, কণ্ঠেও ঐরূপ বোলের মতো তরাণার বাণী ধ্বনিত হয়। অনেকে মনে করেন যে, গানের সুরমাধুর্য উপভোগের পক্ষে ভাষা অন্তরায়। তরাণায় সেই অন্তরায়

১। রবীন্দ্রনাথ রায়, 'রাগ-নির্ণয়', কলিকাতা (১৩৫৬), ভূমিকা।

অপসারিত হয়। এই গানে শব্দঝংকার এবং সুরমাধুর্যই শ্রোতার কাছে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

'ত্রিবট'-ও খেয়াল অঙ্গের এক প্রকার গান। এতে থাকে তিনটি তুক। এই তিনটির একটিতে গানের কথা (অর্থবোধক শব্দ বা বাক্য), আর-একটিতে তরাণা (নিরর্থক শব্দ) এবং অপরটিতে বাদ্যের বোল, রাগ ও তাল যোগে গীত হয়। এই তিনটি তুকের মধ্যে যে-কোনও একটিতে 'ত্রিবট' শব্দের উল্লেখ থাকে।

'চতুরঙ্গ'ও খেয়ালেরই পর্যায়ভুক্ত। এতে চারটি তুক। এই চারটি তুকের মধ্যে একটিতে বাণী (অর্থবোধক শব্দ বা বাক্য), একটিতে তরাণা (নিরর্থক শব্দ), একটিতে সরগম এবং একটিতে বাদ্যের বোল যথাক্রমে উচ্চারিত হয়। এই গানের প্রথম কলিতে চতুরঙ্গ শব্দটি প্রয়োগ থাকে।

'উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ঘরোয়ানা' অধ্যায়ে ঘরোয়ানা আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন ঘরোয়ানার বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে। গায়নরীতির নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যে বৈশিষ্ট্যগুলি সূচিত হয়েছে, তাও কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, থাকতে পারে না। কারণ, পরিবর্তন বা গতিশীলতাই শিল্পের প্রাণ এবং পরিবর্তন বা গতিশীলতাই বৈচিত্র্য সৃষ্টির সহায়ক।

খেয়াল গান তাল ও মাত্রায় নিবদ্ধ সন্দেহ নেই। কিন্তু বিলম্বিত খেয়ালে নিবদ্ধতার মধ্যেও আলাপের অনিবদ্ধ প্রকৃতি আসতে পারে। আলাপচারী খেয়াল তার উদাহরণ। রহমৎ খাঁ এবং আবদুল করিম খাঁ এই ধরনের খেয়ালের প্রচলন করেন। আব্দুল করিম খেয়ালে 'সরগম'-এর সাহায্যে ছন্দ ও রাগ বিস্তার-এর রীতি চালু করেন।

খেয়ালে আর-একটি নতুনত্ব হচ্ছে কম্পিত স্বরে তান দেওয়া। এই কম্পিত স্বরে তান দেওয়ার ফলে শ্রুতির ব্যবহার স্বভাবতই কমে যায়। প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বর-কম্পন ছিল না, এমন নয়। সেই স্বর-কম্পন ছিল গমকের অঙ্গ এবং পাশাপাশি স্বরের সাহায্যে নেওয়া হত। কিন্তু খেয়াল গানে বর্তমানে কম্পিত স্বরে যখন তান দেওয়া হয় তখন মূল স্বরই কাঁপে। তার ফলেই পাশাপাশি স্বরের শ্রুতির ব্যবহার সম্ভব হয় না।

ভারতীয় সঙ্গীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, গায়ক শুধু যান্ত্রিকভাবে গানের আবৃত্তি করেন না—গায়ক সর্বত্রই রচয়িতা। অপরের রচনায় বিস্তার ও তার পরিবর্তনের অধিকার তাঁর থাকে। শুধু রাগ-সঙ্গীত নয়, কীর্তনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় কীর্তনীয়ারা আখর দিয়ে কীর্তনের ভাব ও ভাবার বিস্তার করে থাকেন। এই স্বাধীনতার জন্যেই যেমন ভারতীয় সঙ্গীতের আকর্ষণ বেড়েছে, তেমনি এই স্বাধীনতাই নানা ঘরাণার সৃষ্টি করেছে।

গানের স্বরলিপিতে গানের কাঠামোটিকে ধরা যায় সত্যি, কিন্তু গানের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা গায়কের যে গায়কীর ওপরে নির্ভর করে, তাকে যথাযথভাবে ধরে রাখা কঠিন। অথচ বিশিষ্ট গায়ন-রীতি থেকেই নতুনের পথ মুক্ত হয়েছে বার বার।

নবম অধ্যায়

টপ্পা গান

প্রকৃষ্টরূপে নিবদ্ধ সঙ্গীত 'প্রবন্ধ গান' এবং শাস্ত্রীয় কানুনের ঐতিহ্যে মহিমান্বিত 'ধ্রুপদ গান'। এর পর 'খেয়াল' গানের সৃষ্টিতে যেন বাঁধন-ছেঁড়ার একটা প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। 'টপ্পা' গান ঐ প্রবণতাকে মুক্তির আলো দেখালো। অবশ্য 'টপ্পা' গানের স্বভাবেও স্বাধীনভাবে চলার ছন্দ থাকাই স্বাভাবিক, কারণ এ গানের উৎস একপ্রকার আঞ্চলিক লোক-প্রচলিত সঙ্গীত। আদিতে 'টপ্পা' ছিল পাঞ্জাবের উটচালকদের গান। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে শোরী মিঞা ঐ গানকে সংস্কৃত করে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শ্রেণীভুক্ত করেন। তাঁর সঙ্গীত-ভাবনার প্রয়োগ-নৈপুণ্যে 'টপ্পা' একটি সঙ্গীত-রীতিতে পরিণত হয়।

রাধামোহন সেন প্রথম বাংলা পদ্যে সঙ্গীত শাস্ত্রগ্রন্থ 'সঙ্গীত তরঙ্গ' (সম্ভবত ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে) রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে টপ্পা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

"পাঞ্জাব হইতে হইল টপ্পার জনম।
দুই চরণের মধ্যে তাহার নিয়ম।"

টপ্পা গান সম্পর্কে ক্যাপটেন উইলার্ড বলেছেন, "টপ্পা রীতির গান পাঞ্জাবের উটচালকদের জাতীয় সঙ্গীত ছিল। প্রসিদ্ধ গায়ক শোরী মিঞা তাকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করেছেন।"

পাঞ্জাবে টপ্পা গানের উৎপত্তি সম্বন্ধে রাজ্যেশ্বর মিত্রের 'মুঘল ভারতের সঙ্গীত

তিহ্যা' গ্রন্থে পাওয়া যায়, 'ডপা (টপ্পা) পাঞ্জাবেই বেশির ভাগ গাওয়া হয়। এই দেশের ভাষাতেই রচিত হয়।

উপরের উক্তিগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে টপ্পা গান প্রথম অবস্থায় পাঞ্জাবের লোকসঙ্গীত ছিল। একটি বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গীত এই টপ্পা পরিবর্তন এবং পরিমার্জনের পথ ধরে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি রীতিতে উন্নত হয়। এ গান প্রেম-সঙ্গীতের পর্যায়েই পড়ে এবং আদিতে লঘু অঙ্গেই এ গান গাওয়া হত।

'টপ্পা' একটি হিন্দী শব্দ। এর প্রকৃত অর্থ 'লম্ফ' (অর্থাৎ লাফ)। এর থেকে রূঢ়ার্থ 'সংক্ষেপ'। উটচালকদের গানে লাফিয়ে চলার ছন্দ অবশ্যই থাকবে। আর 'সংক্ষেপ' শব্দটি এ-গানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কারণ ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের অবয়ব ও বিন্যাসের বিস্তৃতি টপ্পা গানে নেই। টপ্পা গান সংক্ষিপ্ত। এর বিন্যাস-প্রকৃতিও সংক্ষিপ্ত এবং সরল। সেই কারণে সহজ এবং লঘু-ভাবোদ্দীপক রাগগুলি, বিশেষ করে খাম্বাজ, কাফী এবং ভৈরবী ঠাটের রাগগুলি টপ্পা গানের প্রধান অবলম্বন।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি বিশেষ রীতির নাম 'টপ্পা'। ঠিক কোন সময় এই গান তার পূর্ণ রূপ লাভ করে তা বলা কঠিন। তবে, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে কোনও-এক সময়ে এটি ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিল্লী ও আগ্রা ছিল পাঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে এবং সেই সময় সাধারণ লোকের কণ্ঠে ধ্বনিত হত টপ্পা গানের বিষয়বস্তু ও মানব-মানবীর প্রেম-বিরহের কাহিনী।

টপ্পা রীতির বৈশিষ্ট্য হল এই গানের সংযোজনায় ও চলনে দ্রুততান প্রয়োগে। টপ্পার তান সাঙ্গীতিক অলঙ্কার 'জমজমা' শ্রেণীতে পড়ে। টপ্পার তান দ্রুত অথচ স্তবকে সূক্ষ্ম গিটকারী সহযোগে গড়িয়ে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হয়। এই তানের কাজ প্রধানত অবরোহণ ক্রমিক। তানের ফাঁকে ফাঁকে গানের কথাকে সাজিয়ে ভাবের মায়া সৃষ্টি করা হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, এ গানের আদিরূপ ছড়িয়ে ছিল পাঞ্জাবের উটচালকদের মধ্যে এবং সেই কারণে ('টপ্পা' শব্দের অর্থও সেরূপ সঙ্কেত দেয়) টপ্পা গানের তালে বৈপরীত্যের চাল—এটা এ গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গানের বন্দীশ-এ আড়-কুয়াড় ছন্দ সাবলীলভাবেই বাঁধা থাকে। তাই প্রধানত পাঞ্জাবী ঠেকা, মধ্যমান প্রভৃতি তালেই টপ্পা গাওয়া হয়। তালের যেখানে ঝোঁক, তার আগে বা পরে ঝোঁক ফেলার একটা প্রবণতা সব সময়ই লক্ষ্য করা যায় টপ্পা গানে। স্তবকে জড়ানো গিটকারীর বর্ণ-বন্ধন দ্বারা গানের কথার মালা-গাঁথা, আগাগোড়া তালের কঠিন ছন্দে নান্দনিক রসস্ফূর্তি ঘটানো—টপ্পা গানের এই যে বৈশিষ্ট্য তা আয়ত্ত করা অত্যন্ত কঠিন।

শোরী মিঞার টপ্পা

টপ্পা গানকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত হিসাবে উন্নীত করেছিলেন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শোরী মিঞা। তিনি পাঞ্জাবী উপভাষার টপ্পা গান রচনা করলেও প্রকৃতপক্ষে শোরী মিঞা ছিলেন অযোধ্যার লোক। তাঁর আসল নাম ছিল গোলাম নবী। তিনি তাঁর স্ত্রী বা প্রণয়িনী শোরীর নামে ভণিতা দিয়ে গান গাইতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে শোরী মিঞা টপ্পা রচয়িতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। লক্ষ্ণৌ নগরে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

শোরী মিঞার গানের বিষয়বস্তু পার্থিব মানুষের প্রেম-বিরহের কাহিনী। তাঁর গানগুলি কোনও নায়িকার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। গানের ভাষা ভাবাবেগপূর্ণ—এগুলির কাব্যমূল্যও অস্বীকার করা যায় না। খাম্বাজ, লুম, ভৈরবী, সিন্ধু, ঝিঁঝোটি প্রভৃতি রাগে এবং প্রধানত মধ্যমান তালে শোরী মিঞার টপ্পা গান শোনা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলা গানের উপর টপ্পা রীতির প্রভাব পড়ে বিশেষভাবে। এই প্রভাব বাংলা গানের স্বভাবের মোড় ফেরায়। শোরী মিঞার টপ্পা গান বাংলার প্রতিভাধর সঙ্গীতজ্ঞ রামনিধি গুপ্তকে (নিধুবাবু) সুর রচনায় প্রভাবিত করে। বিখ্যাত গায়ক রসুল বক্স বলেছেন, 'ভাবার দিকে নজর না দিলে নিধুবাবুর টপ্পা আর শোরী মিঞার টপ্পায় কোনও পার্থক্য নাই।' এই উক্তি রামনিধি গুপ্তের সঙ্গীতে শোরী মিঞার টপ্পা গানের প্রভাবের যাথার্থ্য প্রমাণ করে। তবে শোরীর টপ্পার সঙ্গে রামনিধি গুপ্তের টপ্পার যে শুধুমাত্র ভাবাগত পার্থক্য রয়েছে, একথা ঠিক নয়। কারণ, রামনিধি গুপ্তের বাংলা টপ্পা গানের প্রকৃতিও কিছুটা স্বতন্ত্র। বাংলা ভাষার ভাব ও প্রকৃতির স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য তিনি বাংলা টপ্পার ক্ষেত্রে শোরীর টপ্পা রীতির অলংকরণ পদ্ধতিতে কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে নিয়েছেন। বাংলা গানের ক্ষেত্রে এ এক নতুন সৃষ্টি।

নিধুবাবু ও তাঁর টপ্পা

১৭৪১ খ্রিস্টাব্দে ত্রিবেণীর কাছে চাঁপতা গ্রামে রামনিধি গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। নিধুবাবু নামেই তিনি বিখ্যাত। তাঁর পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। শৈশবের পাঠ শেষ হলে নিধুবাবুর পিতা তাঁকে কলিকাতায় জনৈক পাদ্রির কাছে ইংরেজি পড়ান।

২২ বছর বয়সে বিবাহ করে তিনি ছাপরা জেলার কালেক্টরিতে কেরানির কাজ নিয়ে চলে যান। সেখানেই তাঁর সঙ্গীতজ্ঞের জীবন শুরু হয়। এক হিন্দুস্থানী ওস্তাদের কাছে নিধুবাবু সঙ্গীতের তালিম নিতে থাকেন, বিশেষ করে টপ্পা রীতির গানে। শিক্ষান্তে তিনি নিজেই বাংলা ভাষার গান রচনা করে টপ্পা রীতিতে গাইতে আরম্ভ করেন এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

নিধুবাবুর বাংলা টপ্পায় তানের গতি কিছুটা কমে আসে। মোটা দানার তিন-থাক-তান-এর অলঙ্কার তাঁর গানের বৈশিষ্ট্য। শোরী মিঞার টপ্পার তানের ক্ষিপ্রতা এখানে কিছুটা কম। এটা গানের কাব্য-মূল্য বজায় রাখার তাগিদেই ঘটেছে বলে মনে হয়। সে জন্য পূর্বে যে টপ্পা-রীতিকে শুধুমাত্র শৃঙ্গাররসাত্মক গানের উপযোগী বলে ধারণা পোষণ করা হত তা নিধুবাবুর গানের ক্ষেত্রে বা বাংলা গানের ক্ষেত্রে আর প্রযোজ্য রইল না। কারণ প্রেম-সঙ্গীত ছাড়া নিধুবাবু টপ্পা-রীতির ব্রহ্ম সঙ্গীতও রচনা করেন। ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের নির্দেশে তিনি 'পরমব্রহ্ম-তৎপরাৎপর পরমেশ্বর'—এই ব্রহ্ম সঙ্গীতটি রচনা করেন টপ্পার ছাঁচে। তাঁর 'নানান দেশের নানান ভাষা'-ও টপ্পার রীতিতে অন্য রসের একটি জনপ্রিয় গান। পরবর্তীকালে ব্রহ্ম-সঙ্গীতেও টপ্পা-রীতির প্রভাব দেখা যায়।

১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। চির-বিদায় নেবার কিছুদিন আগে তাঁর রচিত প্রচলিত কিছু গান 'গীতরত্ন' নামে এক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। নিধুবাবুর আবির্ভাব কালে বাংলা সাহিত্যে মঙ্গল কাব্যের যুগ চলছে—সাহিত্যের আসর আলো করে ভারতচন্দ্র বিরাজ করছেন। ঐ সময়ে জন্ম নিয়েও বাংলা সঙ্গীতের ভাষা ও রীতির ক্ষেত্রে রামনিধি গুপ্ত হলেন নব-দিগন্তের দিশারী।

'এক কথায় বলা যায় তাঁর সরস বাচন ভঙ্গি ও রচনা দক্ষতার টপ্পার ইতিহাসে তিনি অদ্বিতীয়।'—('ভারতীয় সঙ্গীতের কথা', প্রভাত কুমার গোস্বামী)

শ্রীধর কথক ও কালী মীর্জা

বাংলা টপ্পা গানের ব্যাপক প্রচার করেন শ্রীধর কথক, যাঁর বেশি যোগাযোগ ছিল কবি ও পাঁচালী দলের সঙ্গে। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ায় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। কথকতা ছিল তার বংশগত পেশা। কারণ, তাঁর পিতামহ লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ একজন প্রখ্যাত কথক ছিলেন। কথকতার জন্য শ্রীধর কথক নানা ভাবে, নানা সুরে গান রচনা করতেন।

যৌবনে তিনি কবি ও পাঁচালীর দলে গান গাইতেন। কিন্তু এই কাজে তাঁর অভিভাবকদের মত ছিল না। তাই এই কাজ তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। এর পর ব্যবসা করার চেষ্টায় মুর্শিদাবাদ যান। কিন্তু সে কাজে সাফল্য না আসায় সঙ্গীতসাধনায় মনোনিবেশ করেন।

শ্রীধর বহু ভাষাবিদ ছিলেন। বাংলা ভাষায় তো বটেই, হিন্দী, আরবী, ফরাসী ভাষাতেও তিনি টপ্পা রচনা করেছিলেন। 'যাবত জীবন রবে আমি আর কারেও ভালোবাসিব না'—তাঁর রচিত একটি জনপ্রিয় টপ্পা গান। বাংলা গানের রীতির ক্ষেত্রে তিনি রামনিধি গুপ্তের (নিধুবাবু) অনুসরণকারী।

বাংলা টপ্পা-রীতির পুরোধা রামনিধি গুপ্তের অন্যতম উত্তরসূরি কালী

মীর্জা। তাঁর বংশপরিচয় এবং নাম ইত্যাদি নিয়ে মতানৈক্য বর্তমান। সম্ভবত তাঁর আসল নাম ছিল 'কালীদাস'। 'বঙ্গের কবিতা' নামক পুস্তকে এবং নবীন নিয়ের অভিধানে বলা হয়েছে যে কালী মীর্জার পদবী ছিল 'চট্টোপাধ্যায়'। আবার, বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'সঙ্গীতসার সংগ্রহ' গ্রন্থে তাঁর পদবী 'মুখোপাধ্যায়' বলা হয়েছে। সম্ভবত তিনি 'চট্টোপাধ্যায়' বংশীয়ই ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল বিজয়রাম চট্টোপাধ্যায়। আনুমানিক ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া গ্রামে কালী মীর্জা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা ভালভাবেই জানতেন।

অল্পবয়স থেকেই সঙ্গীতের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। সুরের পিপাসা মেটাতে তিনি সারা ভারতের সঙ্গীতের পীঠস্থানগুলিতে ভ্রমণ করেন। কাশী, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান ঘুরে ঘুরে তিনি সঙ্গীতশিক্ষা করেন। কালী মীর্জা পশ্চিমে গিয়ে শুধু হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতই শিক্ষা করেননি, ঐ অঞ্চলের পোশাক এবং আদব-কায়দাও গ্রহণ করেছিলেন। ফলে তিনি বাংলায় ফিরে এলে তাঁর পৃষ্ঠপোষকরা তাঁকে 'মীর্জা' উপাধি দেন। তিনি সঙ্গীতের ঔপপত্তিক এবং ক্রিয়াসিদ্ধ উভয় বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন। সঙ্গীত-রচনার ক্ষেত্রে তিনি টপ্পারীতিকেই অনুসরণ করেন। 'যদি ভবনদী পার হতে থাকে বাসনা'—এই গানটি কালী মীর্জার রচিত অন্যতম জনপ্রিয় টপ্পা গান। নিধুবাবু প্রবর্তিত বাংলা টপ্পা-রীতির ধারা প্রবহমান রাখতে যাঁরা সহায়তা করেন, কালী মীর্জা তাঁদের অন্যতম।

দশম অধ্যায়

ঠুংরী

ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পার মতো ঠুংরীও একটি বিশিষ্ট ধারার নাম। প্রথমাবস্থায় 'ঠুংরী' গান বাঈজী সমাজের উপজীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল। তাঁরা নাচের সঙ্গে এই গান গাইতেন। ঐ নাচের ভঙ্গি প্রকাশের নাম ছিল 'ভাও'। কিন্তু সে গান উন্নত মানের ছিল না। বিবর্তনের পথ ধরে ঠুংরী গান ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি রীতিতে উন্নীত হয়। প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্ণৌ-এর নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ্-র সক্রিয় সাধনা ও প্রচেষ্টায় এ-কাজ সম্ভব হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। এই রীতিতে নায়িকার ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। ঐকান্তিক প্রেমের অভিব্যক্তি ঠুংরী গানের বিষয়বস্তু। ঠুংরী রীতির গানে গায়ক-গায়িকার ব্যক্তিগত ভাবাবেগ প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে। ভাবের স্বাধীন অভিব্যক্তি ঘটাতে শিল্পী রাগবিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে কথার নির্বাচনে স্বরগুচ্ছের নির্বাচনে নিজের সৃষ্টিশীল ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন, আর ঠুংরী রীতির আঙ্গিকের এটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী 'সঙ্গীতসার' গ্রন্থে লিখেছেন, 'ঠুংরী অতি ক্ষুদ্র রাগে এবং ক্ষুদ্র তালে রচিত হইয়া থাকে, ইহার সুপারিপাট্য এমন মধুর যে, অতি শীঘ্রই লোকের চিত্ত হরণ করে।' আবার কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থে লিখেছেন, 'যে সকল গান টপ্পার রাগিণীতে এবং আধাকাওয়ালী ও ঠুংরী তালে গাওয়া হয় তাকে ঠুংরী বলে।' ঠুংরী গানের সৃষ্টি সম্পর্কে

'গীত উপক্রমণিকা' গ্রন্থে মানিকলাল সেন শর্মা লিখেছেন, 'লক্ষ্ণৌ নগরে ঠুমরী গানের সৃষ্টি হয়েছে। লক্ষ্ণৌ-র নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ প্রথমে ঠুমরী গানের সৃষ্টি করেন এবং সনদ ও কদর নামে দুইজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ইহাকে নানাভাবে বিস্তৃত করেন। এই তিন জনই ঠুমরী গায়ক ও গীত-রচয়িতা ছিলেন।' কিন্তু ঠুংরী গানের প্রবর্তক হিসাবে ওয়াজেদ আলি শাহ-র নাম নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য বর্তমান। কারণ ওয়াজেদ আলি শাহ-র পূর্বেও ঠুংরী গান ছিল বলে জানা যায়।

অনেকে মনে করেন যে, ঠুংরী শব্দটির সঙ্গে নৃত্যের সম্পর্ক আছে, নাচের ঠমক থেকে ঠুম্‌রী বা ঠুংরী শব্দটি এসেছে। এক সময় উত্তর ভারতে এক শ্রেণীর বাঈজীরা নৃত্য সহযোগে দাঁড়িয়ে গান করত। ঐ গানকে 'খাড়ী ঠুমরী' বলা হত। ঐ 'খাড়ী ঠুমরী'-ই সম্ভবত পরবর্তীকালে 'ঠুমরী'-তে রূপান্তরিত হয়ে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি গায়ন রীতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। ওস্তাদি বা ক্লাসিকাল ঠুংরীকে বলা হয় 'বড়ী ঠুংরী' এবং বাঈজীদের ঠুংরীকে বলা হয় 'ছোটি ঠুংরী'।

এক প্রকার সঙ্গীত রীতির নাম ঠুংরী। ঠুংরী দুই তুক বিশিষ্ট গান—স্থায়ী এবং অন্তরা। ঠুংরী লঘু-চালের গান। ধ্রুপদ বা খেয়াল গানের মতো রাগের শুদ্ধতা রক্ষার কোনও নিয়ম এ গানে নেই। কোনও একটি রাগকে অবলম্বন করে সেই রাগের সমধর্মী একাধিক রাগে স্বরবিন্যাস করার স্বাধীনতা এ গানে আছে। নানা রকম অলংকারের দ্বারা সঙ্গীতের নান্দনিক রস সঞ্চার করাই এ গানের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাধাকৃষ্ণ লীলাকাহিনী ছাড়াও পার্থিব মানব-মানবীর সাধারণ আশা-আকাংক্ষার রূপকে রাগরাগিণীর ইন্দ্রজালের মাধ্যমে মায়াময় করে তোলাই ঠুংরী গানের ধর্ম। এ গানে গমক সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মীড়, মূর্চ্ছনা, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তান কৃন্তন প্রভৃতি অলংকার ঠুংরী গানে বৈশিষ্ট্য আনে। ঠুংরী গানে একই কলিতে দুই-তিন রাগের সংযোগ ঘটে কিন্তু প্রয়োগ-কৌশলের গুণে তা অসঙ্গত শোনায় না। 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থে ঠুংরী সম্বন্ধে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাই লিখেছেন, 'এতে সচরাচর খাম্বাজের সঙ্গে ভৈরবী কিংবা সিন্ধু, কিংবা পিলু, কিংবা জুম, কিংবা বেহাগ, এই ধরণের সংযোগ দেখা যায়। ঐ ভৈরবীর অংশ এমন সব জায়গায় প্রয়োগ করা হয় যে খাম্বাজের ঠাটেই ভৈরবী কোমল ঠাট পাওয়া যায়।' খরজ পরিবর্তন দ্বারাও ঠুংরী গানে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়।

ঠুংরী রীতির গানের সৃষ্টিকাল নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ গানের প্রচলন হয়। সে সময় রাজা এবং জমিদারেরা সঙ্গীত, নৃত্য সহ অন্যান্য লঘু-শিল্প কর্মের পৃষ্ঠপোষণা করতেন। তাঁদের আমোদ-স্ফূর্তির খোরাক হিসাবে ঠুংরী গান হয়তো মন-পছন্দ বিষয় হিসাবে সমাদর লাভ করে, যার ফলে ওই সময় এ গান বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়।

প্রথমে ঠুংরী ছিল 'খাড়ী' অর্থাৎ বাঈজিরা দাঁড়িয়ে নৃত্য করার সময় পায়ের

ঠমক-এর সঙ্গে যে গান পরিবেশন করত সেই গান। কিন্তু পরবর্তীকালে বিবর্তনের পথে এ গানের চরিত্র বদলে যায়। ঠুংরী গান স্থান করে নেয় ওস্তাদ মহলে। খেয়াল গানের পরেই ওস্তাদরা ঠুংরী গাইতে থাকেন। পরবর্তিত রূপে ঠুংরীর লয় হয় বিলম্বিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে ঠুংরী গান এই চেহারা নেয়। গানের কবিতার এক-একটি অংশকে নিয়ে রাগ-রাগিণীর বিচিত্র স্বর-বিন্যাসের দ্বারা রচনার ভাব প্রকাশ এ গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। ওস্তাদেরা একে বলেন 'বোল বানানা'। কিছুক্ষণ বিস্তারের পর লয় বাড়িয়ে ব্যগ্রতার প্রাবল্য প্রকাশ করা হয়। ঠুংরীতে সরগম করার রীতি নেই। বর্তমানেও এইভাবেই ঠুংরী গাওয়া হয়। তবে ওয়াজেদ আলি শাহ-র সময়েও (অর্থাৎ যখন গায়করা প্রথম বসে ঠুংরী গাইতে শুরু করেন) বিলম্বিত লয়ে ঠুংরী গাওয়ার প্রচলন হয়নি। বসে ঠুংরী গাওয়ার রীতির শুরু সম্পর্কে শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন, 'গায়কদের মধ্যে এ ঢং-এর চলন হয়েছে অনেক পরে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—গণপৎ রাও (কদর পিয়া) ও মৈজুদ্দীনের চেষ্টায় এবং উৎসাহে।'

উনবিংশ শতাব্দীতে ধ্রুপদ ও খেয়ালের ঘরাণার মতো ঠুংরী গানেরও বিভিন্ন আঞ্চলিক রীতি গড়ে ওঠে। যেমন—বারাণসী বা বেনারসী ঠুংরী (ঘরাণা), লক্ষ্ণৌ ঠুংরী, পাঞ্জাবী ঠুংরী প্রভৃতি। বেনারসী ঠুংরী রীতির প্রবর্তকের নাম অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। মৈজুদ্দীন খাঁ-কে বেনারসী ঠুংরীর প্রধান প্রচারক বলা হয়। এই ঘরাণার ঠুংরী খেয়াল অংগে গাওয়া হয়—এর গতি অপেক্ষাকৃত ধীর, প্রকৃতি গম্ভীর এবং এতে চাপল্যের কোনও অবকাশ নেই। এই ঘরাণার ঠুংরীতে স্বরের ব্যবহারে প্রত্যেক স্বরের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা হয় এবং অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে রাগ-মিশ্রণ ঘটানো হয়।

অনেকে মনে করেন লক্ষ্ণৌ ঠুংরী রীতির প্রবর্তক নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ। এই ঘরাণার ঠুংরীর গতি কিছুটা দ্রুত এবং এর প্রকৃতি কিছুটা চপল। লক্ষ্ণৌ রীতির ঠুংরীতে স্বরের মৌলিকত্বের প্রাধান্য দেওয়া অপেক্ষা স্বরসমন্বয়ের আলংকারিক প্রয়োগ-নৈপুণ্যের দিকেই বেশি জোর দেওয়া হয়। গিটকারী, মুরকী, কৃন্তন প্রভৃতি অলংকার এ গানের বৈশিষ্ট্য আনে।

পাঞ্জাবী ঠুংরী লক্ষ্ণৌ ঠুংরীর মতোই, কিন্তু এতে গ্রাম্যগীতের বিশিষ্ট কতকগুলি অলংকারের প্রয়োগ দেখা যায়। অসমধর্মী স্বরগুলির মধ্যে পারম্পর্য রক্ষা করাই এই ঘরাণার গানের বৈশিষ্ট্য।

এক শ্রেণীর ঠুংরীকে 'লচাও ঠুংরী' বলা হয়। 'লচনা' একটি হিন্দী শব্দ। এর অর্থ বিনম্র হওয়া বা নমিত হওয়া। ঐ শব্দ থেকেই 'লচাও' শব্দটি এসেছে। লচাও ঠুংরীতে নায়িকার আত্মনিবেদনের ভাবটি পরিস্ফুট হয়। সেই কারণে এই গানের গতি খুব ধীর। লচাও ঠুংরীতে মীড়ের কাজ বেশি।

ঠুংরী গান সাধারণত আদ্ধা কাওয়ালী, যৎ প্রভৃতি তালে গাওয়া হয়। আবার 'ঠুংরী' একটি তালের নাম হিসাবেও পূর্বে প্রচলিত ছিল। ক্ষেত্রমোহন

গোস্বামীর 'সঙ্গীতসার' গ্রন্থে পাওয়া যায়, 'ঠুংরী চারি মাত্রার তাল।' কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থেও আমরা 'ঠুংরী তাল'-এর নাম পাই। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের 'ত্রোটক' (১৬ মাত্রা বিশিষ্ট) ছন্দের অনুসরণ ঠুংরীতে দেখা যায়। অগ্রজ গোবিন্দচন্দ্র রায়ের বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'কতকাল রবে বল ভারত রে' গানটি ওয়াজেদ আলি শাহ-র বিখ্যাত ঠুংরী 'বাবুল মোরা নৈহর ছুটো হি যায়' 'দব ছোড় চলি লক্ষ্ণৌ নগরী' ঠুংরীর অনুকরণে 'তোটক' ছন্দের বিন্যাসে সাজানো হয়েছিল।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী 'সঙ্গীতসার' গ্রন্থে শোরীমিঞাকে 'ঠুংরী গানের সৃষ্টি-কর্তা' বলে অভিহিত করলেও অনেকেই এই মত স্বীকার করেন না। কারণ শোরীর টপ্পা থেকে ঠুংরী রীতি অনেক পৃথক। তবে টপ্পা রীতি ঠুংরী উদ্ভাবনের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল, এটা হতে পারে।

লক্ষ্ণৌ রীতির ঠুংরী গানের প্রবর্তক নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যা রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজধানী ছিল লক্ষ্ণৌ। ১৭১৯ থেকে ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে (মহম্মদ শাহের পর) দিল্লীতে মোগল সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যর্থতার ফলে স্বাধীন নৃপতিরা মাথা তোলেন। ওয়াজেদ আলিও স্বাধীনভাবে রাজ্য চালাতেন। তাঁর লক্ষ্ণৌর দরবার দিল্লীর দরবারের মতোই উন্নত ছিল। তাঁর নবাব আসফদৌল্লা এই কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি তানসেন বংশীয় গায়ক ও বীণকারদের নিয়ে আসেন।

তৎকালীন বিখ্যাত তিন জন ধ্রুপদ গায়ক ও রবাব বাদক (তিন ভাই) জাফর খাঁ, প্যারে খাঁ ও বসৎ খাঁ তখন শীর্ষস্থানে অবস্থান করছেন। তাঁরা ছিলেন বিলাস খাঁ-র বংশধর। এই তিন ভাইকেই ওয়াজেদ আলি শাহ লক্ষ্ণৌ-এর দরবারে স্থান দেন। সদারঙ্গের বংশধর ওমরাহ খাঁ, বীণকার গোলাম মহম্মদ খাঁ, কাওয়াল ঘরের বিশিষ্ট খেয়াল-গায়কগণ এবং বৃন্দাদীনের পিতা, বৃন্দাদীন এবং তাঁর ভ্রাতা কালিকা প্রমুখ নৃত্যশিল্পী তাঁর দরবারে ছিলেন।

লর্ড ডালহৌসি কুশাসনের অভিযোগ এনে ওয়াজেদ আলিকে রাজ্যচ্যুত করেন এবং ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়ে কলকাতার উপ-কণ্ঠে মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত করেন। শোনা যায় লক্ষ্ণৌ দরবারের কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞও মেটিয়াবুরুজে এসেছিলেন নবাবের সঙ্গে। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

কলকাতায় নির্বাসিত হওয়ার দু-বছর পরে ওয়াজেদ আলি এখানেও দরবার বসান। ঐ দরবার সুদীর্ঘ ৩০ বছর ধরে চলেছিল। এই দীর্ঘ সময়ে বহু ওস্তাদ এবং সঙ্গীতজ্ঞ তাঁর দরবারে এসে অবস্থান করেছেন। এঁদের মধ্যে গোয়ালিয়রের আলিবক্স (ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল), গোয়ালিয়রের তাজ খাঁ (ধ্রুপদ), লক্ষ্ণৌ-এর আহম্মদ খাঁ (টপ্পা ও খেয়াল), বসৎ খাঁ (ধ্রুপদী ও রবাবী), মুরাদ আলি খাঁ (ধ্রুপদ), কাশিম আলি খাঁ (রবাবী), লক্ষ্ণৌ-এর ছোট মিঞা (খেয়াল), লক্ষ্ণৌ-এর ছোট বিবি (ছোট মিঞার পত্নী—তবলা

বাদিকা), বাবু খাঁ (ছোট মিঞার পুত্র, তবলিয়া), কাল্কা দীন ও বিন্দাদীন (কথক নৃত্যবিদ), প্যারে খাঁ (সানাইবাদক), নান্নে খাঁ (তবলিয়া), নিসারালি খাঁ (পাখোয়াজ বাদক), পাঞ্জাবের মুবারক আলি খাঁ (ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক), রামপুরের সাদিক আলি খাঁ (ধ্রুপদী) প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞগণ। বিখ্যাত বাঙালি সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে অনেকে ওয়াজেদ আলির দরবারে সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। যদুভট্ট, কেশবচন্দ্র মিত্র (পাখোয়াজী), কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (সেতার, সুরবাহার ও ন্যাসতরঙ্গ) বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (খেয়াল) প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞরা মেটিয়াবুরুজের দরবারে সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

কলকাতার সঙ্গীতচর্চার মান উন্নত করতে ওয়াজেদ আলি শাহ-র দরবারের বহু বহু শিল্পী পরবর্তীকালে যশস্বী হয়েছিলেন এবং তাঁদের অনেকের ধারা আজও প্রবহমান।

নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ একজন সুগায়ক ছিলেন। তিনি ৬৪টি গ্রন্থ রচনা করেন। 'আখতার' ছদ্মনামে তিনি বই লিখতেন। 'হুজন-ই-আখতার' গ্রন্থটি তাঁর আত্মজীবনী। ওয়াজেদ আলি অনেক বিখ্যাত ঠুংরী গানের রচয়িতা। তাঁর রচিত 'বাবুল মোরা নৈহারা ছুট যায়,' 'নীর ভরণ ক্যায়সে যাউ', 'যব ছোড় চল লক্ষ্ণৌ নগরী' প্রভৃতি গান বিশেষ সুপরিচিত। তাঁর রচিত গানগুলি ভৈরবী, খাম্বাজ, দেশ, কাফী, পিলু প্রভৃতি রাগে এবং দীপচন্দী যৎ, কাহারবা, দাদরা প্রভৃতি তালে গাওয়া হত। এই সময় গজল এবং টপ্পারও বিশেষ প্রচলন ছিল।

একাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা

রাজনৈতিক প্রয়োজনে বাংলাদেশ আজ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে বিভক্ত। শুধু আজকের এই বিভাগ নয়, গুপ্ত যুগ (চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী) থেকে শুরু করে বার বার বাংলাদেশের সীমা এবং নাম পরিবর্তিত হয়েছে। রাজা শশাঙ্কের সময় থেকে গৌড় নামটি ব্যাপকভাবে চালু হয়। অবশ্য গৌড় বলতে প্রধানত পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গকেই নির্দেশ করা হত। পাঠান যুগে সমগ্র বাংলা গৌড় নামেই আখ্যাত হয়। মুঘল আমল থেকে 'বাংলা' নাম পাওয়া যায়। ইংরেজরা তাদের শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে বৃহত্তর বঙ্গ থেকে বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম বা কামরূপকে পৃথক করে এবং বঙ্গদেশকে (১৯৪৭-এ) পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব-পাকিস্তান বাংলাদেশ এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ঠিক কোন সময়ে বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম মনুষ্য বসতি আরম্ভ হয় তা ঐতিহাসিকরাও স্থির করতে পারেননি। গঙ্গা নদীর পথ ধরে খ্রিঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী থেকে আর্যরা এদেশে আসতে আরম্ভ করেন এবং খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গভূমির প্রায় সর্বত্র আর্যভাষার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদের শিক্ষা, বিদ্যাচর্চা এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের ভাষা ছিল 'সংস্কৃত' এবং কথ্যভাষা ছিল 'প্রাকৃত'। এই প্রাকৃত ভাষাই পরিবর্তিত হয়ে অপভ্রংশ স্তরের মধ্য দিয়ে অন্যতম আঞ্চলিক ভাষা 'বাংলা'র রূপ গ্রহণ করেছে। এই রূপান্তর ঘটেছিল দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে।

বাংলাভাষা সৃষ্টির পূর্বে বাঙালিরা যে সাহিত্য রচনা করেছিলেন তা হয় 'সংস্কৃত' না হয় 'প্রাকৃত'। বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির জন্মলগ্নে বাঙালির সাহিত্য-মানস উৎসাহিত হয়েছিল উপরোক্ত যে দুটি ভাষায়, তাদের বিভিন্নতা থাকলেও তাদের মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল না। তাই পারস্পরিক পরিপূরকতার প্রভাবে বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা ঐক্য সূচিত হয়েছিল। এই দুই 'বিচিত্র'-এর সঙ্গম-স্থলেই বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি। এই সৃষ্টির প্রেরণার মূলে রয়েছে ধর্ম—এই নতুন সৃষ্টি কলেবর গ্রহণ করেছে সঙ্গীতের এবং তা পরিচিত হয়েছে 'চর্যাপদ' নামে।

'চর্যাপদ'কে বাংলাভাষার প্রাচীনতম গীত বলে পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন। বাংলাভাষা সৃষ্টির পর তার অগ্রগতির পথে সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডার থেকে বহু শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে, তেমনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও বাঙালিরা প্রথম থেকেই প্রাচীন ঐতিহ্যের ওপরই দাঁড়িয়েছেন। বাংলাভাষার এই প্রথম সঙ্গীত প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধ সঙ্গীত। শার্ঙ্গদেব 'সঙ্গীতরত্নাকর' গ্রন্থে বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধ পর্যায়ে চর্যা প্রবন্ধের পরিচয় দিয়েছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে চর্যাপদ শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতবর্ষের অন্যত্রও প্রচলিত ছিল। অবশ্য ভাষার দিক থেকে বাংলার চর্যাপদের সঙ্গে অন্যত্র প্রচলিত চর্যাপদের পার্থক্য থাকতে পারে।

যে চর্যাপদগুলিকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন বলে দাবি করা হয়, সেই ৫০টির মতো পদ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল থেকে সংগ্রহ করেন। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা এই পদগুলি রচনা করেছিলেন। চর্যাগীতি যে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণীতে গাওয়া হত তার প্রমাণ প্রত্যেকটি চর্যার সঙ্গে শাস্ত্রীয় রাগের উল্লেখ আছে। অবশ্য তালের কোনও উল্লেখ নেই।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' প্রবন্ধ সঙ্গীতের গ্রন্থ। জয়দেব নিজেও তাঁর রচনাকে প্রবন্ধ সঙ্গীত বলেছেন:

শ্রীবাসুদেব রতি কেলি কথা সমেত
মেতং করোতি জয়দেব কবিঃ প্রবন্ধম্ ॥

[দ্বিতীয় শ্লোক]

অর্থাৎ—জয়দেব কবি শ্রীবাসুদেব রতিকেলিকথা সম্বলিত এই প্রবন্ধ (গীতগোবিন্দ) রচনা করলেন।

চর্যাপদে রাগগুলির উল্লেখ থাকলেও তালের উল্লেখ নেই, কিন্তু গীতগোবিন্দে রাগের সঙ্গে তালের নামও পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'কে 'সঙ্গীতের দিক থেকে বিচার করলে বোঝা যাবে এই গীতিনাট্য সেই যুগের রচনা যখন দেশে প্রাচীন প্রবন্ধ গায়ন কথঞ্চিৎ শিথিল হয়েছে এবং নব নব রীতির অভ্যুদয় হচ্ছে। এই গীতি প্রবন্ধটি বিপ্রকীর্ণ জাতীয়।'[১] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি পদে বিপ্রকীর্ণ কথাটির পরিবর্তে 'প্রকীর্ণক' কথাটির উল্লেখ আছে। যেমন, তাম্বুল খণ্ডের

১। রাজ্যেশ্বর মিত্র, 'প্রাচীন বাঙলার সঙ্গীত', কলিকাতা (১৩৭১), পৃঃ ৪৯-৫০।

৭ম পদ, যমুনা খণ্ডের ৬ষ্ঠ পদ, রাধাবিরহ খণ্ডের ২৩তম, ৪৭তম, ৫০তম প্রভৃতি পদ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরে যে গান বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে মাতিয়ে তুলেছিল তা হচ্ছে কীর্তন গান। কীর্তনের পদ রচনা পঞ্চদশ শতকে বিদ্যাপতি শুরু করেন। কিন্তু এই কীর্তন গানকে আধ্যাত্ম মার্গে উন্নীত এবং জনপ্রিয় করে তোলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনি ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে অবতীর্ণ হন এবং তাঁর তিরোধান ঘটে ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে। এই ষোড়শ শতকে স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ প্রভৃতি প্রতিভাবান বৈষ্ণবের আবির্ভাব ঘটেছিল। এ'রা হিন্দু এবং মুসলমানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জানতেন। এ'দের মধ্যে অধিকাংশ শুধু গায়কই ছিলেন না, সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞও ছিলেন। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্বামী কৃষ্ণদাস 'গীত প্রকাশ' নামে সঙ্গীতের একখানি প্রামাণ্য পুস্তক রচনা করেন। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে (১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে) নরোত্তম দাস বিলম্বিত ধ্রুপদকে ভিত্তি করে নতুন ধরনের রসকীর্তন বা লীলাকীর্তনের প্রবর্তন করেন।

ধ্রুপদাঙ্গের কীর্তন

চৈতন্যোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা নরোত্তম দাস বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার অন্তর্গত খেতরী গ্রামে এক জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। বৃন্দাবনে লোকনাথ গোস্বামীর কাছে তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং জীব গোস্বামীর কাছে ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা করেন। বৃন্দাবনে সেই সময় ধ্রুপদ সঙ্গীতের ব্যাপক চর্চা ছিল এবং স্বভাবতই নরোত্তম দাস তা ভালভাবে শিক্ষা করেছিলেন। ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্মভূমি খেতরী-তে দশ দিন ব্যাপী এক বিরাট মহোৎসব হয়। এটা খেতরীর মহোৎসব নামে খ্যাত। এই উৎসবে নরোত্তম দাস নতুন ধরনের লীলাকীর্তন করলেন। তাঁর এই পদ্ধতি 'গরাণহাটী'[১] নামে প্রচলিত।

নরোত্তম যে ধ্রুপদাঙ্গের কীর্তনের প্রবর্তন করেন তার বিশদ বিবরণ 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে রয়েছে। এ থেকে আমরা জানতে পারি যে খেতরীর মহোৎসবে গোকুলানন্দ কীর্তন শুরু করেন। তিনি অনিবদ্ধ গীতক্রম আলাপ করেন, অর্থাৎ কেবল বর্ণন্যাস স্বরালাপের দ্বারা গীত শুরু হল :

১। কীর্তনের তিনটি ধারা। নরোত্তম প্রবর্তিত 'গরাণহাটী' ছাড়া অন্য দুটি ধারার নাম মনোহরশাহী এবং রেণেটী। 'মনোহরশাহী'র উদ্ভব হয় বীরভূম জেলার নিকটস্থ মনোহরশাহী পরগণা থেকে। 'রেণেটী' প্রচলিত ছিল ওড়িশায়। এই ধারার প্রচারকর্তা জ্ঞানানন্দ, যাঁকে গৌড়-উৎকল্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর 'গরাণহাটী' নামের উদ্ভব হয় গড়েরহাট বা গরাণহাটী পরগণার নামানুসারে।

আলাপে গমক মন্দ্র তার স্বরে
সে আলাপে শুনিতে কেবা বা ধৈর্য ধরে ॥

[নরহরি চক্রবর্তী', 'ভক্তিরত্নাকর']

তিনটি স্বরগ্রাম (মন্দ্র, মধ্য এবং তার সপ্তক) অধিকার করে ক্রমান্বয়ে আলাপচারী চলতে থাকল। সেই আলাপচারীতে সকলেই মুগ্ধ হল। গায়কেরা তখন শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে গান ধরলেন :

বার বার প্রণমিয়া সবার চরণে।
আলাপে অদ্ভুত রাগ প্রকট কারণে ॥
রাগিণী রহিত রাগ মূর্তিমন্ত কৈলা।
শ্রুতি স্বর গ্রাম মূর্চ্ছনাদি প্রকাশিলা ॥
সুমধুর কণ্ঠধ্বনি ভেদয়ে গগন।
পরম মাদক সুধা নহে তার সম ॥

[নরহরি চক্রবর্তী', 'ভক্তিরত্নাকর']

এরপর নরোত্তম দাস নিবদ্ধ গীত পরিবেশন করলেন। ধ্রুপদে যেমন আলাপের পর মূল গান আরম্ভ হয়, তেমনি নরোত্তম দাসের কীর্তনেও আলাপের পর মূল গান সম্পাদিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে এই অনুষ্ঠানে খোল ও করতাল ছাড়া আর কোনও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল বলে জানা যায় না। খগেন্দ্রনাথ মিত্র নরোত্তমের এই গান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'এই প্রবন্ধগীতই নিবদ্ধ সঙ্গীত এবং ইহাই কীর্তনগানে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। নরোত্তম এই নিবদ্ধ গীতই করিয়াছিলেন। প্রথমে যে অনিবদ্ধ গীত বা আলাপচারীর দ্বারা গীত আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার ধারা কিছুটা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কীর্তনগানের পূর্বে নায়কেরা এখনও অর্থশূন্য বর্ণন্যাসের দ্বারা আলাপ করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক স্থলে উহা পরস্পরের কণ্ঠ মিলন ব্যাপারে পরিণত হয়। এইজন্য এই আলাপচারীর নাম হইয়াছে 'মেল' বা 'মেল জমাট'। অর্থাৎ সুরের 'জমাট' করিয়া গান ধরা হয়।'[১]

খগেন্দ্রনাথ মিত্র আরও বলেছেন যে, প্রবন্ধ সঙ্গীতের চারটি ধাতু ও ছটি অঙ্গ থাকে। অধিকাংশ বৈষ্ণব পদাবলীতে উদ্গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব এবং আভোগ —এই চারটি ধাতু বা অবয়ব গঠনের রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।[২] তা সত্ত্বেও কিন্তু কীর্তনের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে, 'বাংলা দেশে কীর্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্থানী গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে

১। 'কীর্তন', কলিকাতা (১৩৫২), পৃঃ ২৯।
২। 'কীর্তন', কলিকাতা (১৩৫২), পৃঃ ২৮।

পারলে…। অথচ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগরাগিণীর উপাদান সে বর্জন করেনি, সে সমস্ত আপন নূতন সঙ্গীতলোক সৃষ্টি করেছে।'[১] রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন যে, 'বাঙালীর কীর্তন গানে সাহিত্যে এবং সঙ্গীতে মিলে এক অপূর্ব সৃষ্টি হয়েছিল…। তার মধ্যে যে বহুশাখায়িত নাট্যরস আছে তা হিন্দুস্থানী গানে নেই।'[২] চৈতন্যদেবের সময় থেকে কীর্তনের যে প্রসার ঘটল তাতে একইসঙ্গে দেখা যায় গীত এবং নৃত্য। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী নরোত্তম দাসের কীর্তনের যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে, এই কীর্তন রীতিমতো অভিজাত সঙ্গীত। এর পরে যে মনোহরশাহী ধারার উদ্ভব হয় তা সরলতর এবং লঘুতর। এর পরে যে 'রেণেটী' ধারার সৃষ্টি হয় তা আরও সরল এবং লঘু।

খেতরীর মহোৎসবের পর শ্রীখণ্ড ও কাটোয়াতে যে মহোৎসব হয় তাতেও গরাণহাটী কীর্তনের অনুষ্ঠান হয়েছিল। পরে অবশ্য এই রীতিতে কিছু পরিবর্তন সূচিত হয় এবং গায়ন পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সরল করে পরিবেশিত হতে থাকে।

ধ্রুপদের চর্চা

বাংলাদেশে ধ্রুপদের পুরোপুরি চর্চা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে। এই সময়ে বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ, তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁ-র বংশধর বাহাদুর খাঁ-কে বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন। বাহাদুর খাঁ-র সঙ্গে এসেছিলেন বিখ্যাত মৃদঙ্গী পীরবক্স। বাহাদুর খাঁ-কে পাঁচশত টাকা বেতনে আনা হয়েছিল।[৩]

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর অর্থাৎ ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দের পর মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে শুরু করে। ঔরঙ্গজেব তাঁর তিন পুত্র মু'আজম, মহম্মদ আজম, মহম্মদ কামবক্স—এদের মধ্যে সাম্রাজ্য সমভাগে বিভক্ত করে মৃত্যুর পূর্বে উইল করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও সিংহাসন নিয়ে পুত্রদের মধ্যে বিবাদ বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। তরবারির বলে মু'আজম বাহাদুর শাহ (প্রথম শাহ আলম) নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি জ্ঞানী, উদার নরপতি ছিলেন। তাঁর সময়েও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষণার বিশেষ কমতি হয়নি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আবার সিংহাসন নিয়ে তাঁর চার পুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং তিন পুত্র যুদ্ধে নিহত হওয়ার পর প্রথম পুত্র জাহান্দার শাহ সিংহাসন অধিকার করেন। জাহান্দারের রাজত্ব সম্পর্কে Khafi Khan লিখেছেন, 'In the brief reign of Jahandar violence had full sway. It was a fine time

---

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সঙ্গীতচিন্তা', পৃঃ ১৭০-১৭১।
২। ঐ, ঐ, পৃঃ ১৭৮।
৩। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিষ্ণুপুর' (১৩৩৮), পৃঃ ৩২।

actors."[1]

জাহান্দারকে তাঁর প্রধান মন্ত্রী জুলফিকার খাঁ সহ দিল্লী দুর্গে হত্যা করা হয়। ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে ফারুকশিয়ার দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তিনিও নাম মাত্র নবাব ছিলেন। তাঁর পরে যাঁরাই দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে অপরের হাতের পুতুল ছিলেন। ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে ক্ষমতা বিস্তার করছিলেন এবং দ্বিতীয় শাহ আলম তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত (১৮০৬ খ্রিস্টাব্দ) ইংরেজের পেন্সনভোগী হয়ে জীবিত ছিলেন। দ্বিতীয় শাহ আলম ক্ষমতা হাতে পেয়ে (১৭৫৯ খ্রিঃ) নিজেকে দেখলেন বন্দী অবস্থায় বাস করছেন। তিনি তাঁর সর্বশক্তিমান উজীর গাজী উদ্-দীন ইমাদ-উল-মুলুক-এর হাত থেকে বাঁচবার জন্য পালিয়ে বেড়াতে থাকলেন এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজের শরণাপন্ন হলেন। এই সময়ে দিল্লীর দরবারে যে-সমস্ত সঙ্গীতজ্ঞরা ছিলেন তাঁরা ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজাদের দরবারে আশ্রয়লাভ করতে থাকেন। এই শাহ আলমের দরবারেরই বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ বাহাদুর খাঁ, বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথের রাজসভায় চলে আসেন।

এই সময় থেকেই বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদের চর্চা শুরু হয় এবং এই স্থান ক্রমশ ধ্রুপদ চর্চার একটি বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশ ছিল পূর্ব, উত্তর এবং রাঢ়—এই তিন ভাগে বিভক্ত। এখন বাঁকুড়া জেলায় রাঢ়ভূমির যে অংশ বর্তমান সেই অংশই অতীতের বিষ্ণুপুর রাজ্যের গৌরব-স্মৃতি বহন করছে। এই বিষ্ণুপুর রাজ্যের খ্যাতি সেই মহাভারতের যুগ থেকে প্রবহমান। কেবল বর্তমানের বাঁকুড়া জেলা নয়, এক সময় মেদিনীপুর, বর্ধমান এবং বর্তমান বিহারের ছোটনাগপুরের কিছু অংশও বিষ্ণুপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিষ্ণুপুর বহুকাল ধরে বঙ্গভূমিতে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বিষ্ণুপুর রাজ্য অতি প্রাচীন কাল থেকে মল্লভূম নামে খ্যাতি লাভ করে এসেছে। সপ্তম শতাব্দীতে মল্ল রাজবংশ স্থাপন করেন আদি মল্ল রঘুনাথ। তিনি রাঢ় ও ওড়িশার সীমার মধ্যে বিস্তৃত ভূখণ্ড মল্লরাজের অধিকারভুক্ত করেন। এই হল সেকালের বিষ্ণুপুর রাজ্য।

মল্লবংশের রাজা রাজ মল্লের সময় (খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী) থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিষ্ণুপুর সঙ্গীতসাধনার জন্য প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপুরের আর-এক রাজা বীর হাম্বীর। বীর হাম্বীর মোগল সম্রাট আকবর শাহ-র সমসাময়িক (আকবরের রাজত্বকাল ১৫৫৬-১৬০৫) নরপতি। রাজা বীর হাম্বীর বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি কতকগুলি সঙ্গীত ও পদাবলী রচনা করে বৈষ্ণব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন।

মল্লবংশের পরবর্তী সমস্ত রাজাই সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন।

১। Khafi Khan, 'Muntakhab-ul-lubab', (Bib. Ind., Calcutta, 1860), Elliot and Dowson, vol. VII.

তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সঙ্গীতশাস্ত্রে রীতিমতো পণ্ডিত ছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা চৈত সিংহের পুত্র নিমাই সিংহ সংস্কৃত ভাষা এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর রচিত 'রাগমালা' গ্রন্থটি সঙ্গীতে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করছে।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভারতের গৌরবস্থল বিষ্ণুপুর। আলাউদ্দীন খিলজীর যুগ থেকে আরম্ভ করে মোগল বাদশাহী শাসনের শেষ পর্যন্ত দিল্লী নগরী সঙ্গীত-চর্চার জন্য বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। দিল্লী তাই শুধু রাজনৈতিক দিক থেকেই ভারতের রাজধানী নয়, সঙ্গীত-জগতেরও রাজধানী ছিল। "বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতের অনুশীলন দিল্লীর সঙ্গীত-চর্চার ন্যায় খ্যাতিলাভ করায় বিষ্ণুপুরকে এক সময় 'ছোট দিল্লী' নামে অভিহিত করা হইত।"[১] রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ বিষ্ণুপুর দরবারকে দিল্লীর দরবারে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিল্লী থেকে মুসলমান ওস্তাদদের নিয়ে আসেন। বাহাদুর খাঁ এঁদের অন্যতম।

বিষ্ণুপুর রাজ্যে সর্বপ্রথম সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনা শুরু হয় মল্ল রাজবংশের ৪২তম রাজা পৃথ্বীমল্লের রাজত্বকালে। দিল্লী থেকে বাহাদুর খাঁ এবং পীরবক্সকে আনা থেকেই বোঝা যায় যে এই রাজ্যে সঙ্গীতের সুষ্ঠু অনুশীলন এবং প্রচারের জন্য কি অক্লান্ত পরিশ্রম ও কি পরিমাণ অর্থব্যয় করা হয়েছিল।

রাজা রঘুনাথ সিংহ আনলেন বাহাদুর খাঁকে। এই বাহাদুর খাঁ-র প্রধান শিষ্য হলেন গদাধর চক্রবর্তী। চক্রবর্তী পরিবার সঙ্গীতকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এই বংশের বহু বিচক্ষণ সঙ্গীতজ্ঞ তাঁদের সঙ্গীতসাধনা দ্বারা বিষ্ণুপুরের গৌরব বৃদ্ধি করেন। এঁদের মধ্যে শ্যামচাঁদ, কানাই, মাধব চক্রবর্তী অন্যতম। কানাই ও মাধব সঙ্গীতসাধনায় এতই একাগ্র ছিলেন যে সাধারণ লোকে তাঁদের পাগল মনে করত। সঙ্গীতশিক্ষার জন্য তাঁদের দেশ ঘুরতে হয়। গদাধরের অন্যতম বংশধর নীলমণি চক্রবর্তী মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন। বাহাদুর খাঁ-র পর গদাধর চক্রবর্তী রাজসভার সঙ্গীত অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ও তাঁর শিষ্য রামশংকর ভট্টাচার্য বিষ্ণুপুরের রাজসভায় সঙ্গীত অধ্যাপকের পদ লাভ করেন।

বাংলাদেশের সঙ্গীতজগতে রামশংকর ভট্টাচার্য স্বাতন্ত্র্যে এবং মনীষায় একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় বিরাজমান। আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে বিষ্ণুপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা গদাধর ভট্টাচার্য বিষ্ণুপুর রাজ্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন। অল্প বয়সেই রামশংকর পিতার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ ও পণ্ডিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু ছোটবেলায় সঙ্গীতের সঙ্গে রামশংকরের কোনও সম্পর্ক ছিল না। বড় হয়ে তিনি যখন রাজসভায় যাতায়াত শুরু করলেন,

---

১। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিষ্ণুপুর', কলিকাতা (১৩৫৮), পৃঃ ২৫।

তখনই রামশংকর সন্ধান পেলেন নিজের জগতের। প্রতিভাশালী সঙ্গীত-শিল্পীদের সাধনা তাঁর হৃদয় আকর্ষণ করল। তিনি সঙ্গীতসাধনা শুরু করলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সঙ্গীতের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিকেই পারদর্শিতা অর্জন করলেন। বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতকলাবিদগণ এই প্রতিভাকে চিনতে ভুল করলেন না; তাঁরা তাঁকে গুরুপদে বরণ করে নিলেন। বিষ্ণুপুররাজ রামশংকরকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন।

... ... তাঁর স্বরচিত গানের বিশুদ্ধ মধুর আলাপে বাণীর যে অর্চনা করে গেছেন তা আজও আবেদন জানায়। তাঁর রচিত 'অজ্ঞান-তমো-নিকরে' গানটি প্রায় সব সঙ্গীতরসজ্ঞের মুখেই শুনতে পাওয়া যায়। সঙ্গীতগুরু রামশংকরের দানে সঙ্গীত-সাহিত্যও সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

সঙ্গীতশাস্ত্রানুযায়ী রাগ-রাগিণীর বিশুদ্ধ রাগ বিস্তারে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন রামশংকর। ভাবপূর্ণ উচ্চাঙ্গের গীত রচনাতেও তিনি সাহিত্য ও সঙ্গীতের এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেন। তাঁর গানগুলি নির্দিষ্ট রাগ-রাগিণীতে এবং ধামার ঝাঁপতাল প্রভৃতি ধ্রুপদাঙ্গের তালে রচিত। বাংলাভাষায় রচিত উচ্চ ভাবপূর্ণ গীত যে কতদূর প্রীতিপ্রদ ও মর্মস্পর্শী হতে পারে এবং তাতে ভাবাগত গাম্ভীর্য কি পরিমাণে প্রকাশ পেতে পারে—সঙ্গীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের প্রতিটি গানে তার পরিচয় বর্তমান।

রামশংকর ভট্টাচার্যের পরেই সঙ্গীতাচার্য রামকেশব ভট্টাচার্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রামশংকর ভট্টাচার্যের এই সঙ্গীতবেত্তা পুত্রটিও পিতার ন্যায় বিখ্যাত গায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

একসময় রামকেশব ভট্টাচার্য কুচবিহারাধিপতি মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সভায় সঙ্গীত আলাপের জন্য আমন্ত্রিত হন। মহারাজ গুণীর পূজারী ছিলেন। ভট্টাচার্য মহাশয়ের শাস্ত্রানুগত উচ্চাঙ্গের গান শুনে তিনি এতই অভিভূত হয়ে পড়েন যে রামকেশবকে তিনি একটি হাতি ও নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের শেষ জীবন কাটে কলকাতার বিখ্যাত ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) বাড়িতে সঙ্গীতচর্চা করে। এখানেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

সঙ্গীতগুরু রামশংকর ভট্টাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কেশবলাল চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি কলকাতায় বাস করতেন। এখানেই তিনি উঁচুদরের গায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর বড় হওয়ার মূলে তদানীন্তন কলকাতার স্বনামধন্য ধনী নাগরিক তারকনাথ প্রামাণিকের দান অপরিসীম।

কেশবলাল চক্রবর্তীর তিন পুত্র রামতারণ চক্রবর্তী, রামসুন্দর চক্রবর্তী, আশুতোষ চক্রবর্তী—প্রত্যেকেই সঙ্গীতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন।

রামশংকরের আর-একজন শিষ্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী বিষ্ণুপুরের অন্তর্গত দাঁতন-মেদিনীপুরে ১৮১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই কথকতার প্রতি

তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। পরে কথকতার উপযোগী গান শেখার জন্য সঙ্গীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু সঙ্গীতগুরুর সংস্পর্শে এসে তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ফলে তিনি কথকতাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করার সংকল্প ত্যাগ করেন এবং গুরুর অনুমতি পেয়ে তাঁর কাছেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অনুশীলন করতে শুরু করেন।

কিছুকাল পর ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। সেখানে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করেন। প্রথিতযশা কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ও সঙ্গীতজগতের দিকপাল স্বরূপ বাংলার ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ও রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন-এর সভায় তিনি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাচার্যের সম্মান পেয়েছিলেন। সঙ্গীত-শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধির জন্য রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রচেষ্টায় প্রধান সহযোগী ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। সঙ্গীত-সাহিত্যে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর দানও যথেষ্ট। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রচেষ্টায় কলকাতায় সর্বপ্রথম যে 'বঙ্গ সঙ্গীত বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন তিনি কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। অনেক গানও রচনা করেন তিনি।

ভারতবর্ষে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীই সর্বপ্রথম অর্কেস্ট্রা গঠন করেছিলেন। এই কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন যদুনাথ পাল। ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয়ের সময় ঐকতান বাদন দেওয়া হয়েছিল।[১]

ঠাকুরবাড়িতে থাকাকালীন বারাণসীর বিখ্যাত বীণকার লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রের কাছে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ধ্রুপদ ও বীণাবাদন শিক্ষা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ঐকতানিক স্বরলিপি', 'সঙ্গীতসার', 'গীতগোবিন্দের স্বরলিপি', 'কণ্ঠকৌমুদী', 'আশুরঞ্জনী তত্ত্ব' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ক্ষেত্রমোহনের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তিন জন ছিলেন স্বনামধন্য—পাথুরিয়াঘাটার শৌরীন্দ্রমোহন, প্রতিভাদীপ্ত ও অসামান্য সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ন্যাসতরঙ্গ বাদক ও সেতারী সুরবাহারী কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতাচার্য দীনবন্ধু গোস্বামী সংস্কৃতিসম্পন্ন গায়ক ছিলেন। সঙ্গীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের কৃতী শিষ্যদের অন্যতম দীনবন্ধু গোস্বামী খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী প্রভৃতি সবরকম গানেই অভিজ্ঞ ছিলেন। অবশ্য খেয়াল গানেই তিনি যশস্বী হন। সঙ্গীত-রচনাতেও দক্ষ ছিলেন তিনি।

১। অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, 'ভারতীয় সংস্কৃতির উৎসধারা' (১৩৭২-এর সংস্করণ), পৃঃ ৬৯৯-৭০০।

ভারতবর্ষব্যাপী খ্যাতিলাভ করেছিলেন বিষ্ণুপুরের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন যদুনাথ ভট্টাচার্য। প্রসিদ্ধ যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পী মধু ভট্টাচার্যের পুত্র ছিলেন তিনি। যদুনাথ পরে 'যদুভট্ট' নামে সঙ্গীতজগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সঙ্গীতগুরু রামশংকর ভট্টাচার্যের শিষ্য যদুভট্ট পিতার কাছে সুরবাহার, সেতার, মৃদঙ্গ প্রভৃতি যন্ত্রসঙ্গীত অনুশীলন করেন। এই কারণে যদুভট্ট কণ্ঠসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীতে সমান দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি দিল্লী, গোয়ালিয়র, জয়পুর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন এবং ঐ-সব স্থানে সে-যুগের বিখ্যাত ওস্তাদদের সংস্পর্শে আসেন।

যদুভট্ট হিন্দীভাষায় ভাবপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করতে পারতেন। হিন্দী ভাষার তাঁর দখল থাকায় অ-বাঙালি সঙ্গীতরসিকদেরও তিনি অতি সহজে মুগ্ধ করতে পারতেন। এজন্যই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। তাঁর হিন্দী ও বাংলা ভাষায় রচিত গানগুলি সঙ্গীত-বিশারদ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'সঙ্গীত মঞ্জরী' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

বিভিন্ন রাজসভায় যদুভট্টকে সঙ্গীতাচার্য পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। পঞ্চকোট-রাজ তাঁকে 'রঙ্গনাথ' উপাধি দান করেন। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর তাঁর সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'তানরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুরুদের অন্যতম। ত্রিপুরার রাজসভায় থাকাকালে যদুভট্ট অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বিষ্ণুপুরে ফিরে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি চুয়াল্লিশ বছর বেঁচে ছিলেন।

সঙ্গীতগুরু রামশংকর ভট্টাচার্যের পরলোকগমনের পর তাঁর কৃতী শিষ্যদের প্রায় সকলেই অর্থ ও প্রতিষ্ঠালাভের আশায় বিষ্ণুপুর ছেড়ে কলকাতা বা অন্যান্য স্থানে চলে যান। মাত্র দুজন শিষ্য বিষ্ণুপুরে থেকে বাংলার এই সঙ্গীত-তীর্থের গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর হন। এই দুই সঙ্গীতসাধক হলেন সঙ্গীতগুরুর পুত্র রামকেশব ভট্টাচার্য এবং রামশংকরের প্রিয়তম শিষ্য অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই পদের মর্যাদা সসম্মানে রক্ষা করে গেছেন।

বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম জীবনে তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি সঙ্গীতগুরু রামশংকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

গুরুর দেহত্যাগের পর অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-সিংহাসনে আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত হন। তখন দ্বিতীয় গোপাল সিংহ বিষ্ণুপুরের মহারাজা। বিষ্ণুপুর রাজ্যের আর্থিক অবস্থা এই সময় কিছুটা ভাঙনের দিকে। কিন্তু অনন্তলালের আর্থিক লালসা ছিল না। তাই তিনি বিষ্ণুপুর রাজ্যেই থেকে যান। তাঁর চরিত্র এবং ব্যবহার ছিল অতুলনীয়। মহারাজা গোপাল সিংহ অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ সঙ্গীত-নৈপুণ্য দেখে তাঁকে

'সঙ্গীত কেশরী' উপাধি দান করেন। মহারাজের দুই পুত্র তাঁর কাছে সঙ্গীত-শিক্ষা করে কৃতবিদ্য হন।

মহারাজা গোপাল সিংহ বিষ্ণুপুরে সর্বপ্রথম সঙ্গীত-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এটিকেই ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সঙ্গীত-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করা হয়। গোপাল সিংহের পুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ দেবের রাজত্বকালে অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষাদানের ভার নেন। এই বিদ্যালয়টি আজও বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতগৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

এই সঙ্গীত-বিদ্যালয় সঙ্গীতকেশরী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সঙ্গীত-শিক্ষা করে কালক্রমে যাঁরা দিকপাল সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে উদয়চন্দ্র গোস্বামী, কলকাতা সঙ্গীত সমাজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের আচার্য বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী, নড়াজোল রাজসভার সঙ্গীতাচার্য রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ধমান রাজসভার সঙ্গীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, হারাধন চক্রবর্তী, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার, অম্বিকাচরণ কাব্যতীর্থ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীতাচার্য রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীতকেশরী অনন্তলালের কৃতী সন্তান।

এঁদের মধ্যে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভা বহুমুখী ছিল। তিনি তাঁর পিতা অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তেরো বছর ধরে ধ্রুপদ গান শিক্ষা করেন। তিনি খেয়াল গান শিক্ষা করেন· প্যার খাঁর শিষ্য গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে। গুরুপ্রসাদ মিশ্রের বড় ভাই রামপ্রসন্ন মিশ্রের কাছে তিনি শিক্ষা করেন টপ্পা ও ঠুংরী। বর্ধমানরাজ তাঁকে 'সঙ্গীত নায়ক' উপাধি দান করেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দান করেন 'স্বরসরস্বতী' উপাধি। তিনি পাঁচ হাজার ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা আয়ত্ত করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি 'গীতমালা', 'তানমালা', 'সঙ্গীত লহরী', 'সঙ্গীত চন্দ্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

বিষ্ণুপুরের শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গ-বিশারদ জগৎচাঁদ গোস্বামীর পুত্র সঙ্গীতাচার্য রাধিকা-প্রসাদ গোস্বামী আবাল্য সঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। প্রায় বিশ বছর ধরে সঙ্গীতশিক্ষা ও সাধন দ্বারা তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। এই সাধনায় তাঁর গুরু ছিলেন সঙ্গীতকেশরী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যদুভট্ট।

মহানগরী কলকাতাকেই তিনি তাঁর কষ্টার্জিত সঙ্গীতবিদ্যা প্রকাশের ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করেন।

কলকাতায় রাধিকাপ্রসাদ বেতিয়া ঘরাণার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধ্রুপদী শিবনারায়ণ মিশ্র ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করেন। বেতিয়া ঘরাণা মূলত ধ্রুপদ গানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও গুরুপ্রসাদ মিশ্র খেয়াল গান করতেন। রাধিকা-প্রসাদ গুরুপ্রসাদের কাছে কিছু খেয়াল গানও শেখেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে জোড়াসাঁকোর ভবনে নিয়ে এসে তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেন। এই সূত্রে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ভারত সঙ্গীত

সমাজের সংস্রবে আসেন, ফলে সারা ভারতে তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভার কথা ছড়িয়ে পড়ে। কিছুকাল পরে কাশিমবাজারের স্বনামধন্য মহারাজ মণীন্দ্র তাঁকে সসম্মানে কাশিমবাজারে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গীতসভায় আচার্যের পদে অধিষ্ঠিত করেন।

রাধিকাপ্রসাদ তিন পুত্র রেখে পরিণত বয়সে পরলোকগমন করেন। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোবিন্দ গোস্বামীকে তিনি সঙ্গীতবিদ্যা দান করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি অল্প বয়সেই মারা যান। পরে রাধিকাপ্রসাদ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীকে সঙ্গীতশিক্ষা দেন। রাধিকাপ্রসাদের এই শিষ্যটি গুরুর মুখ উজ্জ্বল করেন।

ধ্রুপদ চর্চার বিভিন্ন কেন্দ্র

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, বিশেষভাবে ধ্রুপদের চর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চুঁচুড়া (হুগলি জেলার অন্তর্গত), কৃষ্ণনগর (নদীয়া জেলার) এবং মুর্শিদাবাদ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, বিশেষত ধ্রুপদ চর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ওস্তাদ মান খাঁ ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে চুঁচুড়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এর কাছাকাছি সময়ে ওস্তাদ বড়ে মিয়াঁ, হাসসু খাঁ, হরদু খাঁ, হীরা এবং বুলবুল মুর্শিদাবাদে এসে বাস করতে থাকেন। ওস্তাদ রসুল বক্স প্রথমে কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে আশ্রয় লাভ করেন, পরে তিনি হুগলি জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরে বসবাস আরম্ভ করেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম্ ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি ছিলেন ইংরেজের পেনসনভোগী নবাব এবং তাঁর সময়েই দিল্লীর দরবারের সঙ্গীতজ্ঞরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন মুসলমান নবাব, হিন্দু রাজা এবং জমিদারদের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জানা যায় যে এঁদের অধিকাংশই ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করেন। হায়দার খাঁ বেতিয়ায় চলে যান, ছজ্জু খাঁ যান লক্ষ্ণৌ-এ এবং ওস্তাদ মান খাঁ, ওস্তাদ বড়ে মিয়াঁ, হসসু খাঁ প্রভৃতি বাংলাদেশে আসেন।

চুঁচুড়ার রামচন্দ্র শীল ওস্তাদ মান খাঁ-র প্রথম শিষ্য। এছাড়া গোপাল চন্দ্র পাঠক, পরাণ মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পাল, রামকানাই মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞরা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

ওস্তাদ রসুল বক্সের যোগ্য শিষ্য ছিলেন রামদাস গোস্বামী। এই রামদাস গোস্বামীর কাছেই শ্রীরামপুরের নিমাইচাঁদ ঘোষাল এবং বারাণসীর হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। হরিনারায়ণ অবশ্য আরও কয়েকজন হিন্দু এবং মুসলমান ওস্তাদের কাছে ধ্রুপদ গান শিখেছিলেন।

বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতজ্ঞরা হিন্দী, ব্রজবুলি এবং বাংলা—এই তিন ভাষাতেই ধ্রুপদ রচনা করেছেন। অবশ্য তাঁরা এমনভাবে শব্দ চয়ন করেছেন যাতে

হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের সুরবিন্যাসে অসুবিধা না হয়। এইসব গানের কিছু উদাহরণ দেওয়া হল :

'সঙ্গীত মঞ্জরী' গ্রন্থে সংকলিত যদুভট্টের একটি গান—

তিলক-কামোদ | ঝাঁপতাল

কওন রূপ বনি হো রাজাধিরাজ
আজু নয়ন নিরখি রঙ্গনাথ গাওএ।
তজি অগুরু চন্দন, বিভূতি অঙ্গ ভূষণ,
জটা মকুট ক্যায়সী বনি আওএ।
ক্যায়সো মুখমণ্ডল, ঝলস শ্রুতি-কুণ্ডল,
ভঈ-চন্দ ভাল মৃগছাল পাওএ।
বরজি বর অম্বর, পহন বাঘম্বর
শীধ পর গঙ্গাধর ধরসি ধাওএ॥

রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর একটি গান—

ছায়ানট | ঝাঁপতাল

নব ঘন বরণ জাকে ঝলক অতি সুন্দর,
নিরখ মন ভাওঅ লগী অ্যায়সে নহী জগ পর।
মুরলী জব কর ধুন বস হোয় সকল জন,
তেজ প্রগট কিয়ো গোবরধন ধারণ কর।
অ্যায়সে নিরে ত্রিভুবন পুজে তু আচরণ,
ধন ধন, তু' রাজ নন্দকুমার বর।
রাধিকাপ্রসাদ ক্যায়সে চরণমে' শরণ পাওএ,
নিত নাম ভাওএ হো হো নবরূপ ঈশ্বর।

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ২০শে আগস্ট ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই দিন উপাসনা শেষে 'শশ্বতমভয় শোকং', 'বিগত বিশেবং' এবং 'ভারো সেই একে' এই তিনটি গান গাওয়া হয়েছিল। এই তিনটি গানকেই প্রথম ব্রহ্মসঙ্গীত বলা যায়। এই গানগুলিতে ধ্রুপদের ভাবগাম্ভীর্য পরিলক্ষিত হয়। রামমোহন রায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্যে এবং সঙ্গীতকে পূর্ব গরিমায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় সঙ্গীতকে একটি বিশেষ অঙ্গ রূপে পরিণত করেন। রামমোহনের গানগুলি শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদ ও খেয়ালের সুর ও ছন্দ অবলম্বনে রচিত। তৎকালীন প্রসিদ্ধ গায়ক-বাদকরা উপাসনা-সভায় যোগদান করতেন। এই প্রসঙ্গে ওস্তাদ গোলাম রসুলের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর সঙ্গে সংগত করতেন গোলাম আব্বাস।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলকাতা শহর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়। এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১—১৯০৮) এবং শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৪০—১৯১৪)। যতীন্দ্রমোহন এবং শৌরীন্দ্রমোহন কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদার হরকুমার ঠাকুরের পুত্র। বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে যতীন্দ্রমোহন সাহিত্য এবং সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সাহিত্যকীর্তি থাকলেও সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেই তিনি বেশি পরিচিত। দেশীয় সঙ্গীতে সংস্কার এবং উন্নতির জন্য অজস্র অর্থব্যয় করেন তিনি। তিনি 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমী অফ মিউজিক'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'ফিলাডেলফিয়া' এবং 'অক্সফোর্ড' বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডক্টর অফ মিউজিক' উপাধি লাভ করেন। তিনি কাশীতে এবং কলকাতায় মহম্মদ আলী খাঁ-র কাছে সঙ্গীতশিক্ষা করেন। শৌরীন্দ্রমোহন ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট সেতার-বাদক। ধ্রুপদে তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন।

পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় একটি সঙ্গীত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের বিখ্যাত হিন্দু এবং মুসলমান ওস্তাদেরা জলসা ও মাইফিল উপলক্ষে মাঝেমাঝে কলকাতায় আসতে থাকেন। এইসব জলসার প্রধান আকর্ষণ ছিল ধ্রুপদ গান। রেদা থেকে মৌলাবক্স, লাহোর থেকে আলিবক্স দৌলত খাঁ এবং গয়া থেকে হনুমান দাসজী প্রভৃতি বিখ্যাত ওস্তাদেরা কলকাতায় আসতে থাকেন।

পাথুরিয়াঘাটার যতীন্দ্রমোহন এবং শৌরীন্দ্রমোহন ছাড়া বাংলাদেশের আর যাঁরা ধ্রুপদ চর্চায় সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন বেতিয়ার মহারাজা আনন্দ কিশোর এবং মহারাজা নওল কিশোর, গৌরীপুরের রাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মৈমনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য, মুক্তাগাছার জগৎকিশোর আচার্য, গোবরডাঙার বাবু সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, লালগোলার রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুর, নাটোরের মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ রায়, আগরতলার রাজা বীরবিক্রম বাহাদুর প্রভৃতি। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যে সব ওস্তাদ আসতেন তাঁরা সবাই ধ্রুপদ গাইতেন বটে, কিন্তু তাঁদের গায়নভঙ্গী একরকম ছিল না। তার ফলে বিভিন্ন ধ্রুপদী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে।

বাইরে থেকে যেসব ধ্রুপদীরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কলকাতায় আসেন তাঁদের মধ্যে মহম্মদ আলী খাঁ এবং উজীর খাঁ-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলী মহম্মদ খাঁ-র কাছে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ধ্রুপদ শিক্ষা করেন।

আমীর খাঁ-র পুত্র উজীর খাঁ উনবিংশ শতাব্দীর একজন নামকরা ধ্রুপদীয়া। আনুমানিক ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম। শৈশব থেকেই তিনি পিতার নিকট ধ্রুপদ এবং বীণাবাদন শিক্ষা করতে থাকেন। রবাব যন্ত্রেও তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি মাতামহ বাহাদুর সেনের কাছ থেকে ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। ফলে একইসঙ্গে তিনি কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

রামপুরের নবাব কল্বে আলি খাঁ-র দরবারে তিনি প্রতিপালিত হন। কল্বে আলি খাঁ-র মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা হায়দার আলি খাঁ তাঁকে বিলাসিতে নিয়ে যান। রামপুর ও বিলাসিতে অবস্থানকালে তিনি সঙ্গীতশাস্ত্র এবং হিন্দু ও মুসলমানী শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শুধু গান রচনা নয়, নাটক রচনা এবং চিত্রাংকনেও পারদর্শী ছিলেন তিনি।

উজীর খাঁ-র দুই মাতামহ সাদেক আলি খাঁ ও নিসার আলি খাঁ বারাণসীতে রাজসভার গায়ক ছিলেন। উজীর খাঁ এখানে নিসার খাঁ-র কাছে ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। এই কাশী থেকেই তিনি কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় তিনি সাত-আট বছর ছিলেন। তাঁর মাতুল কাশিম আলি খাঁ ছিলেন ত্রিপুরার রাজদরবারে। এই দরবার থেকে উজীর আলি খাঁ বিশেষ সম্মান লাভ করেন। দারভাঙা, ইন্দোর, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজদরবারে তিনি গান গেয়েছেন। কলকাতার মেটিয়াবুরুজের নবাব পরিবার থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজবাড়িতে তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে গান গেয়েছেন। কলকাতায় কয়েক বছর থাকার পর উজীর খাঁ রামপুরের নবাব হামেদ আলি খাঁ-র সঙ্গীতগুরুর পদ গ্রহণ করে সেখানে চলে যান। শুধু নবাব নয়, আরও কয়েকজনকেও তিনি সেখানে ধ্রুপদ এবং বীণাবাদন শিক্ষা দেন। এঁদের মধ্যে আছেন পঞ্চেৎগড়ের রাজা যাদবেন্দ্রবাবু, নাসির আলি, মহম্মদ হোসেন, আবদার রহিম, হাফেজ আলি এবং আলাউদ্দীন খাঁ প্রভৃতি।

উজীর খাঁ-র তিন পুত্র নাজির খাঁ বা প্যারে মির্জা, নাসির খাঁ এবং সগীর খাঁ পিতার মতোই গুণী ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র সগীর খাঁ এবং পৌত্র দবীর খাঁ বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম ধ্রুপদীয়া। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে উজীর খাঁ পরলোক গমন করেন।

কলকাতা শহরে থেকে যে-সব সঙ্গীতজ্ঞ ধ্রুপদ গানকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুপ্রসাদ মিশ্র, লক্ষ্মী-প্রসাদ মিশ্র, বিশ্বনাথ ধামারী, সতীশচন্দ্র দত্ত (দানীবাবু) মহিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সঙ্গীতজগতে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এক উজ্জ্বল রত্ন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ ছেড়ে দিয়ে তিনি বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও সঙ্গীতের সাধনা অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। তিনি ধ্রুপদ গাইলেও ঠুংরীর বৈচিত্র্যকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। সঙ্গীতের সুরমিশ্রণেও তাঁর সমর্থন ছিল। বাংলাদেশের অধিকাংশ ওস্তাদই বাংলাভাষায় লেখা ধ্রুপদ, খেয়াল গান না—এ ব্যাপারটা কৃষ্ণধনকে যথেষ্ট পীড়া দিয়েছে। তিনি 'বাঙালীর কবি ও কলাবৎ' উভয়কে এক হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থটিতে সঙ্গীতের মূল পদ্ধতি নিয়ে মূল্যবান আলোচনা আছে। এছাড়াও তিনি 'Hindusthani airs arranged for the pianoforte', 'সঙ্গীত শিক্ষা', 'সেতার শিক্ষা', 'বঙ্গ ঐক্যতান' পুস্তক রচনা করেন।

গিরিজাশংকর চক্রবর্তী ঠুংরী গায়ক হিসেবে পরিচিত হলেও তিনি যে একজন উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদীয়া ছিলেন এ-কথাও সত্য। তিনি খেয়ালও গাইতে পারতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের যখন অবসান হয় (১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ) তখন তিনি কলকাতায় আসেন। বহরমপুরে তাঁর জন্ম (১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে)। তিনি প্রথমে আর্টস স্কুলে চিত্রাংকন বিদ্যা শিক্ষা করেন। আঠারো বছর বয়স থেকেই তিনি বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞের নিকট সঙ্গীতশিক্ষা করতে থাকেন। তিনি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত বিদ্যালয়ে আট বছর ধরে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। তিনি প্রসিদ্ধ ওস্তাদ মহম্মদ আলী খাঁ, নবাব ছম্মন সাহেব ও উজীর খাঁ-র কাছে হোরি ধ্রুপদের তালিম নেন। খেয়াল শিক্ষা করেন ওস্তাদ মুন্নে খাঁ এবং দিল্লীর তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ খেয়ালী মুজাফ্‌ফর খাঁ-র কাছে। তিনি শ্যামলাল ক্ষেত্রীয় সহায়তায় গোয়ালিয়রের শ্রেষ্ঠ ঠুংরী গায়ক ভাইয়া সাহেব, গণপৎরাও এবং মইজুদ্দীনের কাছে ঠুংরী শিক্ষা করেন।

বাংলাদেশে ধ্রুপদের প্রচার প্রসঙ্গে আরও যাঁদের নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন তাঁরা হলেন—সঙ্গীত নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮০—১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ), অমরনাথ ভট্টাচার্য, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (মৃত্যু ১৯৬৪) প্রভৃতি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম-অষ্টম দশকে, রবীন্দ্রনাথের যখন শৈশবকাল, সেই সময় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ধ্রুপদ গানের ব্যাপক চর্চা ছিল। ঠাকুরবাড়িতে নানান উৎসব অনুষ্ঠানে যে গান গাওয়া হত তার বেশিরভাগই ছিল ধ্রুপদ এবং ধামার। 'উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ গান শিশুরাও গাইত, কারণ, বাড়ীর নানা উৎসবের জন্য রচিত বাংলা ধ্রুপদ গানে তাদের যোগ দিতে হত। শিশু বয়সেই মাঘোৎসবে গুরুদেবও বাড়ীর অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গান গাইতেন।'[১] এইজন্য ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের ওপর শিশুবয়সেই যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। একথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখে গেছেন। 'মোট কথা ধ্রুপদ গান গাওয়া ছিল তখনকার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর একটি স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার ও স্বাভাবিক। বাংলাদেশের জলবায়ুতে দিল্লী গোয়ালিয়র থেকে আমদানী করা ধ্রুপদ গান বেশ একটু বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং পরে তার বিকাশক্ষেত্র বোধ হয় বাংলাদেশেরই মর্যাদার কৃতিত্ব ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রসারিত হয়েছিল। এখনও সেই স্বকীয়তা বাংলাদেশ বজায় রেখেছে বললে অসঙ্গত বলা হবে না।'[২]

রাজা রামমোহনের পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় উপাসনা-গৃহে

১। শান্তিদেব ঘোষ, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত', কলিকাতা (১৩৬৯), পৃঃ ৩১।

২। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, 'সঙ্গীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান', কলিকাতা (১৯৬৫), পৃঃ ৬৩।

উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের, বিশেষত ধ্রুপদ সঙ্গীতের ধারায় ব্রহ্মসঙ্গীত চালু হয়। দেবেন্দ্রনাথ নিজে এই ধরনের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রচনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পথচারী ছিলেন। এঁদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ছিলেন অগ্রণী। তাঁর রচিত 'কেন আনিলে গো এ ঘোর সংসারে জগত জননী দূর কর ভয়, ভীত যে আমি' (সিন্ধু রাগ, চৌতাল), 'বিজন মন-মন্দিরে বিরাজে শিব-সুন্দর, অরূপ সে রূপ হেরি, আনন্দে হও মগন' (জয়জয়ন্তী রাগ, ঝাঁপতাল) প্রভৃতি ধ্রুপদ গান বিখ্যাত হয়ে আছে। এ ছাড়া দ্বিজেন্দ্রনাথের 'হৃদয়চাতক মোর চায় তোমারি পানে শান্তি দাতা, শান্তি পীযূষবারি হে বরিষ বরিষ' (নটনারায়ণ রাগ, চৌতাল), হেমেন্দ্রনাথের 'আনন্দধারা প্রবাহে কিবা আজি, হৃদাকাশ মাঝে কত চন্দ্রমা বিরাজে' (শঙ্করাভরণ রাগ, চৌতাল) প্রভৃতি গান ধ্রুপদ সঙ্গীতের ঐতিহ্য বহন করে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত ধ্রুপদী বিষ্ণু চক্রবর্তী এবং শ্রীকণ্ঠ সিংহ। বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক। এই বিষ্ণু চক্রবর্তীর গানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন, 'বিষ্ণুর গানের একটা বিশেষত্ব ছিল। ওস্তাদরা যেমন তান-অলংকারে প্রাধান্য দেন, বিষ্ণু তেমনি কিছু করিতেন না। তিনি অল্পস্বল্প তান দিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে রাগিণীর মূল রূপটি বেশ ফুটিয়া উঠিত, গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেন না। ইহা ছাড়া, কথার যে একটা মূল্য আছে, সেটিও বিষ্ণুর গানে পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইত। সকলেই গানের সুর এবং গৎ দুই-ই সহজে বুঝিতে পারিত। বিষ্ণু ধ্রুপদ-খেয়ালই বেশী গাহিতেন।'

দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথের সময়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের উপাসনা সঙ্গীত রচনার পূর্বেই দেবেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের দাদারা সে যুগের বড় বড় ওস্তাদদের সহযোগিতায় প্রায় ষাটটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। 'এই সব গান রচনায় যে কয়জন বড়ো বড়ো ওস্তাদ তাঁদের সাহায্য করেছিলেন তার মধ্যে গৃহশিক্ষক বিষ্ণু চক্রবর্তী, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপুরের রাজচন্দ্র রায় ও যদুভট্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।'[১] ঠাকুরবাড়িতে ওস্তাদরা নিয়মিত আসতেন এবং আশ্রয় গ্রহণ করতেন। 'বাংলাদেশের বাইরের ওস্তাদদের মধ্যে বরোদার তৎকালীন বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সও তাঁদের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন। অযোধ্যা, গোয়ালিয়র ও মোরাদাবাদ থেকে ওস্তাদরা তাঁদের বাড়ীতে আশ্রয় নিতেন।'[২]

রবীন্দ্রনাথের দাদাদের মধ্যে সবাই হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

১। শান্তিদেব ঘোষ, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত', কলিকাতা (১৯৬২), পৃঃ ৩৩।
২। শান্তিদেব ঘোষ, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত', কলিকাতা (১৯৬২), পৃঃ ৩৫।

তাঁর বড় ভগ্নীপতি সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় সে যুগের নামকরা সেতারী সুজানা প্রসাদের শিষ্য। সারদাপ্রসাদ ধ্রুপদ গানও গাইতেন।

রবীন্দ্রনাথের শৈশবে যাঁরা তাঁর মনে সাঙ্গীতিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু চক্রবর্তী ছাড়াও শ্রীকণ্ঠ সিংহ, এক অজানা গাইয়ে এবং যদুভট্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীকণ্ঠ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমাদের বাড়ীর বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন··· তাঁর একটা প্রিয় গান ছিল—ম্যয় ছোড়োঁ ব্রজকী বাসরী। এই গানটি আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝঙ্কার দিতেন এবং যেখানটিতে গানের প্রধান ঝোঁক 'ম্যয় ছোড়োঁ', সেইখানটিতে মাতিয়া উঠিয়া তিনি নিজে যোগ দিতেন ও অশ্রান্তভাবে সেটা ফিরিয়া ফিরিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং মাথা নাড়িয়া মুগ্ধদৃষ্টিতে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া সকলকে ঠেলা দিয়া ভালো লাগায় উৎসাহিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন।'[1]

বিষ্ণুপুরের যদুভট্ট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য হল, 'বাঙলাদেশে এরকম ওস্তাদ জন্মায়নি। তাঁর প্রত্যেক গানে একটি originality ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা।'

এই সমস্ত ওস্তাদের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথও বেশ কিছু সংখ্যক ধ্রুপদ ও ধামার গান রচনা করেন। তাঁর ধ্রুপদ গানের মধ্যে রয়েছে 'তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন' (বড়হংস-সারং, চৌতাল), 'বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে লোকে লোকে' (আড়ানা, চৌতাল), 'আমারে করো জীবন-দান' (শংকরা, চৌতাল) প্রভৃতি এবং ধামার গানের মধ্যে রয়েছে 'বীণা বাজাও হে মম অন্তরে', (পূরবী, ধামার), 'এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায়' (বাহার, ধামার), 'গরব মম হরেছ প্রভু, দিয়েছ বহু লাজ' (দেশ-মল্লার, ধামার) প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ চৌতাল ছাড়াও আড়াচৌতাল, তেওড়া, ঝাঁপতাল, সুরফাঁকতাল, রূপক প্রভৃতি তালে বহু ধ্রুপদ গান রচনা করেন।

খেয়ালের চর্চা

খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক থেকে বৃহত্তর বঙ্গে (অর্থাৎ অবিভক্ত বাংলাদেশ, আসাম, ওড়িশা ও বিহার) ধ্রুপদের চর্চা চলে আসছে। স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনেরা হিন্দু এবং মুসলমানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে দক্ষ ছিলেন। তাঁরা শুধু গায়ক ছিলেন না, সঙ্গীতশাস্ত্রেও তাঁদের বিশেষ দখল ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্বামী কৃষ্ণদাস ষোড়শ শতকের প্রথমদিকে 'গীতপ্রকাশ' নামে সঙ্গীত সম্পর্কে একখানি প্রামাণ্য পুস্তক রচনা করেন। এই ষোড়শ শতকে নরোত্তম দাস ধ্রুপদাঙ্গের কীর্তন প্রবর্তন করেন। হরিনারায়ণ মুরারী, গজপতি নারায়ণ দেব, কবি নারায়ণ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ যে সব সঙ্গীতগ্রন্থ

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সঙ্গীত চিন্তা', কলিকাতা (১৯৬৬), পৃঃ ১৮৩-৮৪।

রচনা করেন তা থেকে বোঝা যায় যে বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা অব্যাহত ছিল। নরোত্তম দাস, ঘনশ্যাম, নরহরি দাস প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমান ওস্তাদের কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সময়ে খেয়াল গান বাংলাদেশে আসেনি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে 'টপ্পা' এবং 'টপ্-খেয়াল'-এর (বা টপ্খ্যাল) প্রচলন হয়। এই যুগে যাঁরা টপ্পা এবং টপ্-খেয়ালের প্রচলন করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র, রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) প্রভৃতি। টপ্-খেয়াল সৃষ্টি হয়েছিল টপ্পা এবং খেয়াল রীতির মিশ্রণে। এটা একান্তভাবেই বাংলার নিজস্ব রীতি। এতে মোটা দানার তান ও গমক গিটকিরির অলংকার ছিল।

এখানে টপ্খ্যাল-এর একটি নমুনা দেওয়া গেল। গানটি শোরী মিঞার রচনা :

টপ্খ্যাল

ভৈরব-বাহার | মধ্যমান

কি বহার রঙ্গিলা লে চম্পেদি ডারিয়াঁ
হেরিয়াঁ ভেরিয়াঁ শুনায়ে সখিয়াঁ মান
করন্দা রঙ্গরে লিয়া উমঙ্গ সোঁ।
শোরীরাগ বহার মানু খুশ রঙ্গ
প্যারো তোম মিল বরিয়াঁ ॥

সর্ণা ণণা -ণর্সা I
কি বহা র্০

১ ২
II ণর্সঃ -ণ০ণঃ০ দণদা পা মঃ | দদপমা -পমজ্ঞা -মজ্ঞমা ণদা |
র০ ‘ন্ দি০ না লে চ০০০ ম্পে০ ০০দি ডা০

০ ।। ৩
I -ণদণা র্সা -া নঃ নঃ | র্সাঃ র্র্রঃ র্সর্সঃ ণ০ -দা০ I
০০রি য়াঁ ০ হে রি য়াঁ ভে০ রি০ য়াঁ ০

১' ২
I পঃ পা /মঃ ণদা -ণ০ -দঃ০ | নঃ র্সাঃ -নর্সর্রা -র্সনর্সা I
শু না ০ য়ে০ ০ -০ স খি ০০০০ ০০ ০

০ ৩
I -া ণদাঃ র্সা -র্রঃ ণঃ | র্সঃ র্জ্ঞর্জ্ঞঃ র্ঋ০ র্সঃ০ ণদাঃ I
০ রাঁ০ না .০ ন ক র০ ০ ন্ দা

১ˊ ২
I পমা -পপা জ্ঞা -া | -মজ্ঞা মা -া দা I
র০ ঙ্গ রে ০ ০লি য়া ০ উ

০ ৩
I -ঃমা জ্ঞা মদপদা -র্ঋর্সঃ | -পদপপা র্সা ণা -ণর্সা II
০মঙ্ গ মো০০০ ০০ ০০০০ "কি বহা ০র্"

৩
র্জ্ঞর্জ্ঞ | -ঃর্সর্ঋ র্জ্ঞর্মা র্মর্জ্ঞর্ঋর্জ্ঞ র্ঋঃ র্সা I
শোরী ০রা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ গ ব

১ ২
II ণর্সর্ঋর্স ণর্সঃ -ণ০দঃ০ মঃপ০দঃ০ | ণঃ ণঃ র্সা র্সঃ ণর্সঃ র্জ্ঞর্সঃ র্সর্সঃ I
হা০০০ ০০ র ০ মা ণ্ ০ খ্ শ রঙ্ গ প্যারা তোম দিল

০ ৩
I -ঃর্সণর্সা -র্জ্ঞর্জ্ঞর্ঋর্ঋা র্জ্ঞর্মর্জ্ঞর্ঋা -র্ঋর্সঃ | ণদপপা মা ণা -ণর্সা II II
০বা০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০রি য়া০০০ "কি বহা ০র্"

এই সময়ে বাংলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শুধু যে চর্চাই ছিল তাই নয়, বাংলাদেশ তার নিজস্ব গায়ন-রীতিরও উদ্ভব ঘটেছিল। বাংলার দেবমন্দিরে, বৈঠকখানায় শ্যামাসঙ্গীত, বাংলা টপ্পা এবং টপ্-খেয়াল প্রভৃতি 'বৈঠকী' গানের আলোচনা হত। এই সময়ে প্রসিদ্ধ কবিয়াল হরু ঠাকুর, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, দেওয়ান রামদুলাল, কবিয়াল রাম বসু প্রভৃতি বহু সঙ্গীত রচনা করেন। এই সময়ে নতুন ঢং-এর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এবং রোমান্টিক টপ্পা টপ্-খেয়াল বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় হয়। রামনিধি গুপ্ত নতুন ধরনের টপ্পা[১]-র প্রবর্তন করে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এক নবজাগরণ সৃষ্টি করেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন, 'Specially Ramnidhi Gupta brought a renaissance in the classico-Bengali songs by composing and improvising new type of tappa, and from this it can be presumed that tappa was introduced in Bengal earlier than Hindusthani Kheyal and that Bengal of the 18th-19th century had her full share of the legacy of traditional music; which came to be known as the aristocratic vaithaki sangita.'[২]

১। Captain N. Augustus Willard তাঁর 'Treatise on the Music of Hindoostan' নামক বইতে লিখেছেন, 'টপ্পারীতির গান পাঞ্জাবের উটচালকদের জাতীয় সঙ্গীত ছিল। প্রসিদ্ধ গায়ক শোরী মিঞা তাকে নানা অলংকারে ভূষিত করে উন্নত করেছেন।' পাঞ্জাবী উপভাষায় টপ্পা রচনা করলেও তিনি অযোধ্যার লোক। তাঁর প্রকৃত নাম গোলাম নবী। তিনি তাঁর প্রণয়িনী বাঈজী শোরীর নামে ভনিতা দিয়ে গাইতেন। এই জন্যই শোরী মিঞা টপ্পা রচয়িতা হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন।

২। Swami Prajnanananda, 'A Historical Study of Indian Music', Calcutta (1965), pp. 220-221.

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা গানের ক্ষেত্রে একটা নতুন জাগরণ দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন শাস্ত্রীয় রাগ, যেমন—বসন্ত, গৌড়ী, সাহানা, পূরবী বা পূর্বী, বাগেশ্রী, নট, খাম্বাজ, ভীমপলশ্রী, মুলতান প্রভৃতি রাগে এবং আট মাত্রার যৎ, মাত্রার আড়াঠেকা, বত্রিশ মাত্রার মধ্যমান, বারো মাত্রার একতাল (ত্রিমাত্রিক), আড়া, পোস্তা প্রভৃতি তালে বাংলা গান স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে বিকশিত হতে থাকে। এই সময়ে বাংলা গানের রাগরূপ ও গীতরীতি হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল এবং এখনও কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। পাঁচালী গায়ক দাশরথী রায়, রসিকচন্দ্র রায়, নাট্যকার মনোমোহন বসু, শ্রীধর কথক, যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারী, ঢপ গায়ক মধুসূদন কিন্নর বা মধু কান প্রভৃতির গানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এই নতুন রূপ ফুটে ওঠে। বাংলার কৃষ্ণযাত্রা, কথকতা, রামায়ণ গান, ঝুমুর, কবিগান, তরজা, শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতির মাধ্যমে পাঁচালী, টপ্পা এবং টপ্-খেয়াল প্রভৃতি রাগাশ্রয়ী গানের ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। ঠিক এই সময়েই দেখা যায় কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চল, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, হুগলী, গোবরডাঙা, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর, আগরতলা (ত্রিপুরা), আসাম-গৌড়ীপুর এবং বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত নাটোর, মৈমনসিংহ, গৌড়ীপুর, ঢাকা, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে রাজা-মহারাজা এবং জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ধ্রুপদ ও খেয়ালের চর্চা হতে থাকে।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এই চর্চা সম্ভব হওয়ার কারণ, এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান বহু ওস্তাদের আবির্ভাব ঘটে। এঁরা হলেন রহিম বক্স, মহম্মদ খাঁ, মান খাঁ, বড়ে মিয়াঁ, হর্দু খাঁ, দেলেয়ার খাঁ, হস্‌সু খাঁ, নবী কাওয়াল মিরণ, ইমদাদ হোসেন খাঁ, আলি বক্স, কুতুব খাঁ, নিয়ামাৎ উল্লা খাঁ, দৌলৎ খাঁ, নাম্নে খাঁ, উজীর খাঁ, বসৎ খাঁ, কালে খাঁ, মোরাদ আলি খাঁ, আব্দুল করিম খাঁ, আলাদিয়া খাঁ, মৌলা বক্স, আমীর খাঁ, সাজ্জাদ মহম্মদ খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, রজব আলি খাঁ, রহমৎ খাঁ, আলাউদ্দীন খাঁ, এনায়েৎ হোসেন খাঁ, কাশেম আলী খাঁ, খলিফা বাদল খাঁ, পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর, পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, ভাস্কর রাও (বুয়া), রামচন্দ্র শীল, গোপালচন্দ্র পাঠক, শিবনারায়ণ মিশ্র, রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীনাথ মিশ্র, বিশ্বনাথ রাও, গয়ার হনুমান দাসজী, সোনাজী, লক্ষ্মী প্রসাদ, ভাইয়া সাহেব গণপৎ রাও, মৈজুদ্দীন খাঁ, অঘোরনাথ চক্রবর্তী, যদু ভট্ট, নুলো গোপাল (প্রসাদ মুখোপাধ্যায়), রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বেহালার রামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, লালচাঁদ বড়াল প্রভৃতি। এঁরা সবাই ধ্রুপদ এবং খেয়াল এই দুই প্রকার গানেরই চর্চা করেছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, গৌড়ীপুরের রাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, নাটোরের মহারাজ, মুক্তাগাছার সূর্যকান্ত আচার্য, গোবরডাঙার শারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ত্রিপুরার বীরবিক্রম

বাহাদুর, পাথুরিয়াঘাটার ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, কলকাতার শ্যামলাল ক্ষেত্রী, সেই দুলিচাঁদ বড়াল প্রভৃতি ধ্রুপদ এবং খেয়াল দুই ধারারই পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।

হিন্দুস্থানী খেয়াল বাংলাদেশে প্রথম প্রচার করেন হরিনাভির অঘোরনাথ চক্রবর্তী, কলকাতার নুলো গোপাল এবং শিবনারায়ণ মিশ্র, পণ্ডিত গুরুপ্রসাদ মিশ্র প্রভৃতি। অঘোরনাথ চক্রবর্তী এবং নুলো গোপাল ধ্রুপদী হিসাবেই বেশি পরিচিত। তবুও খেয়াল গানে তাঁদের দক্ষতা কম ছিল না। তাঁরা ধীরগতির গমকের তানযুক্ত বিলম্বিত-খেয়াল গাইতেন। অঘোরনাথ চক্রবর্তী রাধিকা-প্রসাদ গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শিবপুরের নিকুঞ্জবিহারী দত্ত, হরেন্দ্রনাথ শীল প্রভৃতি অনেক বাংলা গান রচনা করে হিন্দুস্থানী ঢং-এ পরিবেশন করেন। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সঙ্গীতশিক্ষক বিষ্ণু চক্রবর্তী ব্রাহ্মসমাজে হিন্দুস্থানী এবং বাংলা খেয়াল গানের প্রচলন করেন।

এই সময় অঘোরনাথ চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞ যাঁরা ধ্রুপদ গান গাইতেন তাঁরা গানে সামান্য বিস্তার করে, দু-একটি বাটের ব্যবহার করে টপ্পাভঙ্গির তান প্রয়োগ করতেন। অঘোরনাথ চক্রবর্তীর 'দানাদার টপ্পার তান'-এর কথা দিলীপকুমার রায় উল্লেখ করেছেন ('সাঙ্গীতিকী', ১৯৩৮, পৃঃ ১৫৯)। সুরেন্দ্রনাথ শৈশব থেকেই পশ্চিম ভারতে মানুষ। তাই হিন্দুস্থানী গায়নরীতি তিনি ভালভাবেই জানতেন। তাঁর গান সম্পর্কেও দিলীপকুমার রায় বলেছেন, "বাংলা গানে কথার স্বরবর্ণে তানকে সহজ করে গাঁথার তাঁর জুড়ি ছিল না সে সময়ে। 'রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো', 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,' 'আমার মন ভুলালে যে কোথায় আছে সে', 'আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো', 'কেন করুণ স্বরে বীণা বাজিল,' 'বিয়োগ-বিধুরা রাজবালা' প্রভৃতি গানে তিনি হিন্দুস্থানী টপ্‌খেয়ালের যে-লীলায়িত আনন্দের ঢেউ তুলতেন তাতে রসজ্ঞমাত্রেরই প্রাণ উঠত দুলে।"[১] এ প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর নাম উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল দুজনেই ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা এই তিন শ্রেণীর গানই রচনা করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা ছিল যেমন ধ্রুপদের দিকে, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবণতা ছিল তেমনি টপ্‌খেয়াল এবং খেয়ালের দিকে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'আজিগো তোমার চরণে জননি' (ইমন কল্যাণ, একতাল), 'আজি নূতন রতনে' (ভৈরবী, ত্রিতাল) প্রভৃতি খেয়াল এবং 'আজি বিমল নিদাঘ প্রভাতে' (ভৈরবী, মধ্যমান), 'মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে (নটমল্লার, যৎ), 'আজি তোমার কাছে ভাসিয়া যায়' (ঝিঁঝিট, মধ্যমান) প্রভৃতি টপ্‌-খেয়াল।

এঁদের সমসাময়িক অতুলপ্রসাদ সেন-এর গানে যদিও ঠুংরী-রীতির প্রাধান্য

১। দিলীপকুমার রায়, 'সাঙ্গীতিকী', কলিকাতা (১৯৩৮) পৃঃ ১৬২।

দেখতে পাওয়া যায়, তথাপি তিনিও টপ-খেয়াল রচনা করেছেন। উদাহরণ-স্বরূপ 'পাগলা মনটা-রে তুই বাঁধ' (ভৈরবী, একতাল), 'কি আর চাহিব বল' (ভৈরবী, যৎ) প্রভৃতি গানের উল্লেখ করা যায়।

এই যুগের বিখ্যাত দুজন আলাপীয়া সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং আব্দুল করিম খাঁ (মৃত্যু—২ -১০-১৯৩৭)। তাঁদের আলাপে ছিল শান্তরস সমৃদ্ধ গভীর সুরব্যঞ্জনা। সেই আলাপ ছিল অন্তর্মুখী; সেই আলাপের মধ্য দিয়ে রাগের একটি ধ্যান-মূর্তি ফুটে উঠত। আব্দুল করিম খাঁ-ই খেয়ালে প্রথম আলাপ সংযোজিত করেন এবং তিনিই প্রথম খেয়ালে সরগম (স্বরাগ্রাম) ব্যবহার করেন।

বাংলাদেশে খেয়াল গানের প্রচলন হওয়ার পর ওস্তাদ নাবে খাঁ খেয়ালে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি বিলম্বিত, মধ্য এবং দ্রুত লয়ে খেয়াল গাইতেন। তাঁর পরে কলকাতায় আসেন ওস্তাদ কালে খাঁ এবং মৈজুদ্দিন খাঁ। বাংলাদেশে এই তিনজনই প্রথম খেয়ালে দ্রুত 'হল্‌কা' তান ব্যবহার করেন। গওহরজান এবং আরও অনেকে ওস্তাদ কালে খাঁ-র নিকট খেয়াল শিক্ষা করেন। বাংলাদেশে খেয়াল গান প্রচারের সঙ্গে যাঁদের নাম যুক্ত তাঁদের মধ্যে আগ্রার ফৈয়াজ খাঁ, গয়ার হনুমান দাসজী, নসিরুদ্দিন খাঁ, গোয়ালিয়রের খলিফা বাদল খাঁ, বেহালার রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণাঘাটের নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, গিরিজাশংকর চক্রবর্তী প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আরো দুটি রীতি হল টপ্পা এবং ঠুংরী। দেশী সঙ্গীত থেকে উৎপন্ন হলেও বাংলা গান হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের সং কটি রীতি থেকেই রূপ-রস আহরণ করে তাকে আপনার প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে গ্রহণ করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শোরী মিঞার টপ্পা রামনিধি গুপ্তের সঙ্গীতে প্রভাব ফেলেছে। তবে বাংলা ভাষার স্বভাবের সঙ্গে মার্গসঙ্গীতের উচ্চাঙ্গ-মেজাজকে নিধুবাবু অবশ্যই মিলিয়ে নিয়েছেন। শোরী মিঞার টপ্পার রীতির অনুসরণে রচিত নিধুবাবুর বাংলা টপ্পার সুরের ইন্দ্রজালই শুধু নেই, তাঁর টপ্পার কবিত্বশক্তিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কথা ও সুরের সমান সমান মর্যাদা দেবার জন্য রামনিধি গুপ্ত শোরী মিঞার টপ্পা রীতির সূক্ষ্ম ও দ্রুত গতির তান-কর্তব-এর পরিবর্তে মোটা দানার তান-এর প্রচলন করেন। নিধুবাবুর প্রবর্তিত সঙ্গীতধারার উত্তরসূরিদের মধ্যে শ্রীধর কথক এবং কালী মীর্জার নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই ধারার প্রভাব পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের সঙ্গীতেও দেখা যায়।

ঠুংরী গান যখন পুরোপুরি জাতে ওঠেনি অর্থাৎ বাঈজীদের 'ঠম্‌কী' 'ভাও' এর চত্বর পেরিয়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মার্গে প্রবেশপত্র পায়নি, তখনই বাংলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় ঠুংরীর বৈচিত্র্যকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, লোভনীয় চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে

সঙ্গীত-সাধনা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। সঙ্গীতে সুরমিশ্রণের তিনি সমর্থক ছিলেন বলেই ঠুংরী গানের মধ্যে তিনি প্রচুর সম্ভাবনার আভাষ পেয়েছিলেন।

বাংলাদেশে ঠুংরী রীতির প্রচলনে লক্ষ্ণৌ-এর নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ-র ভূমিকাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কু-শাসনের অভিযোগে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডালহৌসি তাঁকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়ে কলিকাতার উপকণ্ঠে মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত করেন। এর পর নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ এখানে দরবার বসান এবং বহু সঙ্গীতজ্ঞের সমাবেশ ঘটান। তাঁকে লক্ষ্ণৌ ঘরাণার উচ্চাঙ্গ ঠুংরী রীতির প্রবর্তক বলা হয়।

[illegible] শতাব্দীতে বাংলাদেশে ঠুংরীর প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে আর-একজন [illegible]ের নামও জড়িয়ে আছে। তিনি হলেন গোয়ালিয়র রাজবংশের গণপৎ রাও (ভাইয়া সাহেব)। তাঁর এবং তাঁর শিষ্য মইজুদ্দিন (বিখ্যাত ঠুংরী গায়ক)-এর কাছে ঠুংরীতে তালিম নিয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত বাঙালি সঙ্গীতজ্ঞ গিরিজাশংকর চক্রবর্তী। পরবর্তীকালে তারাপদ চক্রবর্তী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রতিভাধর গায়করা খেয়ালের সঙ্গে সঙ্গে ঠুংরী গানেরও সাধনা করে গেছেন। অতুলপ্রসাদ সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের গানে ঠুংরীর প্রভাব পড়েছে। এখনও বাংলা গানে ঠুংরীর প্রভাব অব্যাহত।

সঙ্গীতের ঘরাণা

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জগতে 'ঘরোয়ানা' বা 'ঘরাণা' কথাটি রীতিমত চালু আছে। সংস্কৃত 'গৃহ' শব্দটি প্রাকৃত ঘরহ>বাংলায় এবং হিন্দীতে 'ঘর' শব্দটির সৃষ্টি। এই ঘর বলতে শুধু প্রকোষ্ঠ নয়, সংসার, পরিবার বা বংশও বোঝায়। সঙ্গীতে 'ঘরাণা' শব্দের অর্থ বংশ-বৈশিষ্ট্য বোঝায়। অবশ্য বংশ শব্দটির অর্থ এখানে ব্যাপক অর্থাৎ শুধু পুত্র-কন্যা-পরম্পরায় নয়, শিষ্য-শিষ্যা পরম্পরায়ও এই বংশ-বৈশিষ্ট্য ধরা হয়ে থাকে।

এক-একটি ঘরাণায় সঙ্গীতের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য থাকে বলেই বিভিন্ন সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গীত বিভিন্ন আস্বাদন সৃষ্টি করে থাকে। গুরুর কাছে শিক্ষাকালীন গুরু দ্বারা শিক্ষা যথাযথভাবে অনুকরণ করে গাওয়াকে নায়কী বলে। এক্ষেত্রে গায়কের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। কিন্তু গুরুপরম্পরায় নায়কী শিক্ষালাভের পর গুরুমুখী প্রাপ্ত জ্ঞান এবং অন্যান্য গুণীদের সঙ্গীত শ্রবণ করে নিজ প্রতিভার দ্বারা রাগ-রাগিণীতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করাকে গায়কী বলা যায়। গায়কের এই যে নিজস্ব গাইবার ভঙ্গী, রীতি-পদ্ধতি বা স্টাইল—এই হচ্ছে ঘরাণার ব্যবহারগত অর্থ। গায়কের ভাবকল্পনায় বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব নতুন ভঙ্গী বা স্টাইলের সৃষ্টি করে এবং তা থেকেই শিষ্য-পরম্পরায় একটি ঘরাণা চলতে থাকে। 'কোন সঙ্গীতবিদ তাঁহার প্রতিভাগুণে কোনও নূতন পদ্ধতি অথবা নূতন অলংকারের

ধারা প্রয়োগ করিলে এবং সেই পদ্ধতি বা অলংকার-ধারা তাঁহার শিষ্য-পরম্পরায় প্রচলিত হইলে একটি ঘরাণার সৃষ্টি হইয়া থাকে।[১]

এই 'ঘরাণা' কথাটির সঙ্গে আবার 'খান্‌দানি'—এই বিশেষণটি যোগ করা হয়ে থাকে। 'খান্‌দান্'—এই ফার্শী শব্দটির অর্থ বংশ। এইজন্যই 'ঘরাণা' ও 'খান্‌দানি' কথা দুটি আবার সমার্থক বলে প্রতিভাত হয়। তবে, খান্‌দানীর প্রকৃত অর্থ বংশগৌরবযুক্ত। কিন্তু কিসের গৌরব? এ সম্পর্কে অমিয়নাথ সান্যাল বলেছেন, 'যে বংশের বা সঙ্গীত সম্প্রদায়ের কোন শিল্পী পূর্বেকার কোনও বাদশাহী আমলে শাহের সভায় যাতায়াত করতেন ও খাতির পেয়েছিলেন, সেই বংশের সৌভাগ্যের কারণেই পরবর্তী বংশধরেরা খানদানী মর্যাদা দাবী করতেন। পরে শব্দটি আর 'ঘরাণা' শব্দ প্রায় এক রকম অর্থে প্রয়োগ করা হতো। তখনকার কালে অর্থাৎ আমাদের কালে প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিল—তানসেনের দৌহিত্র বংশের প্রখ্যাত গুণী পুরুষ রামপুর ষ্টেটের ওস্তাদ উজীর খাঁ সাহেব। বংশানুক্রমে এই ধারা বাদশাহ ও শাহদের সংস্রব বজায় রেখেছিল। অথচ তানসেনের পুত্র-পৌত্রদের ধারা পশ্চিমদিকে চলে গিয়ে যে সেনী ঘরাণা বা পঁছাওবাজী সম্প্রদায় নামে অভিহিত হতো তাকে খানদানী বলা হতো না। কারণ বাদশাহ বা শাহদের সাক্ষাৎ পোষকতা থেকে ঐ সম্প্রদায় বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল।···খেয়ালীদের মধ্যে গোলাম আব্বাসের ঘরই খানদানী।'[২]

ঘরাণার মূল কথা হচ্ছে গায়ন-পদ্ধতির বিশেষ স্টাইল। যদিও কোনও কোনও বিশেষ গানের বাণীকে কোনও বিশেষ ঘরের গান বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, তথাপি গানের বাণীটাই প্রকৃতপক্ষে আসল নয়। সুর তথা রাগ ও তালের প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্যই ঘরাণার সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এই বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য সামাজিক রুচিও অনেকাংশে দায়ী। তাছাড়া এই গায়কী সৃষ্টির পিছনে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভিত্তিও অস্বীকার করা যায় না। ধ্রুপদ গান বিভিন্ন অঞ্চল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এক সময় বিভিন্ন শিল্পীর মাধ্যমে গৌড়হার, ডাগর, খাণ্ডার, নৌহার—এই চারটি গায়কী ঢং-এ আত্মপ্রকাশ করেছিল। 'অবশ্য এর সঙ্গে রীতি, বৃত্তি, রসাদিরও সম্পর্ক ছিল। বৈদর্ভী বা বৈদর্ভিকা, পাঞ্চালিকা, গৌড়ী প্রভৃতি রীতি, কৈশিকী, আরভটী, সাত্বত্যভিখ্যা প্রভৃতি বৃত্তি এবং শান্ত, শৃঙ্গারাদি রস পদ্ধতি বৈচিত্র্যের সৃষ্টির পক্ষে কতকগুলি কারণ বটে। তবে বিভিন্ন স্থানের বা শিল্পীর প্রকাশভঙ্গির পার্থক্যই ঘরোয়ানা-সৃষ্টির পিছনে মূল কারণ।'[৩]

গুরু-শিষ্য পরম্পরায় গানের স্টাইল চলতে থাকে। এ থেকে আবার শাখা সৃষ্টি হয়। প্রধানত দেখা গেছে যে কোনও বিশেষ স্থানকে কেন্দ্র করে যেমন শিল্পীর বিশেষ প্রকাশ বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ হয়, তেমনি সেই স্থানের নামানুসারেই

১। বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, 'ভারতীয় সঙ্গীতকোষ', কলিকাতা (১৩৭২) পৃঃ ৩২।

২। 'স্মৃতির অতলে', কলিকাতা (১৩৫৯), পৃঃ ৫০।

৩। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, 'সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান,' কলিকাতা (১৯৬৫), পৃঃ ৬১।

ঘরানা-র নামকরণ হয়ে থাকে। যেমন, গোয়ালিয়র ঘরানা, আগ্রা ঘরানা, দিল্লী ঘরানা, উদয়পুর ঘরানা, অত্রৌলী ঘরানা, বারাণসী ঘরানা, বিষ্ণুপুর ঘরানা, জয়পুর ঘরানা, কিরানা ঘরানা, পাঞ্জাব ঘরানা, অযোধ্যা ঘরানা, লক্ষ্ণৌ ঘরানা, বুন্দি ঘরানা, বিষ্ণুপুর ঘরানা প্রভৃতি।

একই ঘরানার যেমন বিভিন্ন শাখা পাওয়া যায়, তেমনি আবার একই স্থানের নামাঙ্কিত বিভিন্ন ঘরানাও পাওয়া যায়। যেমন সেনী ঘরানার তিনটি শাখা। আবার ধ্রুপদের দিল্লী ঘরানা যেমন আছে, তেমনি খেয়ালের দিল্লী ঘরানাও রয়েছে। শিল্পীর নামাঙ্কিত ঘরানার মধ্যে তানসেনী বা সেনী ঘরানা অনেকের মতে প্রধান।

ঘরানা-র বৈশিষ্ট্য

কণ্ঠসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীত দুয়েরই ঘরানা আছে। কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাণীর উচ্চারণের কায়দাই ঘরানার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন ঘরানায় গানের কথা বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। যেমন, কখনো অর্ধ-উচ্চারিত, কখনো অনুচ্চারিত, কখনো গমক সহকারে পরিবর্তিত, আবার কখনো বা ছেদ অথবা দম প্রযুক্ত—বাক্য রূপান্তরিত, কখনো আবার উচ্চারণের সময় অতিরিক্ত স্বরও (vowel) যোগ করা হয়। অবশ্য উচ্চারণের ব্যাপারে আঞ্চলিক প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তবে সুরের প্রয়োজনে গায়কেরা ব্যক্তিগত কায়দা দেখাতে গিয়ে উচ্চারণের পরিবর্তন করে থাকেন। গায়কীর কায়দায় উচ্চারণ স্বতন্ত্র হলে একই বাণী অন্যরূপে শোনায়। অবশ্য উচ্চারণ ছাড়া আরও কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ঘরানার স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে। সেগুলি হল : গমকের প্রাধান্য বা স্বল্পতা, অলংকারের প্রাধান্য বা কম ব্যবহার, বাঁটের অনুপস্থিতি, মীড়ের কাজের প্রাচুর্য, রাগ-রাগিণীর বিন্যাসের ক্ষেত্রে কোনও কোনও বিশেষ স্বরের বিশেষভাবে ব্যবহার বা বিশেষ স্বর বর্জন ঘরানার বৈশিষ্ট্য সূচিত করে। যেমন, পাতিয়ালা ঘরানার বিখ্যাত ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ মালকোষ রাগে পঞ্চম ব্যবহার করতেন, অথচ সনাতন রাগিণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে মালকোষ পঞ্চম বর্জিত। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ মালকোষ রাগে পঞ্চম প্রয়োগ করলেও ঐ রাগের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এখানেই তাঁর শৈল্পিক নৈপুণ্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাগের স্বর পরিবর্তন করে সনাতন রাগিণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনার প্রচেষ্টা হয়, রাগ পরিবর্তন হয়, না হয় নতুন রাগ সৃষ্টি হয়। যেমন 'বিভাস'। কোমল 'রে' এবং কোমল 'ধ' যুক্ত এই রাগ। শুদ্ধ 'রে' 'ধ' যুক্ত বা কোমল 'রে' ও শুদ্ধ 'ধ'যুক্ত 'বিভাস' রাগ আছে। 'রে' ও 'ধ' শ্রুতির পরিবর্তন করে গায়করা তিন-চার রকম বিভাস গাইতেন। তার মধ্যে একটির নাম 'দেশকার'।

'ললিত' রাগে কেউ তীব্র ধৈবত ব্যবহার করেছেন, কেউ কোমল ধৈবত ব্যবহার

করেছেন। তাতে ঠাটের পার্থক্য ঘটেছে (প্রথম ক্ষেত্রে মাড়োয়া এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পূর্বী ঠাট) অথচ দুই-ই ললিত রাগ হিসাবেই প্রচলিত।

ঘরাণার ক্ষেত্রে অনেক সময় গোঁড়ামিও লক্ষ করা যায় বা গায়কদের বিশেষ কোনও নির্দেশ মেনে চলতে হয়। যেমন গোয়ালিয়র ঘরাণায় ঠুংরী গাওয়া নিষিদ্ধ। আবার সেনী ঘরাণায় বাদ্যযন্ত্রীদেরও কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় অপরিহার্য।

ঘরাণার উদ্ভব

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস অতি প্রাচীন। কিন্তু 'ঘরাণা' সৃষ্টির ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। 'ঘরাণা'র সৃষ্টি হয় ধ্রুপদ সৃষ্টির আগে অর্থাৎ আলাউদ্দীন খিলজীর সময় থেকে। তারপর ধ্রুপদ এবং খেয়ালের বিভিন্ন ঘরাণার সৃষ্টি হতে থাকে। গমক, সূক্ষ্ম তান, মীড়, বোল্ বা বাণী, লয়—এইগুলির প্রয়োগের পার্থক্যই বিভিন্ন ঘরাণা সূচিত করেছে। আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে প্রধানত দুটি ঘরাণার উদ্ভব হয়: (১) কলাবন্ত ঘরাণা, (২) কাওয়াল ঘরাণা।

কলাবন্ত ঘরাণা—এই ঘরাণার প্রতিষ্ঠা করেন করেন বৈজুবাওরা। দক্ষিণ ভারতের নায়ক গোপাললাল্ এই ঘরাণাকে রক্ষা করেন।

কাওয়াল ঘরাণা—আলাউদ্দীন খিলজীর সভাগায়ক আমীর খসরু কাওয়াল ঘরাণার প্রবর্তক। বলা হয়ে থাকে যে, জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ শর্কী এ ঘরাণার পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

এই ঘরাণা দুটি যখন সৃষ্টি হয় তখন যে সব বিখ্যাত গায়ক এবং বাদকরা ছিলেন. তাঁরা নিজেদের এই দুই ঘরাণায় বিভক্ত করেন।

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মত অনুসারে তৃতীয় ঘরাণার সূচনা করেন সানাই ও তবলা বাদকেরা। চতুর্থ ঘরাণার সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, রাজদরবারে মহিলা-গায়ক এবং নর্তকীদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে-সমস্ত বাদকেরা তাঁদের সঙ্গে সঙ্গীত করতেন তাঁরাই চতুর্থ ঘরাণার প্রবর্তন করেন। তৃতীয় ও চতুর্থ ঘরাণার ওস্তাদদের বল হত মীরাসি এবং ঢাঢ়ী।[১]

সেনী ঘরাণা

তানসেনের মৃত্যুর পর সেনী ঘরাণার উদ্ভব হয়। তবে এই ঘরাণার তিনটি শাখা: (১) প্রথম শাখার উদ্ভব হয় তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁ

১। 'With the increase of the number of female singers and dancing girls in the Royal court, there arose a fourth gharana of the instrumentalists acompaning them. The Ustads of the third and the fourth gharana were called Mirasis and Dhadis.'—B. K. Roychoudhury, 'Hindusthani Music and Mian Tansen', Calcutta, p. 25.

থেকে। এই ঘরাণার গায়করা গৌড়বাণী ধ্রুপদের গায়ক। (২) দ্বিতীয় শাখার উদ্ভাবক তানসেনের অপর পুত্র সুরত সেন। এই ঘরাণার গায়করা ডাগরবাণী ধ্রুপদ-এর গায়ক। সুরত সেনের বংশধরেরা জয়পুরে বাস করতে থাকেন। (৩) তৃতীয় শাখার শুরু তানসেনের জামাতা (সরস্বতীদেবীর স্বামী) মিশ্রি সিং থেকে। মিশ্রি সিং-এর বংশধরেরা প্রধানত বীণকার। তাঁরা ডাগরবাণী এবং খাণ্ডারবাণী—এই দুটি বাণীর ধ্রুপদ পরিবেশন করতেন।

বিভিন্ন ঘরাণা

সেনী ঘরাণার উপরোক্ত তিনটি শাখা ছাড়া আরও দুটি বিখ্যাত ঘরাণার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি ঘরাণার প্রতিষ্ঠা করেন ব্রিজচাঁদ ও সুরদাস। মথুরাকে কেন্দ্র করে এই ঘরাণা গড়ে ওঠে, অপর ঘরাণাটির স্রষ্টা চাঁদ খাঁ ও সুরজ খাঁ। এই ঘরাণা হল পাঞ্জাবে প্রচলিত ধ্রুপদের তিলমনড়ী ঘরাণা। ক্রমশ আরও ঘরাণা গড়ে উঠতে থাকে। এই সমস্ত ঘরাণার মধ্যে কোনওটি ধ্রুপদের ঘরাণা, কোনওটি খেয়ালের ঘরাণা, কোনওটি-বা খেয়াল এবং ধ্রুপদের ঘরাণা। আবার কণ্ঠসঙ্গীতের ঘরাণার পাশাপাশি যন্ত্রসঙ্গীতের ঘরাণাও গড়ে ওঠে। বিখ্যাত বীণকার এবং সঙ্গীতজ্ঞ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর 'Hindusthani Music and Mian Tansen' নামক গ্রন্থে পনেরোটি ঘরাণার উল্লেখ করেছেন:

(১) ধ্রুপদ এবং রবাব-এর সেনী ঘরাণা। এই ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মৌ এবং বারাণসীর জাফর খাঁ, প্যার খাঁ এবং বাসৎ খাঁ।

(২) সেনী-বীণকার-ঘরাণা। এর প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মৌর নির্মল শাহ।

(৩) কাওয়াল ঘরাণা। এই ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মৌ এবং গোয়ালিয়রের বড়ে মহম্মদ খাঁ কাওয়াল।

(৪) খেয়ালের গোয়ালিয়র ঘরাণা। বিখ্যাত খেয়াল গায়ক হস্সু খাঁ এবং নাথ্থু খাঁ এই ঘরাণার উদ্ভাবক।

(৫) ধামারের আগ্রা ঘরাণা। এই ঘরাণার স্রষ্টা জাফর খাঁ (ধামার)-এর বংশধরেরা। তাঁরা পরবর্তীকালে শাহ সদারঙ্গ-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

(৬) ধ্রুপদের বেতিয়া ঘরাণা। লক্ষ্মৌ-এর হায়দার খাঁ সেনীর শিষ্যবৃন্দ এই ঘরাণার সৃষ্টি করেন। এঁরা বারাণসীর কথক। এই ঘরাণার সঙ্গে কম্পীর মুসলমান ওস্তাদদের নামও জড়িত।

(৭) ধ্রুপদের বিষ্ণুপুর ঘরাণা। এই ঘরাণার স্রষ্টা বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্য।

(৮) পাঞ্জাবে প্রচলিত ধ্রুপদের তিলমনড়ী ঘরাণা।

(৯) লাহোর ঘরাণা। শাহ সদারঙ্গ-এর শিষ্য পাঞ্জাবী খেয়াল গায়করা এই ঘরাণার প্রতিষ্ঠা করেন।

(১০) খেয়াল এবং ধ্রুপদের অতরৌলী ঘরাণা। মথুরার ব্রাহ্মণরা এই ঘরাণার সৃষ্টি করেন। এঁরা পরবর্তীকালে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নেন।

(১১) ডাগর ঘরাণা। বিখ্যাত বাঙ্গরাম খাঁ ডাগর এই ঘরাণার প্রবর্তক। তিনি মথুরার পুরোহিতদের বংশধর।

(১২) সেতারের সেনী ঘরাণা। এই ঘরাণার প্রতিষ্ঠা হয় জয়পুরে। প্রতিষ্ঠাতার নাম অমৃত সেন।

(১৩) শাহারানপুরের সরোদ ঘরাণা। নির্মল শাহ সেনীর পুত্র এবং ওমরাও খাঁ-র শিষ্যবৃন্দ এই ঘরাণার স্রষ্টা।

(১৪) বাসৎ খাঁ সেনী-র শিষ্য নিয়ামতুল্লা খাঁ একটি সরোদ ঘরাণা সৃষ্টি করেন।

(১৫) লক্ষ্ণৌ-এর সেতার ঘরাণা। এই ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা ওমরাও খাঁ সেনীর শিষ্য মহম্মদ খাঁ।

সেনী ঘরাণার একটি শাখার স্রষ্টা বিলাস খাঁ। বিলাস খাঁ-র পৌত্র করিম সেনের দুই পুত্র সুধর খাঁ ও রাজরস খাঁ। রাজরস খাঁ-র পুত্র মসদী খাঁ-র কথা আগেই বলা হয়েছে। সুধর খাঁ-র পুত্র হাসান খাঁ এবং তাঁর পুত্র গোলাপ খাঁ—দুজনেই উত্তম ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন। গোলাপ খাঁ-র তিন পুত্র ছজ্জু খাঁ, জ্ঞান খাঁ এবং জীবন খাঁ। এদের মধ্যে ছজ্জু খাঁ ছিলেন রবাব যন্ত্রে পারদর্শী এবং জ্ঞান খাঁ ও জীবন খাঁ ছিলেন ধ্রুপদী। এঁরাই দিল্লীর দরবারের শেষ সঙ্গীতজ্ঞ।

দিল্লীর মোগল দরবার ভেঙে গেলে তানসেনের নিজের বংশধররা পূর্বদিকে চলে যান এবং তার শিষ্যবংশীয় সঙ্গীতজ্ঞরা রাজপুতনার রাজাদের সভায় স্থান লাভ করেন। তানসেনের পুত্রবংশীয় রবাবীগণ কাশীধামে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং নিকটবর্তী হিন্দু ও মুসলমান নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। এই সময় (অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে) অযোধ্যার নবাব, বেতিয়ার রাজা, রেওয়ার রাজা, কাশীর রাজা প্রভৃতি সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

ইতিপূর্বে যে ছজ্জু খাঁ, জ্ঞান খাঁ ও জীবন খাঁ-র কথা বলা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে জ্ঞান খাঁ ছিলেন নিঃসন্তান। জীবন খাঁ-র তিন পুত্র বাকর খাঁ, হায়দার খাঁ, বাহাদুর খাঁ। এঁদের মধ্যে বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ইতিপূর্বে বিষ্ণুপুরে চলে আসেন। হায়দার খাঁ ও একজন সুনিপুণ ধ্রুপদী ছিলেন।

ছজ্জু খাঁ-র তিন পুত্র—জাফর খাঁ, প্যার খাঁ এবং বাসৎ খাঁ। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে এই ত্রিরত্নের নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। গীত এবং বাদ্যে সমসাময়িক কালে তাঁরা ছিলেন সবার শীর্ষে। ছজ্জু খাঁ-র পূর্বপুরুষ ধ্রুপদ গেয়েই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁরা যন্ত্রসঙ্গীতে পারদর্শী হলেও যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান বিশেষ করতেন না। ছজ্জু রবাব যন্ত্রের চর্চা করেন এবং রবাবের কয়েকটি নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। জাফর খাঁ, প্যার খাঁ পিতা ছজ্জুর কাছে সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করেন। বাসৎ খাঁ-র গুরু ছিলেন তাঁর

[illegible] জ্ঞান খাঁ। এছাড়া তানসেনের দৌহিত্র বংশীয় নির্মল শাহ-এর কাছেও এই তিন ভাই সঙ্গীতশিক্ষা গ্রহণ করেন।

বাসৎ খাঁ-র নাম কলকাতা শহরে এক সময়ে খুবই পরিচিত ছিল। লক্ষ্ণৌ-এর দরবার ভেঙে যাওয়ার পর নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্‌-র মেটিয়াবুরুজ দরবারে স্থান লাভ করেন তিনি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে জাফর খাঁ, প্যার খাঁ, বাসৎ খাঁ—এই তিন ভাই-ই লক্ষ্ণৌ দরবারে ছিলেন। তাছাড়া ওমরাও খাঁ, বীণকার গোলাম মহম্মদ খাঁ এবং কাওয়াল ঘরের বিশিষ্ট খেয়াল গায়কেরাও লক্ষ্ণৌদরবারে ছিলেন। কলকাতার রাজা হরকুমার ঠাকুর বাসৎ খাঁ-র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হরকুমার ঠাকুর তাঁকে 'সঙ্গীত নায়ক' উপাধি দান করেন। এই কলকাতায় অবস্থান কালেই জাফর খাঁ-র পৌত্র কাশিম আলী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বিখ্যাত সরোদবাদক নিয়ামতুল্লাও তাঁর শিষ্য।

বাসৎ খাঁ যন্ত্রসঙ্গীতে সিদ্ধ ছিলেন। বীণা এবং রবাব এই উভয় যন্ত্রের বাদন-প্রণালীর মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি সুরশৃঙ্গার বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করেন। প্যার খাঁও সুরশৃঙ্গার বাজাতেন। জাফর খাঁ এবং প্যার খাঁ সঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বাসৎ খাঁ-র শিক্ষা ছিল নানামুখী। তিনি শুধু যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীতেই যে পারদর্শী ছিলেন তা নয়। সংস্কৃত ও পার্শী ভাষায়ও তিনি পণ্ডিত ছিলেন। দৈব দুর্বিপাকে তাঁর হাত পঙ্গু হয়ে যাওয়ায় রবাব বাদন তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু আজীবন তিনি কণ্ঠসঙ্গীত সাধনাকে অক্ষুন্ন রেখেছিলেন।

বাসৎ খাঁ-র শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন কাশেম আলী, নিয়ামতুল্লা খাঁ (সরোদ), হরকুমার ঠাকুর প্রমুখ। বাসৎ খাঁ-র তিন পুত্র—আলী মহম্মদ, মহম্মদ আলী, রিয়াসৎ আলী। প্রথমোক্ত দুজনের সঙ্গে বাংলাদেশের সঙ্গীতজগতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। আলী মহম্মদের শিষ্যদের মধ্যে যেমন রয়েছেন পাটনার প্যারে নবাব খাঁ, বারাণসীর মিঠাইলাল, জলন্ধরের মীর সাহেব, তেমনি আছেন বাংলাদেশের তারাপ্রসাদ ঘোষ, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, নাসে খাঁ, রামসেবক মিশ্র প্রভৃতি। মহম্মদ আলী খাঁ-র শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন গয়ার কানাইলাল ঢেড়ী, ঠাকুর নবাব আলী খাঁ (এঁর শিষ্য মুর্শিদাবাদের কাদের বক্স, নবাব সাদৎ আলী খাঁ, ছম্মন সাহেব), গয়ার বিহারীলাল পাণ্ডা এবং বাংলাদেশের গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দবীর আলী খাঁ প্রভৃতি।

প্যার খাঁ-কে শুধুমাত্র গায়ক বা বাদক বলা চলে না। তিনি ছিলেন উঁচুদরের সঙ্গীতস্রষ্টা। তিনি 'তিলক-কামোদ' নামক গভীর অথচ সুমধুর রাগ সৃষ্টি

১। ওয়াজেদ আলী শাহ-র বিরুদ্ধে কু-শাসনের অভিযোগ এনে লর্ড ডালহৌসি তাঁকে রাজ্যচ্যুত করেন এবং ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে বার্ষিক বারো লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়ে কলকাতার উপকণ্ঠে মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত করেন।

করেন। 'দেশ', 'বিহাগ' ও 'কামোদ' এই তিন রাগের মিশ্রণে এই রাগিণীর সৃষ্টি। নতুন সৃষ্টিতে প্যার খাঁ ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি রবাবী গাম্ভীর্যের সঙ্গে মিশিয়েছিলেন বীণার ঝংকার, ধ্রুপদের ধীর উদাত্ত রসের সঙ্গে মিশিয়েছিলেন হোরির লালিত্য। এই অপূর্ব মিশ্রণ তাঁর সঙ্গীতকে করেছিল আকর্ষণীয়।

প্যার খাঁ-র যুগপৎ সুরসাধক ও প্রতিযোগী ছিলেন তানসেনের দৌহিত্র বংশের বীণকার ওমরাহো খাঁ। এঁর দুই পুত্র আমীর খাঁ ও রহিম খাঁ। ওমরাহো খাঁ-র সঙ্গীত-পদ্ধতি ছিল প্যার খাঁ-রই অনুরূপ, অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে লীলায়িত ছন্দ।

প্যার খাঁ-র শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন বেতিয়ার আনন্দকিশোর, গুরুপ্রসাদ মিশ্র (গুরুপ্রসাদের দুই শিষ্য—লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার), নবাব হসমৎ জং, বখ্‌ তাওজী, বাহাদুর সেন (ছজু খাঁ-র দৌহিত্র), শিবনারায়ণ মিশ্র।

বেতিয়ার 'কথক' ঘরাণা

প্যার খাঁ রেওয়ার অধিপতি মহারাজ বিশ্বনাথ সিংহের দরবারে যেতেন। বিশ্বনাথ সিংহ সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন জাফর খাঁ-র শিষ্য। প্যার খাঁ-র শিষ্য বেতিয়ার মহারাজ আনন্দকিশোর একজন দক্ষ ধ্রুপদী ছিলেন। তিনি নিজে ধ্রুপদ রচনা করতেন এবং কথক ব্রাহ্মণদের সঙ্গীতশিক্ষা দিতেন। বেতিয়ার কথক ঘরাণার ওস্তাদরা তাঁরই শিষ্য বংশের।

উপরে উল্লিখিত বখ্‌তাওজী, শিবনারায়ণ মিশ্র, গুরুপ্রসাদ মিশ্র প্রভৃতি বেতিয়ার কথক ঘরাণার সঙ্গীতজ্ঞ। কলকাতার বিখ্যাত ধামার গায়ক বিশ্বনাথ রাও শিবনারায়ণ মিশ্রের শিষ্য। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের অন্যতম গুরু শ্যামসুন্দর মিশ্রও এই শিবনারায়ণ মিশ্রের শিষ্য। এছাড়া সঙ্গীতাচার্য রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী, বেতিয়ার শিবনারায়ণ মিশ্রও গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে খেয়াল গান শিক্ষা করেন।

তানসেনের কন্যাবংশ

তানসেনের কন্যাবংশ শুরু হয় তানসেন কন্যার দ্বিতীয় পুত্র হাসান খাঁ থেকে। এই বংশের লাল খাঁ-র পুত্র নিয়ামৎ খাঁ (সদারঙ্গ) খেয়াল গানের প্রচারক হিসাবে বিখ্যাত। নিয়ামৎ খাঁ-র দুই পুত্র: ফিরোজ খাঁ (অদারঙ্গ) এবং ভূপৎ খাঁ (মহারঙ্গ)। মহারঙ্গের দুই পুত্র-জীবন শাহ এবং প্যার খাঁ। জীবন শাহর দুই পুত্র ছোট নবাৎ খাঁ (রসবীণ খাঁ বা রঙ্গারঙ্গ) ও নির্মল শাহ বীণকার হিসাবে সামান্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। নির্মল শাহ ধ্রুপদের চার বাণীতেই পারদর্শী ছিলেন। তিনি শিষ্যদের খেয়াল এবং ধ্রুপদ দুই-ই

শিক্ষা দিতেন। রসবীণ খাঁ-র বাদ্যে ছিল ললিত-মধুর, আর নির্মল শাহর বাদ্যে ছিল উদাত্ত ভাবের রস।

নির্মল শাহ-র প্রিয় শিষ্য তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, ওমরাও খাঁ। এই ওমরাও খাঁ-র বহু শিষ্য ছিল। তাঁদের মধ্যে কুতুবুদ্দৌলা, গোলাম মহম্মদ খাঁ এবং তাঁর পুত্র সাজ্জাদ মহম্মদ খাঁ, বান্দার নবাব হসমৎ জং প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে সাজ্জাদ মহম্মদ খাঁ দীর্ঘকাল কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভা-বাদক ছিলেন।

জয়পুর বা বিকানীর ঘরানা

তানসেনের বংশের যাঁরা সেতারী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন, তাঁরাই জয়পুর বা বিকানীর ঘরাণার প্রবর্তক। এই ঘরাণার বৈশিষ্ট্য হল যন্ত্রসঙ্গীতের ঢং-এ কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন। তানসেন বংশের অমৃত সেন সেতারে অপূর্ব পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। তাঁর পরে নিহাল সেন সেতারী হিসাবে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন।

মনরঙ্গ বংশজাত আহমদ আলী খাঁ-র থেকে এই ঘরাণা পরিচিতি লাভ করে। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে এই ঘরাণার একজন উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতজ্ঞ।

জয়পুর ঘরাণার কণ্ঠসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য হল: (১) গানের সংক্ষিপ্ত বন্দিশ, (২) বক্রতান এবং আলাপে ছোট ছোট তান, (৩) খোলা আওয়াজ।

আগ্রা ঘরানা

অলক দাস, খলক দাস, সরঙ্গ দাস এবং মলক দাস—এঁরা চার ভাই। এঁদের মধ্যে খলক দাস এবং মলক দাস সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। এঁরা দুজনই আগ্রা ঘরাণার স্রষ্টা। এই ঘরাণার প্রসিদ্ধ গায়কদের মধ্যে আমীর বক্স (এঁর শিষ্য—কিরাণাদাসী, কেরামত্ খাঁ), নথন খাঁ, গুলাম আব্বাস খাঁ, লতাফত হোসেন, ফৈয়াজ খাঁ প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে ফৈয়াজ খাঁ-র খ্যাতি ছিল ব্যাপক, মহীশুরের মহারাজা তাঁকে 'আফ্তাব্-এ-মৌসিকি' অর্থাৎ সঙ্গীতের ভাস্কর উপাধি দান করেন। ফৈয়াজ খাঁ ছিলেন গোলাম আব্বাস খাঁ-র শিষ্য।

আগ্রা ঘরাণার বিশেষত্ব হল—(১) 'নোম তোম' শব্দ সহযোগে আলাপ, (২) খোলা আওয়াজ, (৩) খেয়াল গায়কীর সঙ্গে ধ্রুপদ ধামার গাওয়া; (৪) বোলতানের বিশেষ ব্যবহার।

গোয়ালিয়র ঘরাণা

গুলাম রসুলের কন্যা বংশের ধারা থেকেই গোয়ালিয়র ঘরাণার উদ্ভব হয়েছে। কাওয়াল বংশে গুলাম রসুলের জন্ম হয়। শাহ সদারঙ্গ যে দুজন কাওয়াল বালককে প্রতিপালন করেছিলেন গুলাম রসুলকে তাদের একজন বলে নির্দেশ

করা হয়ে থাকে, অপরজন মিঞা জানী। গুলাম রসুল লক্ষ্ণৌ-এ বাস করতেন। তিনি কাওয়ালী রীতির সঙ্গে সদারঙ্গ প্রবর্তিত রীতির মিশ্রণে খেয়াল গাইতেন। গুলাম রসুলের দুই দৌহিত্র শক্কর এবং মক্খন পীর বক্স (নত্থন পীরবক্স) ছিলেন গোয়ালিয়রের অধিবাসী। নত্থন পীরবক্স ধ্রুপদী গায়ক হলেও সদারঙ্গ প্রবর্তিত খেয়াল গাইতেন। তাঁর পৌত্র হদ্দু, হস্সু ও নথ্থু খেয়াল গানে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই তিন বংশ থেকে খেয়ালের তিনটি রীতির প্রচলন হয়— কাওয়ালী রীতি, খেয়াল রীতি এবং খেয়ালের ধ্রুপদী রীতি। এই শেষোক্ত রীতির মধ্যে রয়েছেন নিসার হোসেন, বিষ্ণু দিগম্বর, বিনায়ক রাও পট্টবর্ধন এঁদের প্রচারিত সূত্রে প্রবাহিত গোয়ালিয়র ঘরাণার বৈশিষ্ট্য হল :

খোলা আওয়াজ, (২) ধ্রুপদাঙ্গের খেয়াল, (৩) সপাট তান, (৪) বোলতান লয়কারী, (৫) গমকের প্রয়োগ।

কিরাণা ঘরাণা

যন্ত্রসঙ্গীতে কিরাণার প্রতিষ্ঠাতা বন্দে আলি খাঁ। ইনি তানসেনের বংশের নির্মল শাহ-এর শিষ্য। কণ্ঠসঙ্গীতে কিরাণা ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতা বাজিদ আলি। কিরাণা ঘরাণার (কণ্ঠসঙ্গীত) প্রসিদ্ধ গায়কদের মধ্যে আব্দুল করিম, আব্দুল ওয়াহিদ, হীরাবাঈ বরোদেকার, সরস্বতী বাঈ রাণে, ভীমসেন যোশী, আমীর খাঁ, শ্যামলাল ক্ষেত্রী, মৈজুদ্দীন খাঁ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এই ঘরাণার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল : (১) স্বর লাগাবার বিশেষ ঢং, (২) এক একটি স্বর ধীরে ধীরে ক্রমশ প্রয়োগ, (৩) আলাপ প্রধান গায়কী, (৪) ঠুংরী অঙ্গ।

দিল্লী ঘরাণা

দিল্লী ঘরাণা-র প্রবর্তক তানরস খাঁ। এই ঘরাণার বিখ্যাত ওস্তাদ হলেন জহুর খাঁ, আলতাফ হোসেন, আজমত্ হোসেন প্রভৃতি।

এই ঘরাণার বিশেষ লক্ষণ হল : (১) তৈরী তান, (২) খেয়ালের কলাপূর্ণ বন্দিশ, (৩) দ্রুতলয়ে বোলতান।

অত্রৌলি ঘরাণা

নথ্থু খাঁ এই ঘরাণার প্রবর্তক। এই ঘরাণার প্রসিদ্ধ ওস্তাদদের মধ্যে আল্লাদিয়া খাঁ, নত্থন খাঁ, নাসিরুদ্দিন, বদরুদ্দিন, কেশরবাঈ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অত্রৌলি ঘরাণার বৈশিষ্ট্য হল : (১) বক্রগতি সম্পন্ন গায়কী, (২) বোল অঙ্গের বিশেষ যোগ্যতা, (৩) অপ্রচলিত রাগ পরিবেশন, (৪) রাগের চলনে বিভিন্ন তানের প্রয়োগ, (৫) বিলম্বিত লয়ের খেয়াল।

পাঞ্জাব (আলিয়াফত্তু) ঘরাণা

পাঞ্জাব ঘরাণার প্রতিষ্ঠাতার নাম বাবা কালিদাস। এই ঘরাণার বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দের মধ্যে আলী বক্স, কালে খাঁ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাঞ্জাব ঘরাণার বৈশিষ্ট্য হল : (১) খেয়ালের কলাপূর্ণ বন্দিশ, (২) সংক্ষিপ্ত খেয়াল, (৩) দ্রুত তানের কলাত্মক প্রয়োগ, (৪) টপ্পা এবং ঠুংরী অঙ্গে বিশেষ দক্ষতা।

বিষ্ণুপুর ঘরানা

তানসেন-এর পুত্র-বংশের জীবন খাঁ-র তৃতীয় পুত্র বাহাদর খাঁ থেকেই বিষ্ণুপুর ঘরাণার সৃষ্টি। বাংলাদেশের অন্তত তিন জন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের লিখিত পুস্তক থেকে একথা জানা যায়।[১] রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বিষ্ণুপুর' নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত তথ্য ছাড়াও অন্যত্র বাহাদুর খাঁ-র সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

"বাহাদুর খাঁ-এর কাছে যে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ছিল তাতে যে সমস্ত গান ছিল তার অধিকাংশই তানসেনের। প্রথম পৃষ্ঠায় শোভিত ছিল তানসেনের নিজের হস্তাক্ষর। এই পাণ্ডুলিপিটি তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। এই পাণ্ডুলিপিকে বাহাদুর খাঁ পবিত্র বলে মনে করতেন। একাশী বছর বয়সে তিনি তীর্থ ক'রতে মক্কায় যান এবং তিরাশী বছর বয়সে রামপুরে তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে যে উক্তি করেন তা স্মরণীয় : যে সঙ্গীত আমি রেখে যাচ্ছি তার কোনো ক্ষয় নেই এবং অনন্তকাল ধরে তা বিকশিত থাকবে। যে সঙ্গীত আমি প্রচার করেছি সে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আমার মহান পূর্বপুরুষ তানসেনের ঐতিহ্য।"[২]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাহাদুর খাঁ তানসেনের ধ্রুপদের যে ঐতিহ্য বহন করেছিলেন তারই ওপরে বাংলাদেশের বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদের এক নতুন ঘরোয়ানা গড়ে ওঠে। এই বিষ্ণুপুর বহু পূর্ব থেকেই সঙ্গীতচর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। বিষ্ণুপুরে বাহাদুর খাঁ-র প্রধান শিষ্য গদাধর চক্রবর্তী এবং তাঁর থেকেই বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদ সঙ্গীতের ধারা প্রবাহিত। এই সঙ্গীতধারার যদুভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ভারতজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

এই বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতধারা কলকাতার ঠাকুরবাড়িকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-শিক্ষকদের অন্যতম ছিলেন যদুভট্ট। রবীন্দ্রনাথের পিতা রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীকে আমন্ত্রণ করে এনে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত করেন। এঁর অবদান সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করে। ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের শেষ সঙ্গীত-শিক্ষকদের অন্যতম এই রাধিকা-

---

১। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিষ্ণুপুর,' কলিকাতা (১৩৪৮), পৃঃ ৩২; বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান', কলিকাতা (১৩৬৩), পৃঃ ৩৬; বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, 'ভারতীয় সঙ্গীতকোষ', কলিকাতা (১৩৭২), পৃঃ ১৬৮।

২। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত 'তানসেন উৎসব'-এ সঙ্গীত রত্নাকর রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার অংশ।

প্রসাদ গোস্বামী। যদুভট্ট এবং রাধিকাপ্রসাদ—এই দুজনের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। যদুভট্ট সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'এ রকম ওস্তাদ বাংলাদেশে জন্মায় নি।' রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী সম্পর্কে তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 'রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগিণীর রূপজ্ঞান ছিল তা নয়, তিনি গানের মধ্যে বিশেষ একটি রসসঞ্চার করতে পারতেন। সেটা ছিল ওস্তাদির চেয়ে বেশী।'[১]

রাধিকাপ্রসাদ, যদুভট্ট তো তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষকই ছিলেন। সুতরাং বলা যায় 'রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ ও ধামারের ঘরোয়ানা ছিল বিষ্ণুপুর ধারার অনুবর্তী'। বিষ্ণুপুর-ঘরোয়ানা বা ঘরাণায় সঙ্গীতের ছিল একটি নিজস্ব ঢঙ্ ও একটি নিজস্ব গতি। রাগে ও বিকাশভঙ্গিতে ছিল একটু পৃথক ও বিশিষ্ট ভাব,—যদিও তাঁর সৃষ্টির উৎস ছিল পশ্চিমী ঘরাণার সঙ্গীত।'[২]

বাহাদুর খাঁ যেমন কণ্ঠসঙ্গীতের দিক থেকে বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতের ধারা সৃষ্টি করেন, তেমনি ওস্তাদ পীরবক্স তাঁর শিষ্যদের মৃদঙ্গ বাদ্যে পারদর্শী করে তোলেন। রামমোহন চক্রবর্তী তাঁর শিষ্য। মৃদঙ্গ বাদ্যে বিষ্ণুপুরের আর যাঁরা সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জগৎচাঁদ গোস্বামী, জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপতি অধিকারী, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ধ্রুপদ এবং খেয়াল গানের যে ধরনের ঘরাণা সৃষ্টি হয়েছিল, টপ্পা বা ঠুংরীতে সেই ধরনের ঘরাণা দেখা যায় না। তবে বিশেষ স্থানে প্রচলিত গান একটা বিশেষ ঘরাণার মতো পরিচিত হতে পারে। যেমন বেণারসী ঠুংরী, লক্ষ্ণৌ ঠুংরী প্রভৃতি। তাছাড়া গায়কীর পার্থক্য তো থাকেই।

১। 'রবীন্দ্রসঙ্গীত', শান্তিদেব ঘোষ, কলিকাতা (১৩৬২), পৃঃ ৩৭।
২। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, 'সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান', কলিকাতা (১৩৬৫), পৃঃ ৬৬।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস অতি প্রাচীন। বৈদিক যুগ বা তার আগে সিন্ধু সভ্যতার যুগ (খ্রিঃ পূঃ ৩০০০-২৫০০ অব্দ) থেকে এই ইতিহাস শুরু। এই সঙ্গীতই বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতবর্ষে। এখন যেভাবে আমরা উত্তর ভারতীয় (হিন্দুস্থানী) এবং দক্ষিণ ভারতীয় (কর্ণাটক) এই দুই নামে দুই সঙ্গীত-পদ্ধতিকে চিহ্নিত করেছি, চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে তা এভাবে চিহ্নিত হয়নি। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীত সম্পর্কিত অধ্যায়গুলিতে (২৮-৩৬) যে আলোচনা রয়েছে সেখানেও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত দুটি পৃথক ধারা হিসেবে আলোচনা করা হয়নি।

খ্রিস্টীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে ভারতীয় সঙ্গীতে রাগ নাম কল্পনা, রাগরূপ, রাগ বিকাশের মধ্য দিয়ে রাগের আভিজাত্য সৃষ্টি হয়। সারা ভারতের সঙ্গীত ক্ষেত্রেই শুদ্ধি যজ্ঞের সূচনা হয়। মতঙ্গের বৃহদ্দেশীতে রাগগুলির নাম লিপিবদ্ধ হওয়া থেকেই তা বোঝা যায়। এই শুদ্ধি যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল আর্য ও অনার্য অধিবাসীদের দেশীয় ও জাতীয় গানের সুরগুলিকে পরিশুদ্ধ করে অভিজাত রাগগোষ্ঠিভুক্ত করা। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের দেশীয় ও জাতীয় সুরগুলি এই সময় সংস্কৃত হয়ে অভিজাত রাগ

তালিকায় স্থান পেয়েছিল। রাগের এই তালিকায় উত্তর ও দক্ষিণ—এই ধরনের কোনও চিহ্ন ছিল না।

তামিল নাটক 'শিলাপ্পাদিকরম্'-এ দক্ষিণ ভারতের প্রধান সঙ্গীতের উল্লেখ আছে। এতে বট্টু (অনবদ্ধ), আসই (লয়), তুক্কু (গুরু), অলব (প্লুত) এবং চীর (অনবদ্ধ) প্রভৃতি কাল বা তালের পরিচয় আছে। তামিল সাহিত্য প্রধানত ইয়াল, ইসাই ও নাটকম—এই তিন ভাগে বিভক্ত এবং ষড়্জাদি সাতটি লৌকিক স্বরের নাম কুরাল, তুতাম্, কৈক্কলাই, উলাই, ইলাই, বিলারি ও তারম। এরা নামে পৃথক কিন্তু এদের প্রয়োগ-পদ্ধতি আলাদা ছিল না।

চালুক্য রাজাদের রাজত্বকালে রচিত রাজা সোমেশ্বর-এর 'মানসোল্লাস' গ্রন্থে (১১৩১ খ্রিঃ) সঙ্গীত সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। এই গ্রন্থে আলোচিত গীতবিনোদ (গীতাধ্যায়) ও বাদ্যবিনোদ (বাদ্যাধ্যায়) পার্শ্বদেবের 'সঙ্গীত সময় সার' (খ্রিঃ ৯ম থেকে ১১শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত) এবং শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থে আলোচিত গীত ও বাদ্য অধ্যায়েরই অনুরূপ। সুতরাং দেখা যায় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে গীতি, রাগ ও বাদ্যের অভিজাতরূপ, গতি ও বিকাশ প্রায় এক ধরনেরই ছিল। এর পরে আমরা পাই শার্ঙ্গদেবকে (১২১০-৪৭ খ্রিঃ)। শার্ঙ্গদেব দেবগিরি রাজ্যের যাদব বংশীয় রাজসভার প্রধান সঙ্গীতাচার্য ছিলেন। এই সময় মারাঠা সাম্রাজ্য দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই জন্যই অনুমান করা হয়ে থাকে যে শার্ঙ্গদেব দক্ষিণ ও উত্তর ভারত—এই দুই অঞ্চলের সঙ্গীত ধারারই সংস্পর্শে আসেন। তবে তাঁর রচিত গ্রন্থ 'সঙ্গীত রত্নাকর'-এ উত্তর ও দক্ষিণ—এমন পার্থক্য তিনি নির্দেশ করেননি।

উত্তর ভারতীয় (হিন্দুস্থানী) এবং দক্ষিণ ভারতীয় (কর্ণাটক)—এই দুই পৃথক নামে ভারতীয় সঙ্গীতের দুটি পৃথক ধারা চিহ্নিত হয় শার্ঙ্গদেবের প্রায় ১০০ বছর পরে। তখন খিলজী সুলতানরা দিল্লীর মসনদে সমাসীন। এই সময় চালুক্যরাজ্যের হরিপালের লেখা 'সঙ্গীত সুধাকর' গ্রন্থে (১৩০৯-১২) এই দুটি পৃথক নাম দেখতে পাওয়া যায়।

চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। মুসলমান শাসকদের মধ্যে অনেকেই সঙ্গীতের প্রসারে সাহায্য করেন। তাঁদের অধিকাংশই রাজসভায় সঙ্গীতজ্ঞদের স্থান দিয়েছিলেন। এই সময় থেকেই ভারতীয় সঙ্গীতে পারসীয় সঙ্গীতের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে এই মিশ্রণের ফলে দুটি পৃথক ধারা সৃষ্টির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়।

মুসলমান রাজশক্তির উত্তর ভারতে যত সহজে প্রতিষ্ঠা প্রসার ঘটেছিল, দক্ষিণ ভারতে তা হয়নি। এঁদের রাজধানী ছিল উত্তর ভারতে। উত্তর ভারতে মুসলমান রাজশক্তির দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ঘটবার ফলে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল। মুসলমান বাদশাহদের রাজসভায় হিন্দু-মুসলমান উভয়

শ্রেণীর সঙ্গীতগুণীরাই স্থান লাভ করেছিলেন। সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের মতো হিন্দু সঙ্গীতের সঙ্গে আরবীয় ও পারসীয় সঙ্গীতেরও মিশ্রণ ঘটেছিল। তার ফলে উত্তর ভারতের সঙ্গীতধারা নতুন রূপ গ্রহণ করে প্রবাহিত হচ্ছিল। দক্ষিণ ভারতে মুসলমান অভিযানের মধ্যেও ভারতের নিজস্ব সঙ্গীতচর্চা অক্ষুন্ন থাকে। তাই দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতির সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচিত হতে দেখা যায়।

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির দিক থেকে বিশেষভাবে দুজন মুসলমান শাসকের রাজত্বকাল স্মরণীয়: আলাউদ্দীন খিলজী (১২৯৫-১৩১৬) এবং আকবর। আলাউদ্দীন খিলজীর সময় পারসীয় ও ভারতীয় সঙ্গীতের মিশ্রণে উদ্ভাবিত কাওয়ালী পদ্ধতি আমীর খসরু প্রথম প্রচলন করেন। অন্য দিকে আকবরের রাজত্বকালে পারসীয় প্রভাবে ভারতীয় রাগ-রাগিণীর অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। এর ফলে যদিও সঙ্গীতের প্রচলিত গায়ন-রীতি উপেক্ষা করা হচ্ছিল, তবুও মোটের উপর এই নতুন পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়।

উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয়—এই দুটি পৃথক ধারা পূর্ণতা লাভ করে খ্রিস্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে। এই সময় পণ্ডিত রামামাত্য 'স্বরমেলকলানিধি' (১৫৫০ খ্রিঃ) এবং পণ্ডিত সোমনাথ 'রাগবিবোধ' (১৬০১ খ্রিঃ) রচনা করেন। তার আগে দার্শনিক ও সঙ্গীতশাস্ত্রী বিদ্যারণ্য বা মাধব বিদ্যারণ্য (১৪শ শতাব্দী) প্রবর্তিত ২৫টি মেল তথা জনকরাগ ও ৫০টি জন্যরাগ ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতিতে একটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তার ফলে ভারতের অখণ্ড সঙ্গীত-ধারার মধ্যে কোনও ব্যবধান সৃষ্টি হয়নি। পরে যখন মাধব বিদ্যারণ্যের জনক ও জন্য রাগগুলির ওপর ভিত্তি করে পণ্ডিত রামামাত্য ২০টি জনকমেল ও ৬৪টি জন্য এবং সোমনাথ ২৩টি মেলরাগ ও ৭৭টি জন্য রাগের সৃষ্টি করেন, তখন থেকেই উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতধারার সঙ্গে পার্থক্য কিছুটা লক্ষ করা যায়। তারপর ১৭শ শতাব্দীতে বেংকটমুখী (১৬৩৭ খ্রিঃ) যখন ৭২টি মেলরাগ তথা মেলকর্তা (ঠাট) প্রচলন করেন, তখন থেকেই ভারতীয় সঙ্গীতে দুটি স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হল। নতুন ধারা নাম পরিগ্রহ করল—কর্ণাটক সঙ্গীত। অবশ্য তার আগে থেকেই উত্তর ভারতে হিন্দুস্থানী নামের আভিজাত্য সৃষ্টি হয়। সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত তার নিজস্ব ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য নিয়ে গড়ে উঠতে থাকে।

দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের বৈচিত্র্য

দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের বৈচিত্র্য কম নয়। কলা সঙ্গীত, ধর্মীয় সঙ্গীত, নৃত্য গীত, গীতি নাট্য, লোক সঙ্গীত—সব দিক থেকেই দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।

এখন যেটা 'রাগমালিকা' রূপে পরিচিত, মধ্যযুগের সঙ্গীতে সেটা রাগকদম্ব

নামে পরিচিত ছিল। দীর্ঘ রাগমালিকা কতকগুলি অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশ কতকগুলি রাগে গাওয়া হয়।

'কৃতি' আর এক শ্রেণীর গান। কীর্তন থেকে কৃতির উদ্ভব। তবে কৃতি কীর্তনের উন্নত রূপ। কীর্তনে কথা প্রধান, কৃতিতে প্রধান সুর। কর্ণাটক সঙ্গীতের ত্রয়ী বলে অভিহিত ত্যাগরাজ, মুথুস্বামী দীক্ষিতর এবং শ্যাম শাস্ত্রী কৃতির চরম উৎকর্ষ ঘটিয়েছেন।

'জাবলি' একটু হালকা ধরনের গান। তেলুগু ও কানাড়া ভাষায় এই গান গাওয়া হয়ে থাকে।

'তিল্লানা' সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রাণবন্ত গান। নাচের সঙ্গে এই গান গাওয়া হয়ে থাকে।

'স্বরনীতি' নাচের সঙ্গে গাওয়া হয়। তবে শ্যামশাস্ত্রী এই সঙ্গীত-পদ্ধতিকে নতুন রূপ দান করেন। তার ফলে নাচ ছাড়াও শুধু গান হিসেবেই এর প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

'জাতিস্বরম্' পুরোপুরি নাচের গান। সম্পূর্ণ গানই জাতি প্রকরণে গঠিত।

'বর্ণম' দুই প্রকার: পদবর্ণ ও তানবর্ণ। শেষোক্ত বর্ণ প্রথম বর্ণের চেয়ে প্রাচীন। পদবর্ণ নৃত্যের ঐকতান বাদনের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

ঠাট ও মেল

'মেলঃ স্বর সমূহঃ স্যাদ্রাগব্যঞ্জন শক্তিমান্।'

সংস্কৃত ভাষায় ঠাটের উপরোক্ত সংজ্ঞার অর্থ হল রাগ সৃষ্টি করতে পারে এরূপ স্বরসমষ্টির বিশিষ্ট রচনাকে ঠাট বলে। ঠাট, থাক, মেল, স্বরসপ্তক—এই সবকটি একই অর্থবাচক। ঠাটে শুদ্ধ ও বিকৃত মিলে সাতটি স্বর থাকা প্রয়োজন। ঠাটে স্বরগুলি নিজস্ব ক্রমে উচ্চারিত হয়। ঠাটে অবরোহণ থাকে না। ঠাট বা মেল-এর (কর্ণাটক বা দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতিতে ঠাটকে মেল বলা হয়) রঞ্জকতা থাকে না। এতে কোনও স্বরই বক্রভাবে ব্যবহৃত হয় না। একটি ঠাট থেকে বহু রাগের জন্ম হয়।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ঠাটের কোনও উল্লেখ থাকা সম্ভব ছিল না। কারণ, ঠাট এসেছে মূর্চ্ছনা থেকে ক্রমবিকাশের পথে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'স্বরমেল-কলানিধি' প্রণেতা রামামাত্যের সময় ঠাট বা মেল শব্দটি প্রথম জানতে পারা যায়। সম্ভবত খ্রিঃ পূঃ ৬০০ থেক ৫০০ শতাব্দীতে মূর্চ্ছনার প্রয়োগ ছিল। ব্রহ্মভারতের যুগ থেকে গান্ধর্ব গানে জাতিরাগ ইত্যাদিতে মূর্চ্ছনার প্রয়োগ সম্পর্কে জানা যায়। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ও পুরাণাদিতে এই মূর্চ্ছনার প্রচলন সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মিয়ে দেয়। নারদীশিক্ষা, নাট্যশাস্ত্র ও তদানীন্তন গ্রন্থসমূহ এই প্রত্যয়কে আরও দৃঢ় করে। সেই প্রাচীন যুগ থেকে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মূর্চ্ছনাই গান্ধর্ব ও দেশী রাগ নির্ণয় করার পক্ষে সহায়ক উপায় ছিল। নারদীশিক্ষা, ভরত, দত্তিল, যাষ্টিক, মতঙ্গ,

পার্শ্বদেব, শার্ঙ্গদেব, মকরন্দদাস নারদ, সোমনাথ, অহোবল এবং পণ্ডিত দামোদর (সপ্তদশ শতাব্দীর) প্রভৃতির যুগে মূর্চ্ছনা দিয়েই রাগ নির্ণয় করা হত।

'মেল স্যান্মূর্চ্ছনাধার গ্রামাধর তু মূর্চ্ছনা
স্বরেভ্য গ্রাম সম্ভূত শ্রুতয়োঃ স্বরজন্মভু।'

ঠাট বা মেলের আধার হল মূর্চ্ছনা অথবা মূর্চ্ছনা থেকে মেল বা ঠাট এসেছে। মূর্চ্ছনা এসেছে গ্রাম থেকে। গ্রাম উৎপন্ন হয়েছে স্বর থেকে আর স্বর সৃষ্টি হয়েছে শ্রুতি থেকে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে মূর্চ্ছনা যথাক্রমে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ঠাট এবং কর্ণাটক সঙ্গীতে মেলকর্তা নামে প্রচলিত।

ভরত ষড়জগ্রাম ও মধ্যমগ্রামের উল্লেখ করলেও বোঝা যায় গান্ধার গ্রাম সেই যুগেই (খ্রিস্টীয় ২য় শতাব্দী) অপ্রচলিত হয়ে গেছে। সোমনাথের 'রাগ-বিবোধ' এবং অহোবলের 'সঙ্গীত পারিজাত' থেকে বোঝা যায় যে মধ্যমগ্রামও তখন অপ্রচলিত হয়ে গেছে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ষড়জ গ্রামই মূল আধার রূপে বর্তমান। এই ষড়জ গ্রামই ঠাট বা মেল বা রাগের ধারক হয়ে আছে বলতে হবে। ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত রামামাত্যের সময় থেকে মূর্চ্ছনা থেকে ঠাট বা মেলের যে প্রথম নামকরণ হয়েছে তা পণ্ডিত সোমনাথের সময়ে (১৬০৯ খ্রিস্টাব্দ) সঙ্গীতবিদদের স্বীকৃতি লাভ করে। রামামাত্য ২০টি জনক মেল ঠাটের অধিকর্তা। রাগবিবোধের টীকায় বলা হয়েছে, 'মিলন্তি বর্ণাভবন্তী রাগা যত্রেত তদাশ্রয়া স্বরসংস্থান বিশেষা মেলাঃ ঠাট ইতি ভাষায়াঃ।' কল্লিনাথ তাঁর 'সঙ্গীত রত্নাকর'-এর টীকায় 'মেল' কথাটির উল্লেখ না করলেও 'মেলন' কথাটির উল্লেখ করেছেন। গোবিন্দ দীক্ষিত (১৬১৪ খ্রিস্টাব্দ) বিদ্যারণ্যস্বামী (১৪০০-১৫০০ খ্রিস্টাব্দ) যে মেলগুলি প্রবর্তন করেন সেগুলি থেকে বোঝা যায় যে মূর্চ্ছনা মেল-এ রূপান্তরিত হয়েছে চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে। রামামাত্য ও সোমনাথের সময় থেকেই রাগনির্ণয়ে মূর্চ্ছনার আর কোনও স্থান রইল না। কারণ তখন মেল বা ঠাট—এই নাম স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের পণ্ডিত বেঙ্কটমুখী তাঁর 'চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা' গ্রন্থে দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতিতে ৭২টি ঠাটের উল্লেখ করেছেন। ঠাট রচনার জন্য তিনি সপ্তকের অন্তর্গত ১২টি (শুদ্ধ ও বিকৃত) স্বরকে সমানভাবে ভাগ করে ৬টি পূর্বমেলার্ধ রচনা করেন। সা <u>রে</u> রে <u>গ</u> গ ম এই ৬টি স্বর নিয়ে তিনি ৬টি পূর্বমেলার্ধ রচনা করেন এইভাবে :

(১) সা <u>রে</u> রে ম (২) সা রে <u>গ</u> ম (৩) সা <u>রে</u> গ ম
(৪) সা <u>রে</u> গ ম (৫) সা রে <u>গ</u> ম (৬) সা <u>গ</u> গ ম

সপ্তকের উত্তরার্ধ অর্থাৎ প <u>ধ</u> ধ <u>নি</u> নি র্সা।

এই স্বরগুলি তিনি গ্রহণ করেন ৬টি উত্তর মেলার্ধ রচনা করতে। ৬টি উত্তর মেলার্ধ নিম্নরূপ :

(১) প ধ ধ র্সা (২) প ধ নি র্সা (৩) প ধ নি র্সা
(৪) প ধ নি র্সা (৫) প ধ নি র্সা (৬) প নি নি র্সা

প্রত্যেকটি পূর্বমেলার্ধের সঙ্গে ৬টি করে উত্তর মেলার্ধ যোগ করতে হবে এইভাবে :

(ক) সা রে রে ম প ধ ধ র্সা
(খ) সা রে রে ম প ধ নি র্সা
(গ) সা রে রে ম প ধ নি র্সা
(ঘ) সা রে রে ম প ধ নি র্সা
(ঙ) সা রে রে ম প ধ নি র্সা
(চ) সা রে রে ম প নি নি র্সা

পূর্ব মেলার্ধ হল ৬টি। প্রত্যেকটি পূর্ব মেলার্ধের সঙ্গে ৬টি করে উত্তর মেলার্ধ যুক্ত করলে (উপরোক্ত পদ্ধতিতে) মোট ঠাট সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ × ৬ = ৩৬টি। উক্ত ৩৬টি ঠাট বা মেলের শুদ্ধ মধ্যম-এর স্থানে তীব্র মধ্যম ব্যবহৃত হলে আরো ৩৬টি ঠাট বা মেল উৎপন্ন হয়। এইভাবে বেংকটমুখী তাঁর 'চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা' গ্রন্থে মেল সংখ্যা ৩৬ + ৩৬ = ৭২টি মেনেছেন।)

কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতির বাহাত্তরটি ঠাট উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতিতে প্রচলিত নেই। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে প্রচলিত রাগ-রাগিণী-গুলিকে মাত্র ১০টি ঠাটের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং ঐ ১০টি ঠাটই উত্তর ভারতীয় সংগীত-পদ্ধতিতে মানা হয়ে থাকে।

শুদ্ধ স্বরসপ্তক বলতে বর্তমানে সারেগমপধনি বোঝায়। ভাতখণ্ডে এই শুদ্ধ স্বর সপ্তক-কে 'বিলাবল ঠাট' ধরেছেন। তাঁর প্রচারিত ১০টি ঠাটের বিবরণ নিম্নরূপ :

উত্তর ভারতীয় নাম	দক্ষিণ ভারতীয় নাম	ঠাট-রূপ	ঠাটের অন্তর্গত প্রচলিত রাগ সংখ্যা
১। বিলাবল	শঙ্করাভরণ	সা রেগ মপধনি	২৬
২। কল্যাণ	কল্যাণ	সা রে গম॑ পধনি	১৫
৩। খাম্বাজ	কাম্বোজী	সা রে গম পধ নি	১৪
৪। ভৈরব	মালবগৌড়	সা রে গম পধনি	১৮
৫। পূর্বী	কামবর্ধনী	সা রে গম॑ পধনি	১৫
৬। মারোয়া	গমনশ্রম	সা রে গম॑ পধনি	১৬

উত্তর ভারতীয় নাম	দক্ষিণ ভারতীয় নাম	ঠাট-রূপ	ঠাটের অন্তর্গত প্রচলিত রাগ সংখ্যা
৭। কাফি	খরহরপ্রিয়া	সা রে গম পধনি	৫৩
৮। আশাবরী	নটভৈরব	সা রে গম পধনি	১৪
৯। ভৈরবী	তোড়ী	সা রে গম পধনি	৭
১০। তোড়ি	বরাটী	সা রে গমঁ পধনি	৭

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে এই ১০টি ঠাটের অন্তর্ভুক্ত ১৯৩টি রাগের কথা বলেছেন। ঠাটের নাম ব্যবহার না করে ঠাটের পরিচয় দেওয়া হয় নিম্নরূপ ভাবে :

১। কড়িমধ্যম যুক্ত ঠাট
২। শুদ্ধ ঠাট
৩। কোমল নিষাদ যুক্ত ঠাট
৪। কোমল ঋষভ ও কোমল ধৈবত যুক্ত ঠাট
৫। কোমল ঋষভ, কড়ি মধ্যম ও কোমল ধৈবত যুক্ত ঠাট
৬। কোমল ঋষভ, কড়ি মধ্যম যুক্ত ঠাট
৭। কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদ যুক্ত ঠাট
৮। কোমল গান্ধার, কোমল ধৈবত ও কোমল নিষাদ যুক্ত ঠাট
৯। কোমল ঋষভ, কোমল গান্ধার, কোমল ধৈবত ও কোমল নিষাদ যুক্ত ঠাট
১০। কোমল ঋষভ, কোমল গান্ধার, কড়ি মধ্যম ও কোমল ধৈবত যুক্ত ঠাট।

অবশ্য এইভাবে ঠাট মনে রাখা অপেক্ষা প্রচলিত রাগের নামে যে ঠাট-নাম বর্তমান তা মনে রাখা অনেক সহজ।

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতির ১০টি ঠাটের প্রত্যেকটি সম্পূর্ণভাবে গাওয়া বা বাজানো হলে এক-একটি রাগের স্বরূপ প্রকাশিত হবে। যেমন—কল্যাণ ঠাট স্বাভাবিক ভাবে গাওয়া বা বাজানো হলে ইমন রাগটি পাওয়া যায় এবং এই কারণে ইমন রাগটি কল্যাণ ঠাটের আশ্রয় রাগ বা মেলকর্তা নামে অভিহিত হয়। একই কারণে আশাবরী ঠাটের জৌনপুরীকে আশাবরী ঠাটের আশ্রয় রাগ বলা হয়। মারোয়া ঠাটের পূর্বকল্যাণকে মারোয়া ঠাটের আশ্রয়রাগ বলা হয় (মারোয়া রাগে পঞ্চম বর্জিত হওয়ায় ঐ রাগকে মারোয়া ঠাটের আশ্রয়রাগ হিসাবে প্রতিপন্ন করার পক্ষে যুক্তি কম)। আশ্রয়রাগকে 'জনক' রাগও বলা হয়। 'আশ্রয়রাগের' সঙ্গে 'জন্যরাগের' রূপগত মিল না-ও থাকতে পারে। জনক-জন্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে স্বরব্যবহারের ওপরে। অর্থাৎ আশ্রয় রাগের জন্ম হয় ঠাটের সম্পূর্ণ ব্যবহারে, আর ঠাটের মধ্যে বক্রত্ব, ষাড়ব, ঔড়বত্ব ইত্যাদি প্রয়োগ দ্বারা উৎপন্ন হয় জন্য রাগ।

১টি ঠাট থেকে বহু রাগ উৎপন্ন হয়। প্রাচীন গ্রন্থে বলা হয়েছে—

যোহয়ং ধ্বনির্বিশেষস্তু স্বরবর্ণ বিভূষিতঃ
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ কথিত বুধৈঃ ॥

শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকর'-এ রাগ শব্দের যোগার্থ ভত্ত আছে করণবাচো রঞ্জ + ঘঞ্: স্বর ও বর্ণ-বিশিষ্ট এরূপ ধ্বনি যার দ্বারা মানুষের চিত্ত অনুরক্ত হয় তাকে বলা হয় রাগ। কর্তৃবাচ্যে রঞ্জ্ + ঘঞ্: স্বর ও বর্ণ বিশিষ্ট এরূপ ধ্বনিবিশেষ যা মানুষের চিত্তকে অনুরক্ত করে তারই নাম রাগ। স্বর ও বর্ণের মনোরঞ্জনকারী রচনার নাম রাগ। রাগ ঠাট থেকে উৎপন্ন হয়। রাগে ৭টি (সম্পূর্ণ জাতির), ৭টি (ষাড়ব জাতির) কিংবা ৫টি (ঔড়ব জাতির) স্বর থাকে। ঠাটে যেমন শুধু আরোহণ থাকে রাগে কিন্তু সেরূপ নয়। রাগে আরোহণ এবং অবরোহণ উভয়ই থাকে। কোনও রাগে একই সঙ্গে ম এবং প উভয় স্বর বর্জিত হয় না।

শুদ্ধ এবং বিকৃত সাতটি স্বরের স্বাভাবিক পারম্পর্যেরই নাম ঠাট। আর শুদ্ধ এবং বিকৃত সাতটি, ছয়টি অথবা পাঁচটি স্বরের বিশিষ্ট পারম্পর্য অনুসারে আরোহণ ও অবরোহণের নাম রাগ।

মেলকর্তা পদ্ধতি

৭২টি মেলকর্তা রাগকে ১২টি চক্রের মধ্যে ধরা হয়েছে। প্রত্যেক চক্রে ৬টি করে মেল রাগ আছে। পরিকল্পনা অনুসারে সমগ্র মেলকর্তা কাঠামোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে এক থেকে ছয়টি চক্র এবং এক থেকে ছত্রিশ মেল আছে। শুদ্ধ মধ্যম প্রথমার্ধে অপরিবর্তনীয়।

সমগ্র মেলকর্তা কাঠামোর দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে সাত থেকে ১২ চক্র এবং ৩৭ থেকে ৭২ মেল। প্রতিমধ্যম দ্বিতীয়ার্ধে অপরিবর্তনীয় এই কারণে প্রথম ৬টি চক্রকে শুদ্ধ মধ্যম চক্র বলা হয়। পরবর্তী ৬টি চক্রকে প্রতিমধ্যম বলা হয়। শুদ্ধ মধ্যম অংশকে বলা হয় পূর্ব বিভাগ ও প্রতি মধ্যম অংশকে বলা হয় উত্তর বিভাগ। প্রত্যেক পূর্ব মেলকর্তার অনুরূপ উত্তর মেলকর্তা আছে। 'ম' স্বরটি মেলকর্তা কাঠামোকে ২ ভাগে ভাগ করেছে। উত্তর ভাগ পূর্ব ভাগের পুনরাবৃত্তি, তবে পার্থক্য এই যে, শুদ্ধ মধ্যমের স্থান গ্রহণ করেছে প্রতিমধ্যম। ৭২টি মেলকর্তাতেই সা পা থাকবে এবং ১-৩৬ মেলে শুদ্ধ মধ্যম ও ৩৭-৭২ প্রতিমধ্যম। একটি চক্রে পূর্বাঙ্গে ও উত্তরাঙ্গের আরম্ভ ও স্বর একই থাকে। প্রতি চক্রে পূর্বাঙ্গ স্বর স্থির থাকে অর্থাৎ রে গা ৬টি মেল রাগে একই থাকবে। শুধু ধা এবং নি-এর পরিবর্তন হবে।

প্রতিটি চক্রের একটি করে নাম দেওয়া হয়েছে। নামগুলি এমন ভাবে দেওয়া হয়েছে যাতে মনে রাখার সুবিধা হয়। যেমন প্রথম-ইন্দু (এক চন্দ্র), দ্বিতীয়—নেত্র (দুই চোখ), তৃতীয়—অগ্নি (তিন অগ্নি), চতুর্থ—বেদ (চার বেদ), পঞ্চম—বাণ) (পাঁচ বাণ), ষষ্ঠ—ঋতু (ছয় ঋতু), সপ্তম—ঋষি (সাত ঋষি), অষ্টম—বসু (অষ্ট বসু), নবম—ব্রহ্ম (নব প্রজাপতি ব্রহ্ম), দশম—দিশি (দশ দিক), একাদশ—রুদ্র (একাদশ রুদ্র), দ্বাদশ—আদিত্য (দ্বাদশ আদিত্য)।

প্রত্যেক চক্রে—

১ম	মেল	রাগে	থাকবে	শুদ্ধ ধা		শুদ্ধ	নি
২য়	,,	,,	,,	,,		কৈশিকী	,,
৩য়	,,	,,	,,	,,		কাকলী	,,
৪র্থ	,,	,,	,,	চতুশ্রুতি	ধ	কৈশিকী	,,
৫ম	,,	,,	,,	,,	,,	কাকলী	,,
৬ষ্ঠ	,,	,,	,,	ষট্শ্রুতি	ধ	,,	,,

রে এবং গা, ধা এবং নি-র মতোই আবর্তিত হবে, তবে এক চক্র থেকে অন্য চক্রে তা পরিবর্তিত হবে, যেমন—

১ম	চক্রে	শুদ্ধ	রে	শুদ্ধ	গা
২য়	,,	,,	,,	সাধারণ	,,
৩য়	,,	,,	,,	অন্তর	,,
৪র্থ	,,	চতুশ্রুতি	রে	সাধারণ	,,
৫ম	,,	,,	,,	অন্তর	,,
৬ষ্ঠ	,,	ষট্শ্রুতি	,,	অন্তর	,,

এই ছয়টি রে এবং গা উত্তর অংশে (৭-১২ চক্রে) একই ভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

প্রথম চক্রম্ (ইন্দু)

(১) কনকাঙ্গী	শুদ্ধ	রে,	গ,	ম,	শুদ্ধ	ধ,	নি,
(২) রত্নাঙ্গী	,,	,,	,,	,,	,,	কৈশিকী	,,
(৩) গানমূর্তি	,,	,,	,,	,,	,,	কাকলী	,,
(৪) বনস্পতি	,,	,,	,,	,,	চতুশ্রুতি 'ধ'	কৈশিকী	,,
(৫) মানবতী	,,	,,	,,	,,	,,	কাকলী	,,
(৬) তানরূপী	,,	,,	,,	,,	ষট্শ্রুতি 'ধ'	কাকলী	,,

দ্বিতীয় চক্রম্ (নেত্র)

(৭) সেনাবতী	শুদ্ধ	রে,	ম,	সাধারণ	গ,	শুদ্ধ	ধ,	নি
(৮) হনুমতোড়ী	,,	,,	,,	,,	,,	,,	কৈশিকী	,,
(৯) ধেনুকা	,,	,,	,,	,,	,,	,,	কাকলী	,,
(১০) নাটকপ্রিয়	,,	,,	,,	,,	,,	চতুশ্রুতি ধ	কৈশিকী	,,
(১১) কোকিলপ্রিয়	,,	,,	,,	,,	,,	,,	কাকলী	,,
(১২) রূপবতী	,,	,,	,,	,,	,,	ষট্শ্রুতি ,,	কাকলী	,,

তৃতীয় চক্রম্ (অগ্নি)

(১৩) গায়কপ্রিয়	শুদ্ধ	রে,	ম,	অন্তর	গ,	শুদ্ধ	ধ,	নি
(১৪) বকুলাভরণম্	,,	,,	,,	,,	,,	,, ,,	কৈশিকী	,,

(১৫) মায়ামালব গৌল „ „ „ „ „ „ „ কাকলী „

(১৬) চক্র বাক „ „ „ „ „ চতুশ্রুতি ধ কৈশিক „

(১৭) সূর্যকান্তম্ „ „ „ „ „ „ „ কাকলী „

(১৮) হাটকাম্বরী „ „ „ „ „ ষট্শ্রুতি „ কাকলী „

চতুর্থ চক্রম্ (বেদ)

(১৯) ঝংকার ধ্বনি—চতুশ্রুতি রে, শুদ্ধ ম, সাধারণ গ, শুদ্ধ ধ শুদ্ধ নি

(২০) নটভৈরবী „ „ „ „ „ „ „ „ কৈশিকী „

(২১) কিরবাণী „ „ „ „ „ „ „ „ কাকলী „

(২২) খরহরপ্রিয় „ „ „ „ „ „ চতুশ্রুতি ধ কৈশিকী „

(২৩) গৌরীমনোহারি— „ „ „ „ „ „ „ „ কাকলী „

(২৪) বরুণপ্রিয় „ „ „ „ „ „ ষট্শ্রুতি „ কাকলী „

পঞ্চম চক্রম্ (বাণ)

(২৫) মাররঞ্জনী চতুশ্রুতি রে, অন্তর গ, শুদ্ধ ম, শুদ্ধ ধ, শুদ্ধ নি

(২৬) চারুকেশী „ „ „ „ „ „ „ „ কৈশিকী „

(২৭) স্বরসঙ্গী „ „ „ „ „ „ „ „ কাকলী „

(২৮) হরিকাম্বোজী „ „ „ „ „ „ চতুশ্রুতি ধ কৈশিকী „

(২৯) ধীরশংকরভরণম্ „ „ „ „ „ „ „ „ কাকলী „

(৩০) নাগনন্দিনী „ „ „ „ „ „ ষট্শ্রুতি ধ কাকলী „

ষষ্ঠ চক্রম্ (ঋতু)

(৩১) যাগপ্রিয়া ষট্শ্রুতি রে, অন্তর গ, শুদ্ধ ম শুদ্ধ ধ শুদ্ধ নি

(৩২) রাগবর্দ্ধিনী „ „ „ „ „ „ „ „ কৈশিকী „

(৩৩) গাঙ্গেয় ভূষণী „ „ „ „ „ „ „ „ কাকলী „

(৩৪) ভগদীশ্বরী „ „ „ „ „ চতুশ্রুতি ধ কৈশিকী „

(৩৫) সুলিনী „ „ „ „ „ „ „ কাকলী „

(৩৬) চলনাট „ „ „ „ „ ষট্শ্রুতি ধ কাকলী „

[পরবর্তী চক্রগুলি প্রতি মধ্যম (তীব্র মধ্যম) সংযুক্ত]

সপ্তম চক্রম্ (ঋষি)

(৩৭) সালাগম শুদ্ধ রে, গ, প্রতি ম, শুদ্ধ ধ শুদ্ধ নি

(৩৮) জলারনভম „ „ „ „ „ „ „ কৈশিকী „

(৩৯) জালভরাজী „ „ „ „ „ „ „ কাকলী „

(৪০) নবনীতম „ „ „ „ „ চতুশ্রুতি ধ কৈশিকী „

(৪১) পাবনী „ „ „ „ „ „ „ কাকলী „

(৪২) রঘুপ্রিয় „ „ „ „ „ ষট্শ্রুতি ধ কাকলী „

অষ্টম চক্রম্ (বসু)

(৪৩) গবাম্ভোধী — শুদ্ধ রে, সাধারণ গ, প্রতী ম শুদ্ধ ধ, শুদ্ধ নি
(৪৪) ভবপ্রিয় — ” ” ” ” ” ” ” ” কৈশিকী ”
(৪৫) শুভপন্তুবরালী — ” ” ” ” ” ” ” ” কাকলী ”
(৪৬) ষড়বিধ মার্গিনী — ” ” ” ” ” চতুশ্রুতি ধ, কৈশিকী ”
(৪৭) সুবর্ণাঙ্গী — ” ” ” ” ” ” ” কাকলী ”
(৪৮) দিব্যমণি — ” ” ” ” ” ষট্শ্রুতি ” কাকলী ”

নবম চক্রম্ (ব্রহ্মা)

(৪৯) ধবলাম্বরী — শুদ্ধ রে, প্রতী ম, অন্তর গ, শুদ্ধ ধ, শুদ্ধ নি
(৫০) নামনারায়ণী — ” ” ” ” ” ” ” ” কৈশিকী ”
(৫১) কামবর্ধনী — ” ” ” ” ” ” ” ” কাকলী ”
(৫২) রামপ্রিয় — ” ” ” ” ” চতুশ্রুতি ধ কৈশিকী ”
(৫৩) গমনশ্রম — ” ” ” ” ” ” ” কাকলী ”
(৫৪) বিশ্বম্ভর — ষট্শ্রুতি ” কাকলী ”

দশম চক্রম্ (দিশি)

(৫৫) শ্যামলাঙ্গী — চতুশ্রুতি রে, প্রতী ম, সাধারণ গ, শুদ্ধ ধ, শুদ্ধ নি
(৫৬) সম্মুর্খপ্রিয় — ” ” ” ” ” ” ” কৈশিকী ”
(৫৭) সিমহেন্দ্র মধ্যম — ” ” ” ” ” ” ” কাকলী ”
(৫৮) হেমবতী — ” ” ” ” ” চতুশ্রুতি ধ, কৈশিকী ”
(৫৯) ধর্মবতী — ” ” ” ” ” ” ” কাকলী ”
(৬০) নীতিমতি — ” ” ” ” ” ষট্শ্রুতি ধ কাকলী ”

একাদশ চক্রম্ (রুদ্র)

(৬১) কান্তামণি — চতুশ্রুতি রে, অন্তর গ, প্রতী ম, শুদ্ধ ধ, শুদ্ধ নি
(৬২) ঋষভপ্রিয় — ” ” ” ” ” ” ” ” কৈশিকী ”
(৬৩) লতাঙ্গী — ” ” ” ” ” ” ” ” কাকলী ”
(৬৪) বাচস্পতি — ” ” ” ” ” চতুশ্রুতি ধ কৈশিকী ”
(৬৫) মেচকল্যাণী — ” ” ” ” ” ” ” ” কাকলী ”
(৬৬) চিত্রাম্বরী — ” ” ” ” ” ষট্শ্রুতি ধ, কাকলী ”

দ্বাদশ চক্রম্ (আদিত্য)

(৬৭) সুচরিত্র — ষটশ্রুতি রে, অন্তর গ, প্রতী ম, শুদ্ধ, ধ, শুদ্ধ নি
(৬৮) জ্যোতিস্বরূপিনী — ” ” ” ” ” ” ” ” কৈশিকী ”
(৬৯) ধাতুবর্ধনী — ” ” ” ” ” ” ” ” কাকলী ”

(৭০) নাসিকাভূষণী	,, ,, ,, ,, ,, ,, চতুশ্রুতি ধ	কৈশিকী ,,
(৭১) কোসলম	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	কাকলী ,,
(৭২) রসিকপ্রিয়	,, ,, ,, ,, ,, ,, ষটশ্রুতি ধ	কাকলী ,,

উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় কয়েকটি ঠাটের মিল

উত্তর ভারতীয়	দক্ষিণ ভারতীয়
১। ভৈরবী	হনুমন্ত টোড়ী (৮নং মেলকর্তা)
২। ভৈরব	মায়ামালব গোলা (১৫নং মেলকর্তা)
৩। আশাবরী	নট-ভৈরবী (২০ নং মেলকর্তা)
৪। কাফী	খরহরপ্রিয় (২২ নং মেলকর্তা)
৫। খাম্বাজ	হরিকাম্ভোজী (২৮ নং মেলকর্তা)
৬। বিলাবল	ধীরশঙ্করভরণম (২৯ নং মেলকর্তা)
৭। টোড়ী	শুভপন্তুভরালী (৪৫ নং মেলকর্তা)
৮। পূরবী	কামবোধনী (৫১ নং মেলকর্তা)
৯। মাড়োবা	গমনাশ্রম (৫৩ নং মেলকর্তা)
১০। কল্যাণ	মেচকল্যাণী (৬৫ নং মেলকর্তা)

স্বরসমূহ

কর্ণাটিক (Karnatic)	হিন্দুস্থানী (Hindusthani)
(১) ষড়জ	সা
(২) শুদ্ধ ঋষভ	কোমল রে
(৩) চতুশ্রুতি ঋষভ	(শুদ্ধ) রে
(৪) সাধারণ গান্ধার	গা (কোমল)
(৫) অন্তর গান্ধার	গা (শুদ্ধ)
(৬) শুদ্ধ মধ্যম	মা
(৭) প্রতী মধ্যম	মা (তীব্র)
(৮) পঞ্চম	পা
(৯) শুদ্ধ ধৈবত	ধা (কোমল)
(১০) চতুশ্রুতি ধৈবত	ধা (শুদ্ধ)
(১১) কৈশিকী নিষাদ	নি (কোমল)
(১২) কাকলী নিষাদ	নি (শুদ্ধ)
পল্লব =	স্থায়ী
অনুপল্লবী =	অন্তরা
চরণম্ =	সঞ্চারী

দক্ষিণ ভারতীয় ও হিন্দুস্থানী রাগ

(১) আভেরী (ভীমপলশ্রী)

এই জন্য-রাগটি ২২তম মেলকর্তা খরহরপ্রিয় (কাফি ঠাট) থেকে উদ্ভূত। এই রাগের সঙ্গে হিন্দুস্থানী ভীমপলশ্রী রাগের সাদৃশ্য আছে।

আরোহণ—সা-গ্ন-মা-পা-ন্নি-সা

অবরোহণ—র্সা-ন্নি-ধা-পা-মা-গ্ন-রে-সা।

(২) শ্রীরঞ্জনী (বাগেশ্রী)

এই জন্য-রাগটি ২২তম মেলকর্তা খরহরপ্রিয় থেকে উদ্ভূত। এই রাগের সঙ্গে হিন্দুস্থানী বাগেশ্রী রাগের মিল আছে।

আর—সা-রে-গা-মা-ধা-ন্নি-র্সা

অব—র্সা-ন্নি-ধা-গ্না-রে-সা।

(৩) বেহাগ (বেহাগ)

এই জন্য-রাগটি ২৯তম মেলকর্তা ধীরশঙ্করভরণম্ (বিলাবল ঠাট) থেকে উদ্ভূত। এই রাগের সঙ্গে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বেহাগের মিল আছে।

আর—সা গা মা পা নি ধা নি সা

অব—র্সা নি ধা পা গা রে সা।

(৪) মোহন (ভূপালী)

এই জন্য-রাগটি ২৮তম মেলকর্তা হরিকাম্বোজী (খাম্বাজ ঠাট) থেকে উদ্ভূত। এই রাগের সঙ্গে হিন্দুস্থানী ভূপালী রাগের মিল আছে।

আর—সা রে গা পা ধা সা

অব—র্সা ধা পা গা রে সা

(৫) রেবাগুপ্তা (বিভাস)

এই জন্য-রাগটি ১৫তম মেলকর্তা মায়ামালবগৌল (ভৈরব ঠাট) থেকে উদ্ভূত। এই রাগের সঙ্গে হিন্দুস্থানী বিভাসের মিল আছে।

আর—সা রে গা পা ধা সা

অব—র্সা ধা পা গা রে সা।

মা এবং নি বর্জিত। রে এবং ধা কোমল।

(৬) হংসনন্দী (পূরিয়া)

এই জন্য-রাগটি ৫৩তম মেলকর্তা গমনাশ্রম (মারোয়া ঠাট) থেকে উদ্ভূত। এই রাগের সঙ্গে হিন্দুস্থানী পূরিয়া রাগের মিল আছে।

আর—সা রে গা মা ধা নি র্সা

অব—র্সা নি ধা মা গা রে সা।

এতে কড়ি মা এবং কোমল রে ব্যবহৃত হয়।

(৭) সাবেরী (যোগিয়া)

এই জন্য-রাগটি ১৫তম মেলকর্তা মায়ামালবগৌল (ভৈরব ঠাট) থেকে উদ্ভূত। এই রাগের সঙ্গে হিন্দুস্থানী যোগিয়া রাগের মিল আছে।

আর—সা রে মা ধা র্সা

অব—র্সা নি ধা পা মা গা রে সা।

রে এবং ধা কোমল, আরোহণে নি বর্জিত।

(৮) শুদ্ধসাবেরী (দুর্গা)

এই জন্য-রাগটি ২৯ তম মেলকর্তা ধীরশঙ্করভরণম (বিলাবল ঠাট) থেকে উদ্ভূত। এই রাগের সঙ্গে হিন্দুস্থানী দুর্গা রাগের মিল আছে।

আর—সা রে মা পা ধা র্সা

অব—র্সা ধা পা মা রে সা।

বিলাবল ঠাট থেকে উদ্ভূত, গা এবং নি বর্জিত।

(৯) হনুমন্ত টোড়ী (ভৈরবী)

[illegible] রাগটি ২য় চক্র 'নেত্র'-র অন্তর্গত। এর সঙ্গে হিন্দুস্থানী ভৈরবী রাগের [illegible]ছে।

আর—সা রে গা মা পা ধা নি র্সা

অব—র্সা নি ধা পা মা গা রে সা।

(১০) কেদারগৌল (দেশ)

এই জন্য-রাগটি ২৮তম মেলকর্তা হরিকাম্বোজি থেকে উদ্ভূত। এর সঙ্গে হিন্দুস্থানী দেশ রাগের মিল আছে।

আর—সা রে মা পা নি র্সা

অব—র্সা নি ধা পা মা গা রে সা।

(১১) ভন্জী (কলাবতী)

এই জন্য-রাগটি ১৬তম মেলকর্তা চক্রবাকম থেকে উদ্ভূত। এই রাগের সঙ্গে হিন্দুস্থানী কলাবতীর মিল আছে।

আর—সা গা পা ধা নি র্সা

অব—র্সা নি ধা পা গা সা।

(১২) হিন্দোলম (মালকোষ)

এই জন্য-রাগটি ২০তম মেলকর্তা নটভৈরবী ঠাটের থেকে উদ্ভূত। এর সাথে হিন্দুস্থানী মালকোষ রাগের মিল আছে।

আর—সা মা গা মা ধা নি র্সা

অব—র্সা নি ধা মা গা সা।

চতুর্দশ অধ্যায়

তাল প্রকরণ

গীত, বাদ্য এবং নৃত্য—এই তিন মিলে সঙ্গীত। মানুষের কণ্ঠে যখন প্রথম সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছিল, সে যখন প্রথম কোনও জিনিসে আঘাত করে শব্দ সৃষ্টি করেছিল, বা যখন সে মনের আনন্দে দেহবল্লরী আন্দোলিত করেছিল, তখন তার মাথায় কোনও ব্যাকরণ ছিল না। কিন্তু যতই গীত, বাদ্য ও নৃত্যের প্রসার ঘটতে থাকল, ততই তার ব্যাকরণ অর্থাৎ রীতিনীতি প্রভৃতি সৃষ্টি হল। তবুও অনিবদ্ধ বলে কিছু রয়ে গেল যা তালহীন এবং নিবদ্ধ বলে যা সুষ্ঠুভাবে রীতিবদ্ধ করা হল তা তালযুক্ত।

তাল

এই তাল কি? সময় অখণ্ড। মানুষ তার ব্যবহারিক প্রয়োজনে এই অখণ্ড সময়কে সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, বছর প্রভৃতিতে বিভক্ত করেছে। তেমনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও মাত্রা, পদ ও আবর্তন যুক্ত করে সময়কে নিবদ্ধ করা হয়েছে। এই নিবদ্ধ সময়ই হল সঙ্গীতের তাল। বিশ্বের সর্ব ক্ষেত্রেই তাল ও ছন্দ রয়েছে। কিন্তু সঙ্গীতের ব্যাখ্যার প্রয়োজনে তাকে নিয়ম বদ্ধ করে অনুসরণ করা হয়।

সঙ্গীতের গতিকে লয় বলা হয়। গতি তিন প্রকার: বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত। ধীর গতিকে 'বিলম্বিত' লয় বলে। বিলম্বিত ও দ্রুত লয়ের মাঝামাঝি গতিকে

'মধ্য' লয় বলা হয় এবং দ্রুত গতিকে বলা হয় 'দ্রুত' লয়। সঙ্গীতের সময়ের পরিমাপকে বলে মাত্রা। এই মাত্রা গতির বা লয়ের মাপকাঠি মাত্র। কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ মাত্রার সমষ্টি হল তাল।

মাত্রা লক্ষণ

তাল নির্ধারণ বা পরিমাপের জন্যই মাত্রা। যেমন কোনও জিনিসের মাপের জন্য কিলোগ্রাম, তরল পদার্থ মাপবার জন্য লিটার, কাপড় মাপবার জন্য সেন্টিমিটার, মিটার, তেমনি তাল মাপবার জন্য মাত্রা। ইদানিং কাল পর্যন্ত ভারতীয় তাল পদ্ধতিতে ৬ প্রকার মাত্রা প্রচলিত দেখতে পাওয়া যায়—অনুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত ও কাকপদ।

লঘু = এক মাত্রা। লঘুর অর্দ্ধ = দ্রুত মাত্রা।

লঘুর সিকি = অনুদ্রুত মাত্রা। দুইটি লঘু = গুরু মাত্রা।

তিনটি লঘু = প্লুত মাত্রা। চারটি লঘু = কাকপদ মাত্রা।

মার্গতালে তিন মাত্রা প্রচলিত ছিল: লঘু, গুরু, প্লুত। দেশী তালে এই তিনটি ছাড়া দ্রুত মাত্রার প্রচলন হয়।

তালের প্রয়োজনীয়তা

—— নিবদ্ধ সময়ের মধ্যে নিয়মিত ক্রিয়া করাকে তাল বলা হয়। সঙ্গীত একমাত্র তালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত বা তালই এর ভিত্তিস্থানীয়।

অনিবদ্ধ সঙ্গীতে তালের বন্ধন নেই। এর ক্রিয়া কোনও নিয়মাবদ্ধ বা নিবদ্ধ সময়ে হয়ে থাকে না। এই জন্য শ্রোতারা এই সঙ্গীতের উত্থান ও পতনে কোনও আভাস উপলব্ধি করতে পারে না। নিবদ্ধ সঙ্গীতের পর কি হবে শ্রোতা আগে থেকেই তার আভাস পায়। এর কারণ তালযুক্ত সঙ্গীতের প্রতিটি ক্রিয়া অর্থাৎ নির্দিষ্ট মাত্রা, নির্দিষ্ট ক্রিয়া, সমতার ব্যবধান, ধ্বনি প্রবাহের বৈচিত্র্য ইত্যাদি বিশেষ নিয়মানুসারে করা হয়। এই জন্যই নিবদ্ধ তালযুক্ত সঙ্গীত সমাজের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে ও লোকের মনোরঞ্জন করেছে।

সঙ্গীতে প্রধান হল সুর, ছন্দ, তাল। কিন্তু শ্রোতাদের মনের উল্লাস ও উৎফুল্লতা প্রকাশ করবার ক্ষমতা একমাত্র তাল ও ছন্দের। এর প্রমাণ বর্তমান ধ্রুপদ সঙ্গীতের আলাপ। সঙ্গীত যখন কেউ শোনেন তখন শুধু সুর উপভোগ করেই মগ্ন থাকেন। কিন্তু এই মগ্নতার মধ্যে কোনও উল্লাস প্রকাশ পায় না। কিন্তু যখন তালযুক্ত হয়ে উপযুক্ত তবলা সহযোগে গান আরম্ভ হয়, তখন আপনা থেকেই শ্রোতাকে মাথা নাড়তে দেখা যায় এবং অনভ্যাস সত্ত্বেও কারও কারও হাতে তাল দেওয়ার ইচ্ছা জাগে। এখানেই তালের সার্থকতা। তাল প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীতকে একটা বাঁধাধরা নিয়ম বা সময়ের মধ্যে বেঁধে রাখে।

তাল সঙ্গীতের চলনভঙ্গী ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। যে-কোনও ক্ষেত্রেই নিয়ম রক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

তাল সঙ্গীতের সংযম রক্ষা করে এবং তাল সঙ্গীতের শৃঙ্খলা বজায় রাখে।
তাল সঙ্গীতের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সঙ্গীতের সুগঠিত রূপ, স্থায়িত্ব আর চমৎকারিত্ব প্রকাশে সাহায্য করে থাকে।
তালবন্ধ বলেই সঙ্গীতকে স্বরলিপি, বোললিপি ইত্যাদির সাহায্যে ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। নিয়মবদ্ধ তালের জন্য সঙ্গীতের সময় পরিমাপে, উত্থানে, পতনে, বিরামে একীভূত হয়ে গায়ক, বাদক ও শ্রোতাকে উল্লসিত করে।
সঙ্গীতে বিভিন্ন রস ও ভাব পরিবেশিত হয়, যেমন করুণ রস, শৃঙ্গার রস, ভয়ঙ্কর বা বীভৎস রস। এদের প্রকৃত রূপ প্রকাশিত হয় তালের গতির ভেদানুযায়ী।
তাল সঙ্গীতের মাধুর্য সৃষ্টি করার পক্ষে প্রধান সহায়ক।
তাল সঙ্গীতের নিস্তেজ ভাবকে সতেজ করে তাকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

তালের দশপ্রাণ

তালকে বিশেষ ভাবে চিনতে হলে, তালের যে ১০টি প্রাণ আছে তাকে বুঝতে হবে। এরা যথাক্রমে—১। কাল, ২। মার্গ, ৩। ক্রিয়া, ৪। অঙ্গ, ৫। গ্রহ, ৬। জাতি, ৭। কলা, ৮। লয়, ৯। যতি, ১০। প্রস্তার।

"কালোমার্গ ক্রিয়াঙ্গানি গ্রহোজাতিঃ কলালয়ঃ।
যতিঃ প্রস্তার বশ্চতি তাল প্রাণা দশস্মৃতাঃ।"

১। কাল—কাল অর্থ সময়, অর্থাৎ সময়ের একটা আবর্তন। এই সময় বলতে সঙ্গীতে নিয়োজিত সময়ের কথাই বোঝায়। প্রাচীনকালে এই সময়ের একক ছিল ক্ষণ, লব, কাষ্ঠা ইত্যাদি। ক্ষণই ছিল ক্ষুদ্রতম একক। ২০০টি পদ্মপত্র উপর-উপর (পর পর) সাজিয়ে একটা সূচ দিয়ে বিদ্ধ করতে যে সময়ের প্রয়োজন তাকেই বলা হয় ক্ষণ।
২। মার্গ—মার্গ বলতে পথ বোঝায় অর্থাৎ গতিপথ, ঢং বা রীতি। তালের ছন্দ প্রকাশনের জন্য তালাঘাত করা হয়। তালাঘাতের পরে কয়েকটা নিঃশব্দ ক্রিয়া থাকতেও পারে এবং ঐ নিঃশব্দ ক্রিয়ার পর পুনরায় তালাঘাত হয়। এই-ভাবে মাত্রা, সময় প্রভৃতির দ্বারা তালের বিভিন্ন অঙ্গ প্রকাশিত হয়ে থাকে।
তালাঘাতের অন্তর্বর্তী মাত্রা সমষ্টি বৃদ্ধি বা হ্রাসের দরুন দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত এইভাবে লয়ের প্রকাশ হয়। সঙ্গীতে এই প্রকার বিভিন্ন লয় অনুসারে তাল কালের বিভিন্ন একক গ্রহণের নাম মার্গ। মার্গ প্রধানত চার প্রকার—ধ্রুব, মার্গ, চিত্র মার্গ, বার্তিকমার্গ, দক্ষিণী মার্গ।
ধ্রুবমার্গ—এই মার্গে কেবলমাত্র একটি তালাঘাত থাকে অর্থাৎ কোনও নিঃশব্দ ক্রিয়া এর সঙ্গে সংযোজিত নয়।
চিত্রমার্গ—এই মার্গে প্রতিটি তালের সঙ্গে একটি করে নিঃশব্দ ক্রিয়া সংযোজিত থাকে। সেই ক্ষেত্রে প্রতিটি অঙ্গ দ্বিমাত্রিক।

বার্তিকমার্গ—এতে একটি সশব্দ ক্রিয়া এবং তার অনুগামী ৩টি নিঃশব্দ ক্রিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গে মোট মাত্রা সংখ্যা ৪টি।

দক্ষিণমার্গ—এতে একটি সশব্দ ক্রিয়ার পর ৭টি নিঃশব্দ ক্রিয়া থাকে। সুতরাং এই মার্গে তালের প্রধান অঙ্গটি ৮ মাত্রা হয়। একই তাল এই পদ্ধতিতে অর্থাৎ চিত্র, বার্তিক এবং দক্ষিণে ব্যবহার করার নিয়ম। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায় দ্রুত, মধ্য এবং বিলম্বিত—এই তিন নামে যে একই তাল ব্যবহৃত হয়, তার ভেতরেও পারস্পরিক সম্পর্ক প্রায় একই রকম। বিশেষ করে কীর্তনাঙ্গীয় তাল পদ্ধতিতে ছোট, মধ্যম বা বড়—এই তিন বিশেষণযুক্ত একই তালের নাম দেখা যায়। যেমন, ছোটদশকুশী, মধ্যদশকুশী এবং বড়দশকুশী। ছোট দশকুশীতে পায় ৪টি তালাঘাত এবং ৩টি নিঃশব্দ ক্রিয়া, মধ্যম দশকুশীতে তালাঘাত ৪টিই থাকে কিন্তু নিঃশব্দ ক্রিয়া ১০টি হয়ে যায়। এই মধ্যবর্তীতে প্রতিটি তালাঘাতের পর ৩টি ফাঁক বা কুশী। এর দ্বারাই বার্তিকমার্গের নিদর্শন পাই। অনুরূপে বড়দশকুশীতে ২৮ মাত্রায় ৪টি তাল। প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ তালাঘাতের পর ৭টি নিঃশব্দ ক্রিয়া থাকে। একে দক্ষিণমার্গের নিদর্শক বলে ধরা যেতে পারে। চিত্রমার্গ থেকে অর্ধাধঃ সম্বন্ধে চিত্রতর, চিত্রতম, অতিচিত্রতম, চতুর্ভাগ ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে ধ্রুবমার্গের ব্যবহার ছিল না এবং অনেকে স্বীকারও করেন না।

৩। ক্রিয়া—হাতের আঘাত বা আন্দোলনের দ্বারা তালের বিভিন্ন বিভাগ ইত্যাদি দেখানো হয়ে থাকে। এই পদ্ধতির নাম ক্রিয়া। একটি তালে বেশ কিছু মাত্রা সমাহত থাকে। প্রতিটি মাত্রায় একই প্রকারের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই কোনও কোনও ক্ষেত্রে হাতের আঘাতকে আমরা সাধারণত তালাঘাত বলে থাকি। হাতের আঙুলে তুড়ি দিয়ে মাত্রার বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়। এই প্রকার যে সকল ক্রিয়া প্রণালীতে শব্দ সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় সশব্দ ক্রিয়া।

আর এক প্রকার নিঃশব্দ ক্রিয়া আছে। এই ক্রিয়া পদ্ধতিতে অঙ্গুলি গুরণ এবং হস্ত আন্দোলন মাত্র বোঝায়। সশব্দ ক্রিয়া প্রধানত চারটি—ধ্রুব, তাল, শম্পা, সন্নিপাত।

ধ্রুব—তুড়ি দিয়ে বা ছুটিকা শব্দ দ্বারা যে ক্রিয়া দেখানো হয় তাকে ধ্রুব বলা হয়।

তাল—(তালাঘাত বা তাল শব্দ) বাঁ হাত পেতে ডান হাতের করতল দ্বারা আঘাতে যে ক্রিয়া প্রকাশ করা হয় তার নাম তাল।

শম্পা—ডান হাত পেতে বাঁ হাতের করতল দ্বারা আঘাত করে যে ক্রিয়া প্রকাশ করা হয় তাকে বলা হয় শম্পা।

সন্নিপাত—দুই হাতের করতল যুক্ত করে চপেটাঘাত করলে যে ক্রিয়া প্রকাশ করা হয় তাকে বলা হয় সন্নিপাত।

নিঃশব্দ ক্রিয়া—এটি চার ভাগে বিভক্ত :

আবাপ, নিষ্কাম, বিক্ষেপ, প্রবেশক।

আবাপ—হাত তুলে অঙ্গুলি কুঞ্চন করলে তার দ্বারা যে ক্রিয়া প্রকাশ করা হয়, তাকে বলা হয় আবাপ।

নিষ্কাম—কুঞ্চিত অঙ্গুলি সম্প্রসারিত করে আন্দোলন করার নাম নিষ্কাম।

বিক্ষেপ—সম্প্রসারিত অঙ্গুলি দক্ষিণে স্থাপন করার নাম বিক্ষেপ।

প্রবেশক—সম্প্রসারিত অঙ্গুলি পুনরায় কুঞ্চিত করে যে ক্রিয়া প্রকাশ করা হয় তার নাম প্রবেশক।

এই ৮টি ক্রিয়াকে সঙ্গীত রত্নাকরের মতে মার্গ ক্রিয়াও বলা হয়। এ ছাড়া দেশী ক্রিয়াষ্টক নামেও এই ক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়।

'ধ্রুবকাসর্পিণী কৃষ্ণাপদ্মিনী চ বিসর্জিতা,
বিক্ষিপ্তাখ্যা পদাকাচ মাত্রাস্যাৎ পতিতাষ্টমি।'

অর্থাৎ আরও আটটি ক্রিয়া ঃ

ধ্রুবকা—দেশী ক্রিয়াষ্টকে একটি মাত্র সশব্দ ক্রিয়া। সাধারণত তালাঘাত বা ঝটিকা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

সর্পিনী—হাত জোড় করে বামদিকে সম্প্রসারিত করলে তাকে বলা হয় সর্পিনী।

কৃষ্ণা—হাত জোড় করে ডানদিকে সম্প্রসারিত করলে তাকে বলা হয় কৃষ্ণা।

পদ্মিনী—ঐ হাত কিঞ্চিৎ অবনমিত করলে তাকে বলা হয় পদ্মিনী।

বিসর্জিতা—ঐ হাত বাইরের দিকে সম্প্রসারিত করলে তাকে বলা হয় বিসর্জিতা।

বিক্ষিপ্তা—ঐ সম্প্রসারিত হাত নিজের দেহের দিকে উত্থিত করে আনলে তাকে বলা হয় বিক্ষিপ্তা।

পতাকা—তালাঘাতের পরেই উন্মুক্ত হস্ত উপরে ওঠালেই তাকে পতাকা বলা হয়।

পতিতা—উন্মুক্ত করতলের উপরি ভাগ উপরি দৃষ্ট করলে তাকে বলা হয় পতিতা। এই ৮টি দেশী ক্রিয়াষ্টক।

এই ক্রিয়াগুলির ব্যবহার তালের মার্গ প্রকাশের জন্য অতি প্রয়োজন। যেমন চিত্রমার্গে একটি ধ্রুব এবং একটি পতিতা। বার্তিক মার্গে ধ্রুব, সর্পিনী, পতাকা এবং পতিতা। এ ছাড়া দক্ষিণ মার্গে এই ৮টি ক্রিয়াই প্রয়োজন হয়। হিন্দুস্থানী তাল পদ্ধতিতে এই ক্রিয়াগুলির কয়েকটি এখনো বিশেষভাবে প্রচলিত।

৪। অঙ্গ—একটি তালকে বিশ্লেষণ করলে প্রধানত কতকগুলি মাত্রার সমন্বয় পাওয়া যায়। কিন্তু মাঝে তালাঘাত দ্বারা সমস্ত মাত্রাগুলিকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করে বোঝানো হয়ে থাকে। এই অঙ্গের প্রকারভেদ মূলত ৮ প্রকার ঃ অনুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত, ল-বিরাম, দ-বিরাম, কাকপদ। এই অঙ্গগুলির মাত্রা বা মাত্রাংশ হিসাবে পারস্পরিক সম্পর্ক এইরূপ—অনুদ্রুতকে

১৬ মাত্রা।

৫। গ্রহ—তালের আবর্তনে যে মাত্রা থেকে গান বাদ্য আরম্ভ করা হয় তাকেই গ্রহ বলে। গ্রহ চার প্রকার—সমগ্রহ, অতীতগ্রহ, অনাগতগ্রহ, বিষমগ্রহ।

সমগ্রহ—তালের সম থেকে যদি গান আরম্ভ হয় তাকে সমগ্রহ বলে।

অতীতগ্রহ—সমের ঠিক পরের মাত্রায় যদি গান আরম্ভ হয় তাকে অতীত-গ্রহ বলে।

অনাগত—সমের পূর্বেই যে-কোনও মাত্রা থেকে যদি গান আরম্ভ হয় তাকে অনাগতগ্রহ বলে।

বিষমগ্রহ—তালের মাত্রাসংখ্যার অর্ধস্থানের পরবর্তী মাত্রায় যদি গান শুরু হয় তবে তাকে বিষমগ্রহ বলে।

৬। জাতি—তালের মাত্রাসংখ্যা অনুসারে জাতি নির্ধারণ করা হয়। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে তালের জাতি ৫টি—চতুস্র, তিস্র, মিশ্র, খণ্ড ও সংকীর্ণ।

চতুস্র—যে তালে ৪।৪ অথবা ২।২ মাত্রার বিভাগ আছে তাকে চতুস্র জাতির তাল বলে। যেমন—ত্রিতাল, একতাল ইত্যাদি।

তিস্র—৩।৩ মাত্রা বিশিষ্ট তালকে তিস্র জাতির তাল বলে। যেমন—দাদ্‌রা, দ্রুত, একতাল ইত্যাদি।

মিশ্র—২।৩, ৩।৪ মাত্রার তালকে মিশ্র জাতির তাল বলে। যেমন—ঝাঁপতাল, ধুমরা, ধামার ইত্যাদি।

খণ্ড—৩।৫ মাত্রা বিভাগ বিশিষ্ট তালকে খণ্ড জাতির তাল বলা হয়।

সংকীর্ণ—৯।২ মাত্রার তালকে সংকীর্ণ জাতির তাল বলে।

৭। কলা—বাজনা বাজাবার শৈলী, বসবার ঢং এবং মুদ্রাকে কলা বলা হয়। তালের ছন্দ মাপবার জন্য প্রাচীনকালে যে একক ব্যবহার করা হত তারই নাম কলা। বর্তমানে মাত্রা বলতে আমরা যা বুঝি, প্রাচীনকালে কলা বলতে তাই বোঝানো হত। মাত্রার সাথে কেবল একটি পার্থক্য আছে কলার। তা হল, মাত্রার সময়কাল নির্দিষ্ট কিন্তু কলার সময় পরিবর্তনশীল।

৮। লয়—তালের ক্রিয়াগুলির মধ্যে সময়ের যে ব্যবধান তার নাম লয়। অর্থাৎ সঙ্গীতের মাত্রার গতিকে লয় বলা হয়। লয় তিন প্রকার—(১) দ্রুত, (২) মধ্য, (৩) বিলম্বিত।

৯। যতি—লয়ের গতিকে যতি বলে। যতি ৫ প্রকার—সমা, স্রোতগতা, গোপুচ্ছা, ডমরু, মৃদঙ্গ।

১০। প্রস্তার—কোনও তাল বাজাবার সময় বিস্তার অন্তর্গত কায়দা, পালটা, রেল, পরন, লগ্‌গী, লড়ী অথবা বাট প্রদর্শন করাকে প্রস্তার বলে।

আদি, মধ্য ও অন্তে একই গতির সমাবেশ থাকলে তাকে সমা বলা হয়।

আদিতে বিলম্বিত, মধ্যে এবং অন্তে দ্রুত গতির সমাবেশ থাকলে তাকে স্রোতগতা বা সরিৎ যতি বলা হয়।

আদিতে দ্রুত, মধ্যে মধ্য এবং অন্তে বিলম্বিত গতির সমাবেশ থাকলে তাকে বলা হয় গোপুচ্ছ যতি।
আদি ও অন্তে দ্রুত এবং মধ্য স্থানে মধ্য ও দ্রুত গতির নিয়ম থাকলে তাকে মৃদঙ্গ যতি বলা হয়।
আদি অন্তে বিলম্বিত এবং মধ্য স্থানে দ্রুত গতির ক্রিয়া ঘটলে তাকে ডমরু বা পিপীলিকা গতি বলে।

ছন্দ ও তাল

যে ভাব পদ বিন্যাস করলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং মনে রসের সঞ্চার হয়, তাকে ছন্দ বলে। ছন্দের মধ্যে আছে একটা গতিবেগ। এর প্রভাবেই বাক্যের অন্তর্গত কথা বা ভাব কথার সীমাকে অতিক্রম করে। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে, কিন্তু তার থেকে সুর ছাড়া পায়। ছন্দ হচ্ছে সেই বাঁধা সেতার। কারণ, সুরকে সে ছাড়া দিয়ে থাকে।
মানুষ প্রথমে ছন্দকে উপলব্ধি করে অনিবদ্ধ ভাবে, কিন্তু যখন সে ভাষা, কাব্য বা সঙ্গীত রচনা করতে যায়, তখনই সে এই অনিবদ্ধ ছন্দকে একটা নিয়মের মধ্যে নিবদ্ধ করে। এই নিবন্ধ বা নিয়ন্ত্রিত ছন্দই সঙ্গীতে তাল এবং কবিতায় ছন্দ বলে অভিহিত।
কাব্যে রসসৃষ্টির জন্য যেমন ভাষার অলংকার, রূপ, রীতি, প্রভৃতির সমাবেশের প্রয়োজন, তেমনি গতিবেগেরও প্রয়োজন। এই গতিবেগই শব্দকে চমৎকার ভাবে সাজিয়ে দিয়ে অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। তাই কাব্যসৃষ্টির ব্যাপারে ছন্দের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে—

'মানবের জীর্ণ বাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে বহুদূর
মানবের স্বাধীন লোকে ॥'

লঘু গুরু অক্ষর বিন্যাসের দ্বারা কাব্যে ছন্দ সৃষ্টি হয়, সঙ্গীতে ছন্দবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় মাত্রা বিন্যাসে।
কবিতার ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত নেয়া যাক—
বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেয় এল | বান |
১ ১ ১ ১ | ১ ১ ১ ১ | ১১ ১১ | ১ |
এখানে চারটি পর্ব আছে, তার তিনটির প্রতিটিতে ৪ মাত্রা এবং শেষের পর্বে ১ মাত্রা রয়েছে। এই শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের দ্বারা এই কাব্যদেহকে গতিদান করা হয়েছে। তালপ্রধান ছন্দই হোক আর মাত্রাবৃত্ত ছন্দই হোক, সর্বত্রই ছন্দ কাব্যকে গতিদান করে এবং কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।
অনুরূপভাবে সঙ্গীতের প্রধান যে সুর, ছন্দ, তাল—এই তিনটির মধ্যে তালই সৌন্দর্য সৃষ্টির সবচেয়ে বড় সহায়ক। সঙ্গীতের আলাপ যখন চলে তখন সে

উৎফুল্লতা বা উল্লাস প্রকাশ পায় না। তালযুক্ত হয়ে গান আরম্ভ হলে আপনা থেকেই শ্রোতার মনে আবেদন সৃষ্টি করে।

তাল সঙ্গীতকে একটা বাঁধাধরা নিয়ম বা সময়ের মধ্যে বন্ধন করে সঙ্গীতের গতিভঙ্গির সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। যেমন—

II গমা পধা ণর্সা ণা | ধা-া ধা-মা | মা-ধা-পধণ ণা | ণ-ণা-ধধা পা-গা I
র০ ০০ ০প্ সা | গ ০ রে ০ | ভু ব ০০ব্ দি | য়ে০ ০০ ছি ০

I গা মা পা-া | পা ধা সর্সা ণণা । ধা-া মগা-রগা | মা—া পা (গা)} I
স্ব ০ র্ প্ | র ০ ত০ ০ন্ | আ ০ শা০ ০০ | ক ০ রি ০

এই গানটি রবীন্দ্রনাথের গান এবং এটি কাহারবা তালে বন্ধ। গানটির ৪।৪ ছন্দ এবং মাত্রা ৮, একতাল, এক ফাঁক—

+ ০
I ১২৩৪ | ৫৬৭৮ I

এই মাত্রা বিভাগই গানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে।
কবিতায় ছন্দই ভাবপ্রকাশের অন্যতম উপায় এবং এই ছন্দের দোলাতেই মনে রসের সঞ্চার হয়। অন্যদিকে গানের বেলায় আমরা পাচ্ছি কথার সঙ্গে সুর এবং তাল। কবিতাতেও সুর ও তাল বসালে ছন্দের দায়িত্ব কমে গিয়ে সেটি সুর ও তালের সঙ্গে মিলে চলে।

কোনও কবিতা যখন গানে পরিণত হয় তখন সেই কবিতার ছন্দ সুরকে যে অনুসরণ করবে এমন কোনও কথা নেই। গানের সুরের সাহায্যে অন্য তালের সাহায্যে সেই ভাব ফুটিয়ে তোলা যায়। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে' কবিতাটি ৩ মাত্রার ছন্দ, কিন্তু সুরে তালে এই ভাবটি বজায় রেখে এটিকে ৪ মাত্রার তালের সাহায্য নিতে হয়েছে।

আড়ী, কুআড়ী, বিআড়ী

গতিপরিবর্তন, তালাঘাতের পরিবর্তন, মাত্রার বিরাম অথবা অক্ষর উচ্চারণের স্থায়িত্ব ও স্বর বোলের প্রবন উচ্চারণভঙ্গী প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা সঙ্গীতে ছন্দ বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই ছন্দের গতি পরিবর্তন নানা ভাবে করা যেতে পারে। তবে সাধারণত সোওয়া, দেড়ী, পোণে দুই, দুই গুণ গতির ব্যবহার বেশি দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে দ্বিগুণ বা চতুর্গুণও হয়। দেড়গুণ গতির ছন্দের নাম আড়ী, সোওয়া দুইগুণ গতির ছন্দের নাম কুআড়ী এবং পোণে দুই গুণ গতির ছন্দকে বলা হয়ে থাকে বিআড়ী। অনেক ক্ষেত্রে গতিগুলি দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ হয়। যেমন সোয়ার দ্বিগুণ আড়াই, চতুর্গুণ পাঁচ; আবার দেড়ীর দ্বিগুণ তিন, চতুর্গুণ ছয়; দুই-এর দ্বিগুণ চার, চতুর্গুণ আট।

কর্ণাটক সঙ্গীতে মূল তালের সংখ্যা সাতটি। এগুলির নাম ঃ ধ্রুব, মট্যা, রূপক, ত্রিপুট, ঝম্প, আট, এক তাল।

কর্ণাটক সঙ্গীতের তালের ধরন ঃ

তালের জাতি পাঁচ প্রকার, জাতি অনুসারে মাত্রা বা অক্ষর পৃথক।

১। তিস্রম্ বা তিস্র জাতি—৩ মাত্রা

২। চতুস্রম্ বা চতুস্র জাতি—৪ মাত্রা

৩। খণ্ডম্ বা খণ্ড জাতি—৫ মাত্রা

৪। মিশ্রম্ বা মিশ্র জাতি—৭ মাত্রা

৫। সংকীর্ণম্ বা সংকীর্ণ জাতি—৯ মাত্রা।

জাতি অনুসারে এই মাত্রা বা অক্ষরের বদল শুধু লঘুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

তালের চিহ্ন ঃ

৩, ৪, ৫, ৭, ৯ বলতে ১টা তাল দিয়ে যে যে জাতির যত মাত্রা রয়েছে তাদের আঙুল দ্বারা প্রকাশ করা বোঝায়।

১। লঘু = ৪ মাত্রা চিহ্ন = I

২। দ্রুতম্ = (২ মাত্রা) হচ্ছে ২ মাত্রা ঃ একতাল এবং এক ফাঁক। চিহ্ন = ০।

৩। অনুদ্রুতম্ = (১ মাত্রা) বলতে ১ মাত্রার তালকে বোঝায়।
চিহ্ন = U

৪। গুরু = (২ মাত্রা)
চিহ্ন = ৪

৫। প্লুতম্ = (৩ মাত্রা)
চিহ্ন = I
৪

৬। কাকপদম = (৪ মাত্রা)
চিহ্ন = +

৭টি তাল এবং ৫টি জাতি মিলে মোট তাল হয় = ৭ × ৫ = ৩৫। ঝম্প তালের শুধু অনুদ্রুতম্ হয়। এই ৩৫ তালের গতি ভেদের জন্য মোট তালের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫ × ৫ = ১৭৫। গুরু, প্লুতম্, কাকপদম্—এই তিন প্রকার ভাগের তাল হয়। কিন্তু এ তালগুলোর ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।

সাতটি তাল

তাল		তালের চিহ্ন
১। ধ্রুব	তাল	1011
২। মট্যা (মত্যম্)	,,	101
৩। রূপকম্	,,	01
৪। ত্রিপুট	,,	100

তাল		তালের চিহ্ন
৫। ঝম্প	,,	1U0
৬। আট (অস্ত)	,,	1100
৭। একম্	,,	1

জাতি হিসেবে মাত্রা যোগ হলে তা'র পূর্ণ মাত্রা সংখ্যা পাওয়া যাবে। তবে লক্ষ রাখতে হবে যে শুধু লঘু (1)-এর মাত্রা জাতি অনুসারে বদল হবে; দ্রুত (0)-এর মাত্রা ২ এবং অনুদ্রুত (U)-এর মাত্রা ১ থাকবে।

যেমন : চতুস্র জাতির ধ্রুব তাল = লঘু + দ্রুত + লঘু + লঘু = ৪ + ২ + ৪ + ৪ = ১৪।

সংকীর্ণ জাতির মট্যা তাল = লঘু + দ্রুত + লঘু = ৯ + ২ + ৯ = ২০।

উদাহরণ

তাল	তিস্রম	চতুস্রম	খণ্ডম	মিশ্রম্	সংকীর্ণম্
ধ্রুব	১১	১৪	২৭	২৩	২৯
মট্যা	৮	১০	১২	১৬	২০
রূপক	৫	৬	৭	৯	১১
ঝম্প	৬	৭	৮	১০	১২
ত্রিপুট	৭	৮	৯	১১	১৩
আট	১০	১২	১৪	১৮	২২
এক	৩	৪	৫	৭	৯

বিভিন্ন ধরনের তাল ও পদ্ধতি

হিন্দুস্থানী তালই ভারতের সব জায়গায় প্রচলিত। এর ব্যাপক প্রসারতা হেতু স্থানভেদে ও ব্যক্তিভেদে এর মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

হিন্দুস্থানী—হিন্দুস্থানী তালকে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) ধ্রুপদাঙ্গ—চৌতাল, আড়াচৌতাল, ধামার, সুরফাক, তেওরা, ঝাঁপতাল প্রভৃতি। (২) খেয়ালাঙ্গ—ত্রিতাল, একতাল, আড়াঠেকা, ঝুমরা বা তেওট প্রভৃতি। (৩) টপ্পাঙ্গ—মধ্যমান, পাঞ্জাবী, ঠেকা, বং প্রভৃতি। (৪) ঠুংরী—দীপচন্দী, অর্ধা প্রভৃতি। (৫) লঘু অঙ্গ—কাহারবা, দাদরা, পোস্ত, ধুমালী প্রভৃতি।

অবশ্য কিছু তাল একাধিক অঙ্গেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, ঝাঁপতাল, আড়া-চৌতাল ধ্রুপদ খেয়াল দুই সঙ্গীত পদ্ধতিতেই ব্যবহৃত হয়।

রাবীন্দ্রিক—রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানই হিন্দুস্থানী তালে রচিত। তবে তিনি হিন্দুস্থানী তালের ছন্দ ব্যবহার করলেও নাম এবং তাল ফাঁক ব্যবহার সব সময় করেননি। তাছাড়া তিনি গানের কথাকে মর্যাদা দিয়ে নতুন তালও সৃষ্টি করেছেন। যেমন : ঝম্পক = ৫ মাত্রা ; রূপকড়া = ৮ মাত্রা ; ষষ্ঠি = ৬ মাত্রা ; নবতাল = ৯ মাত্রা ; একাদশী = ১১ মাত্রা ; নবপঞ্চতাল = ১৮ মাত্রা।

কীর্তনাঙ্গ—এই পদ্ধতিতে প্রতিটি তাল তিন গতির মধ্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন—দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত। দ্রুতকে বলা হয় 'ছোট', মধ্যকে 'মধ্যম' এবং বিলম্বিতকে 'বড়'।

প্রকৃতপক্ষে সমতা রক্ষার জন্যই ফাঁক, তালের পদ বা ছন্দ প্রকাশের জন্য নয়। এক তালাঘাত থেকে দ্বিতীয় তালাঘাতের মধ্যে অধিক পরিধি বিশিষ্ট মাত্রা সমন্বয়ে যদি একটি ফাঁক প্রদর্শন করা যায় তা হলে সমতা রক্ষার সাহায্য করে। এইভাবে 'ফাঁকে'র ব্যবহার হয়েছে। তাল ও ফাঁক ছাড়া আর দুটি ক্রিয়া কীর্তনে মুদ্রার দ্বারা প্রদর্শিত হয়—কাল এবং কোশী। তালাঘাত বা ফাঁক প্রদর্শনের পরবর্তী ক্রিয়ার জন্য যে হস্ত উত্তোলন করা হয় তার নাম কাল।

ক্রিয়াগুলির প্রদর্শন চিহ্ন এইরূপ : তাল ('), ফাঁক (o), কাল (°), কোশী (⌒), অর্ধতালী (*)।

কোশী ও ফাঁকের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, যখন তাল অঙ্গের অনুভাবক হয়ে প্রকাশিত হয় তখন তাকে বলা হয় 'ফাঁক' এবং এই ক্রিয়া যখন অঙ্গের অভ্যন্তরের মাত্রে সমতা রক্ষায় ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বলে 'কোশী'। তাল ও কোশীর মাঝখানে অথবা দুটি কোশীর মাঝখানে কালের ব্যবহার হয়। কীর্তনাঙ্গ তালের নাম : বড় দশকোশী, ছোট দশকোশী ; বড় তেওট, ছোট তেওট ; বড় দোঠুকী, ছোট দোঠুকী ; ছোট লোফা, বড় লোফা ; বড় রূপক, ছোট রূপক ; গুরু লঙ্গা, লঘু লঙ্গা প্রভৃতি।

সাঙ্গীতিক পরিভাষা

অলংকার—স্বর গ্রামের বিভিন্ন রচনাকে অলংকার বলে। সঙ্গীতশাস্ত্রে ৬৩টি অলংকারের কথা উল্লেখ করা হলেও আরও অলংকার রচিত হতে পারে। অলংকার সম্পর্কে ভরত বলেছেন, অলংকার বর্ণের আশ্রয়, আর বর্ণকে আশ্রয় করেই অলংকারের বিকাশ।

এই ৬৩টি অলংকারের মধ্যে রয়েছে প্রসন্নাদি, প্রস্তার, বিস্তীর্ণ, হসিত, আক্ষিপ্ত, ত্রিবর্ণ, সম, বেনু, বিধুন প্রভৃতি। অলংকারকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(১) স্থায়ী বর্ণগত অলংকার, (২) আরোহী বর্ণগত অলংকার, (৩) সঞ্চারী বর্ণগত অলংকার। এ ছাড়াও রয়েছে অতিরিক্ত সপ্তালংকার, স্বরের রঞ্জকতা, স্বররূপ জ্ঞান এবং বর্ণ সন্দর্ভের বৈচিত্র্যের জন্য অলংকারের প্রয়োজন।

অংশ—যে স্বর সঙ্গীতের রঞ্জকতা প্রকাশ করে, যে স্বরের সম্বাদী এবং অনুবাদী বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়, যে স্বর গ্রহ ন্যাস প্রভৃতি স্বররূপে ব্যবহৃত হয়ে গীত প্রয়োগে বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়, তার নাম অংশ স্বর।

অন্তর গান্ধার—সঙ্গীতশাস্ত্রে তিনটি গ্রাম: ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার। গান্ধার দুই শ্রুতি যুক্ত। চতুঃশ্রুতি যুক্ত গান্ধার হলে তাকে অন্তর গান্ধার বলে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে বিলাবল ঠাটের শুদ্ধ গান্ধারকে অন্তর গান্ধার বলা হয়।

অন্তর গান্ধার রৌদ্রী, ক্রোধা, বজ্রিকা, প্রসারিণী—এই চার শ্রুতিতে নিষ্পন্ন হয়।

আর্বভী—পৃঃ ৬৯

আতদ্য বা আতন্দ—ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ২৮ অধ্যায়ের আরম্ভে ভরত আতন্দের (আতদ্য) পরিচয় দিয়েছেন। তত, অনিবদ্ধ, ঘন, সুষির—এই চার প্রকার বাদ্যকে তিনি আতদ্য বা আতন্দ বলেছেন।

(ক) তত—তন্ত্রী যুক্ত বীণাদি।

(খ) অনবদ্ধ—মৃদঙ্গ শ্রেণীর পুষ্করাদি (পাখোয়াজ ও তবলা)।

(গ) ঘন—তাল দেবার বাদ্যযন্ত্র (করতালাদি)।

(ঘ) সুষির—বেণু প্রভৃতি (বাঁশি)।

আলপ্তি—পৃঃ ১৩৪।

কাকলী নিষাদ—মন্দ্র, মধ্য ও তার—এই তিনটি স্থান, বর্ণ বা স্বরের উচ্চারণ ভেদ নির্ণয় করে। সাধারণ স্বর জাতিভেদে দু-রকম—স্বর সাধারণ ও জাতি সাধারণ। ব্যবধান বা অন্তরের নাম সাধারণ। 'সাধারণং নামান্তরস্বরতা কস্মাৎ ? দয়োরন্তন্বং তৎ সাধারণম্'।

শীত যায় গ্রীষ্ম আসে। এই দুটি ঋতুর ব্যবধান কালকে কাল সাধারণ বলে। সুতরাং স্বর সাধারণ ও জাতি সাধারণ ছাড়া ভরত কাল সাধারণেরও পরিচয় দিয়েছেন।

ভরতের সময় স্বর সাধারণ দুটি। (১) কাকলী (নিষাদ) এবং (২) অন্তর (গান্ধার) : 'স্বরসাধারণং কাকল্যন্তরসংজ্ঞৈ'—এদের বিকৃত স্বরও বলে। দুটি শ্রুতির অন্তর তথা প্রকর্ষনের (বৃদ্ধির) জন্য শুদ্ধ গান্ধার ও শুদ্ধ নিষাদের বিকৃত ভাব সৃষ্টি হয়। দুটি শ্রুতি সম্পন্ন নিষাদ যখন চার শ্রুতিযুক্ত ষড়জের তীব্রা ও কুমুদ্বতী—এই দুটি শ্রুতি গ্রহণ করে ৪ শ্রুতি যুক্ত হয়, তখনই তা কাকলী নিষাদ নামে পরিচিত হয়। তার জন্য তার অন্তস্বর হল নিষাদ ও ষড়জ।

কুতপ—অভিনয়ের অঙ্গ হিসাবে যে বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ হয় তাকে কুতপ বলে। নাটকের জন্য আবহসঙ্গীতের প্রয়োজন এবং তার জন্য বাদ্যের সমাবেশ দরকার। বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশকে ভরত বলেছেন কুতপ বিন্যাস। এর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। নাটকের মধ্যে একটা সুরের রেশ থাকে।

এই কুতপ বিন্যাস তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম ও অধম। এই তিনটি নাট্যের পক্ষে পরস্পর সাপেক্ষ।

এই কুতপ বিন্যাসের প্রয়োগ তিন প্রকার—নাটকাশ্রয়ী, নাট্যকৃতি এবং নাট্যকৃত (কন্‌সার্ট, আবহসঙ্গীত এবং কুশীলবদের গান)।

গায়ক সামনে বসে এবং তার পেছনে বাঁশি, বেণু, প্রভৃতির সমাবেশ হয়। গায়কের এবং বাদকের গুণ এবং সংখ্যা অনুসারে উত্তম, মধ্যম ও অধম কুতপের নাম হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে শার্ঙ্গদেব হুড়ুক প্রসঙ্গে ভরতের নাম উল্লেখ করেছেন : কিন্তু হুড়ুককে পুষ্কর এবং মৃদঙ্গ শ্রেণীর মধ্যে একটি প্রধান বাদ্য বলেছেন।

কূটতান—'অসম্পূর্ণাশ্চ সম্পূর্ণা ব্যুৎক্রমউচ্চারিতস্বরাঃ মূর্ছনা কূটতানাস্যুঃ'—সম্পূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ এবং সহজ ক্রমে ও বিপরীতক্রমে স্বরগুলি উচ্চারিত হলে তাকে বলে কূটতান। সম্পূর্ণ মূর্ছনা থেকে ৫০০০ তান সৃষ্টি হতে পারে। এক স্বরের তানকে বলে 'আর্চিক', দুই স্বরে হল 'গাথিক', তিন স্বরে 'সামিক', চার স্বর দ্বারা সৃষ্ট তান হল স্বরান্তর, পাঁচ স্বরে ঔড়ব, ছয় স্বরে ষাড়ব এবং সাত স্বর দ্বারা সৃষ্ট তানের নাম সম্পূর্ণ।

প্রাচীনকালের যজ্ঞের নাম অনুসারে শুদ্ধ তানগুলির নামকরণ করা হত। যেমন : (১) অগ্নিষ্টোম, (২) অত্যগ্নিষ্টোম, (৩) বাজপেয়, (৪) পুণ্ডরীক, (৫) রাজসূয়, (৬) অশ্বমেধ, (৭) স্বিষ্টকৃৎ, (৮) গোসব, (৯) বিশ্বজিৎ ইত্যাদি।

মনে রাখতে হবে, সামবেদে সা রে গ ম প ধ নি বলে স্বরগুলি লেখা ছিল না।

কৈশিকী নিষাদ—তিনশ্রুতি বিশিষ্ট নিষাদের নাম কৈশিকী নিষাদ। বর্তমানে এটি তীব্র কোমল নিষাদ বলে পরিচিত। ভীমপলশ্রী রাগে এই তীব্র নিষাদ ব্যবহৃত হয়।

গান্ধর্ব সঙ্গীত—পৃঃ ১৯

গমক—'গমক' ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে একটি বিশিষ্ট অলংকারকে বর্তমানে গমক বলা হয়। একটি স্বরের পূর্ববর্তী স্বরের আশ্রয়ে এক বা একাধিকতার উচ্চারিত হবার যে বিশেষ পদ্ধতি, তাকেই গমক বলে। সঙ্গীত রত্নাকরে ১৩টি গমকের কথা আছে। যেমন—তিরিপ, স্ফুরিত, কম্পিত, লীন, আন্দোলিত, বলি, ত্রিভিন্ন, কুরুল, আহত, উল্লাসিত, প্লাবিত, গুম্ফিত, মুদ্রিত, নামিত এবং মিশ্রিত। অবশ্য এখন প্রায় ২২টির মতো গমকের কথা পাওয়া যায়।

গ্রাম—গ্রাম হল প্রাচীন ঠাট বিশেষ। শ্রুতি এবং স্বরের একক সমাবেশের নাম গ্রাম। 'মতঙ্গ' বলেছেন গ্রামের মধ্যে স্বর বিকাশ লাভ করে। রাগের সার্থকতা নিষ্পন্ন করে। 'ভরত' 'অথ দ্বৌ গ্রামৌ' বলে ষড়জ ও মধ্যম গ্রাম দুটির প্রচলন স্বীকার করেছেন।

চ্যুত ও অচ্যুত ষড়জ—পৃঃ ৭৬।

তান—'তানাঃ স্যুঃ মূর্চ্ছনাঃ শুদ্ধাঃ ষাড়বৌড়ুবিতীকৃতা'—শুদ্ধ মূর্চ্ছনাকে যদি ষাড়বিত বা ঔড়বিত করা যায় তাকে শুদ্ধতান বলা হয়। ষাড়বিত করতে গেলে—ষড়জ গ্রামে সা রে প নি—এই স্বর কয়টি দিয়ে তান সৃষ্টি করা যায়। আর মধ্যম গ্রামে সা রে গ বাদ দিয়ে তান করা যায়। ঔড়বিত করতে গেলে —স প গ নি রে বাদ দিয়ে তান করা যায় ষড়জগ্রামে।

দ্রষ্টব্য)
দেশী সঙ্গীত—পৃঃ ২৩
ধাতু—ধাতু অর্থে গীতের অবয়ব বোঝায়। 'ভরতের' মতে বিস্তার, করণ, আবিদ্ধ, ব্যঞ্জন, এই চার প্রকারের ধাতু। ধাতুগুলিকে 'ভরত' বদ্ধসঙ্গীতের অপরিহার্য অঙ্গ বলেছেন। (পৃঃ ৩৫)
নিবদ্ধ গান—পৃঃ ৩১, ৩৭
পদ—'ভরত' বলেছেন, অক্ষর যুক্ত যে-কোনও কিছু পদ নামে অভিহিত হয়। পদ নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ ভেদে দুই প্রকার। অনিবদ্ধ পদে তাল থাকে না। কিন্তু অক্ষর, ছন্দ ও বীত থাকে। নিবদ্ধ পদে বিচিত্র ছন্দের সমাবেশ থাকে। ব্যঞ্জন, স্বর, বর্ণ, সন্ধি, বিভক্তি, আখ্যাতি, উপসর্গ, নিপাত, তদ্ধিৎ, ছন্দ, বৃত্ত, জাতি প্রভৃতি পদের উপাদান।
প্রকরণ গীতি—মদ্রক, বর্ধমানাদি গীতিকে প্রস্তুত বা গানের উপযোগী করার নাম প্রকরণ। 'সিংহভূপাল' বলেছেন—প্রক্রিয়ান্ত প্রস্তুয়ন্ত মদ্রকাদি গীতি প্রকরণ'।
মার্গতানে প্রকরণাখ্য গীতিগুলি গান করা হত। মদ্রক, অপরান্তক, উল্লোপ্যক, প্রকরী, ওবেনক, ঔড়ব, রবিন্দক, ছন্দক, বর্ধমানক, আসারিত, পানিকা, ঋক, গাথা ও সাম—এই ১৪টি হল প্রকরণ গীতি। শার্ঙ্গদেব তাঁর গ্রন্থ সঙ্গীত রত্নাকরের তালাধ্যায়ে এই গীতিগুলির পরিচয় দিয়েছেন।
পূর্বরঙ্গ—এর অর্থ যবনিকার বহির্ভাগ। ভরতের উক্তি থেকে বোঝা যায় যে পূর্বে এই পূর্বরঙ্গে নৃত্য, গীতির অনুষ্ঠান হত। এই পূর্বরঙ্গে চচ্চৎপুট তালে ধ্রুবা গীতির অনুষ্ঠান হত।
পূর্বরঙ্গ ৪ ভাগে বিভক্ত। যথা, (১) শুদ্ধ পূর্বরঙ্গ, (২) চিত্র পূর্বরঙ্গ, (৩) তিস্র পূর্বরঙ্গ, (৪) চতুস্র পূর্বরঙ্গ।
শুদ্ধ পূর্বরঙ্গ—নৃত্য অংশ বর্জিত গীত অংশকে শুদ্ধ পূর্বরঙ্গ বলা হয়।
চিত্র পূর্বরঙ্গ—নৃত্য মিশ্রিত অংশকে বলে চিত্র পূর্বরঙ্গ।
তিস্র পূর্বরঙ্গ—বাদ্য, গীত প্রসার ও ধ্রুবা তালে নৃত্য হলে তাকে বলে তিস্র পূর্বরঙ্গ। এই তিস্র পূর্বরঙ্গে হাত ও পায়ে ১২টি আঘাত দিতে হয়।
চতুস্র পূর্বরঙ্গ—এর সমস্ত লক্ষণই তিস্র পূর্বরঙ্গের মতন। কিন্তু হাত ও পায়ে ১৬টি আঘাত হলে তাকে চতুস্র পূর্বরঙ্গ বলে। বিধিপূর্বক পূর্ব-রঙ্গের অনুষ্ঠান করলে গায়ক, শ্রোতা, নট, নটী কারুর কোনও অকল্যাণ হয় না ও স্বর্গ প্রাপ্তি হয়।
পৃথুলাগীতি—গানে যদি অনেকগুলি লঘু অক্ষর ব্যবহার হয় তাকে বলে পৃথুলা (লঘু)। সুরনত হরপদ খগলং প্রথমতঃ এই রকম যে গান তাকে বলে পৃথুলা গীতি। এই গীতি যখন গাওয়া হয় তখন প্রথম কলায় ৮টি পদ গাইবার পর ২য় কলার মধ্য পদের ২ বার আবৃত্তি করা হত। তৃতীয় কলায়

প্রথম বারের মতন পদ সন্নিবেশ করে গাওয়া হত। ৪ তাল ৮ মাত্রা। পৃঃ ৮২

বর্ণ—ভরত বলেছেন—'বর্ণশ্চত্বার এবং স্যারলংকারা শ্চ ধাতব।' সঙ্গীতে বর্ণকে গান ক্রিয়া বলা হয়। কল্লিনাথ বলেছেন, 'স্বরের পদকে বা স্বরকে বিস্তার করার নাম বর্ণ।' সিংহভূপাল স্বরাচারণ পদ্ধতিকে বর্ণ বলেছেন। মতঙ্গ বর্ণকে বলেছেন গান—'বর্ণ শব্দেন গানমভিধীয়তে।' বর্ণ চার প্রকার: উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, কম্পিত (নাট্যশাস্ত্র)। পৃঃ ২৯

বস্তু—'পদং তস্য ভবেং বস্তু।' অর্থাৎ স্বর বা তালের সহযোগী বা উদ্বোধক হল বস্তু। সেই বস্তু ও মাত্রা ও স্বরসমন্বিত বিভিন্ন পদের প্রকাশক। গীতের অংশ বা অবয়বের নাম বস্তু। অংশ, ন্যাস, অপন্যাস প্রভৃতি বস্তু।

বহির্গীতি—পূর্বরঙ্গ বা রঙ্গপীঠের বহির্ভাগে 'যবনিকা' উত্তরণের পর আসারিত বা বর্ধমানক প্রভৃতি যে গীতি হত ভরত তাকে বহির্গীত বলেছেন। অভিনবগুপ্ত বলেছেন, 'পূর্বরঙ্গ বিধানের প্রথমার্ধে শুষ্ক অক্ষরের মাধ্যমে আসারিত গীতি প্রয়োগ করা হত এবং দ্বিতীয়ার্ধে স্তোভিক পদের মাধ্যমে আসারিত গান করার নাম বহির্গীতি।

বিদারী—পদ এবং বর্ণের সমাপ্তির নাম বিদারী (আভিধানিক অর্থে গীতের খণ্ড বা বিভাগকে বিদারী বলে)। যার দ্বারা গানের সমস্ত অংশ অবয়ব বস্তুকে বোঝায় তাকে মহাবিদারী এবং যা পদ ও বর্ণের দ্বারা শেষ হয় তাকে অবান্তর বিদারী বলে। প্রকৃতপক্ষে গান বা আলাপে ছোট ছোট ভাগ বা খণ্ডকে বিদারী বলে।

বৃন্দ—নাট্যশিল্পীদের ঋজু, বক্র বা চক্র আকারে বসতে হয়। ভরত নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন—'অলাতচক্র প্রতিম কর্তব্যং নাট্যযোক্তৃভিঃ' অর্থাৎ নাট্যে শিল্পীবৃন্দকে অলাতচক্রের মতো সাজানো উচিত। একটা আগুনের মশালকে ঘোরালে যে চক্র হয় তাকে বৌদ্ধরা বলেন অলাতচক্র। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবিদরা বিজ্ঞানের উপমা দেবার সময় 'অলাত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ভরত অলাত শব্দের পরিবর্তে অলাতচক্র ব্যবহার করেছেন।

এ থেকে রঙ্গমঞ্চে চক্রাকারে গায়ক, বাদক এবং নর্তকদের সাজাবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ এইরূপে সমাবেশকে বৃন্দ (বাদ্য বৃন্দ) বলা হয়েছে। বৃন্দের পরিচয় দিতে গিয়ে শার্ঙ্গদেব বলেছেন, 'গায়ক ও বাদকের সমবেত মিলনকে বৃন্দ বলে।' বৃন্দ বিচিত্র প্রকারের। (১) কুতপবৃন্দ, (২) বাংশিকবৃন্দ, এবং (৩) কোলাহলবৃন্দ।

(১) কুতপ বৃন্দ—তিন প্রকার।

(ক) উত্তম—মুলগায়ক-৪, সমগায়ক-৮, বংশীবাদক-৩, মৃদঙ্গবাদক-৪।

(খ) মধ্যম—মুলগায়ক-২, সমগায়ক-৬, বংশীবাদক-২, মৃদঙ্গবাদক-২।

(গ) কনিষ্ঠ বা অধম—এতে মুলগায়ক-১, সমগায়ক-৩, বংশীবাদক-২, মৃদঙ্গবাদক-২।

(২) বাংশিকবৃন্দ—এখানে মুলবংশীবাদক-১, সমবংশীবাদক-৬।

(৩) কোলাহল বৃন্দ—যে বৃন্দে উত্তম তুল্য বৃন্দের চেয়ে বেশি গায়ক বাদকের সমাবেশ থাকত তাকে কোলাহল বৃন্দ বলা হত।

গায়নী বৃন্দ :

গায়কদের দিক থেকে বৃন্দ গঠিত হতে পারে।

এই বৃন্দ ৩ প্রকার। উত্তম, মধ্যম, অধম।

(ক) উত্তম—মূলগায়ক-২, সমগায়ক-১০, বংশীবাদক-২, মৃদঙ্গবাদক-২।

(খ) মধ্যম—মূলগায়ক-১, সমগায়ক-৩, বংশীবাদক-১, মৃদঙ্গবাদক-১।

(গ) অধম—মধ্যমের অর্ধেক।

মাগধী ও অর্ধমাগধী—ভরত নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে নাট্যবিধানে জাতিরাগ পর্যায়ে ধ্রুবা প্রসঙ্গে চার রকম গীতির উল্লেখ করেছেন। যেমন—মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা, পৃথুলা। রঙ্গ পীঠের বহির্ভাগে যবনিকা উত্তোলনের পর আসারিত, বর্ধমানক প্রভৃতি গানের মতো মাগধী বা অর্ধমাগধী গীত গাওয়া হয়।

মাগধী ও অর্ধমাগধী সঙ্গীত ধ্রুবা গানের পর্যায়ে পড়ে। বৈদিকোত্তর নিবদ্ধ গান কয়েক রকমের আছে। (গান নিবন্ধ ও অনিবন্ধ ভেদে ২ প্রকার) মাগধী গীতি বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত—এই তিন লয়েই গাওয়া হত। এতে ২১টি তালের সমাবেশ থাকত। অর্ধমাগধীতে তিনটি লয় ও যতি থাকত কিন্তু তাতে ১০টি তালের সমাবেশ থাকত। মতঙ্গ বৃহদ্দেশীতে বলেছেন মাগধী পদকে তিনবার আবৃত্তি করা হত। মাগধী গীতি বিদর্ভ দেশ থেকে এসেছে।

ব্রহ্মভরত এবং সদাশিব ভরতের সময় এগুলি প্রচলিত ... ন বলে অনেকে মনে করেন। ... ভরত এ দেশে ব্রহ্মা ও সদাশিবের ... । তিনি বলেছেন গীতিপদ প্রায় শিবস্তুতিমূলক ছিল। এজন্য ... পর্যায়ভুক্ত করা হয়ে থাকে। শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর'-এ ... গীতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া আছে।

ভরত বলেছেন, ভিন্ন বৃত্তিতে যে গান করা হত তার নাম মাগধী এবং অর্ধকাল বিশিষ্ট হলে তা অর্ধমাগধী।

মার্গ সঙ্গীত—পৃঃ ২২

ষড়জ—পৃঃ ৬৮

সম্ভাবিত—ভরত বলেছেন যে, ভিন্ন বৃত্তিতে যে গীতি গান করা হত তাকে বলা হত মাগধী। অর্ধকাল বিশিষ্ট হলে তাকে বলা হত অর্ধমাগধী। গুরু অক্ষর যুক্ত হলে তাকে বলা হত সম্ভাবিত এবং লঘু অক্ষর যুক্ত হলে তাকে পৃথুলা বলা হত। পৃঃ ৬৭

স্বর—যা শ্রোতার চিত্তকে আনন্দ দান করে, যা শ্রুতি থেকে উৎপন্ন ধ্বনি যার মধ্যে অনুরণন থাকে, তাকে স্বর বলে। 'স্বর' শব্দটি দিয়ে ভরত ষড়জাদি সাত স্বর, তাদের অন্তর্বর্তী সূক্ষ্ম স্বর হিসেবে শ্রুতি, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, আজার

জাতি রাগ, অলঙ্কার, ধাতু, বর্ণ, গীত ও বীণা প্রভৃতির আলোচনা করেছেন। (পৃঃ ৬০)।

স্বর সাধারণ—এক গ্রামের জাতির মধ্যে অন্য গ্রামের জাতির বর্ণ সাম্য (এক বর্ণ) হলে গানের যে সাধারণ ভাব দেখা যায়, তাকে জাতি সাধারণ বলে। ষড়জ ও মধ্যম গ্রাম দুটি অনুসারে স্বর সাধারণ 'ষড়জ সাধারণ' ও 'মধ্যম সাধারণ' নামে পরিচিত। স্বর বিশেষের নামকেই এখানে সাধারণ বলে। শার্ঙ্গদেব ৪টি স্বর সাধারণের কথা বলেছেন।